এপ্রিল ২০১৯ ▪ চৈত্র ১৪২৫–বৈশাখ ১৪২৬

সচিত্র বাংলাদেশ

অভিনব ও চিরায়ত নববর্ষের মঙ্গল শোভাযাত্রা

মুজিবনগর দিবস: সতেরোই এপ্রিলের সেই অবিস্মরণীয় দিনটি

পানি ব্যবস্থাপনা

প্রথম বিএ পাস মুসলমান অভিনেত্রী বনানী চৌধুরী

সচিত্র বাংলাদেশ

দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

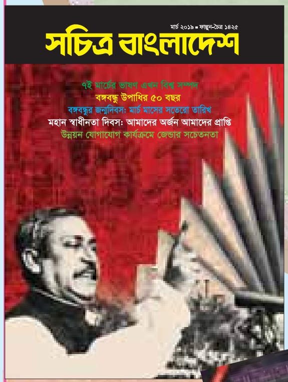

- যে-কোনো বিষয়ে লেখা পাঠানো যায়।
- লেখা সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। লেখার সাথে চিত্র দেওয়া হলে তা ক্যাপশনসহ প্রেরণ করা আবশ্যক।
- প্রতিটি লেখার জন্য লেখক সম্মানী দেওয়া হয়।
- হার্ডকপির সাথে সিডি বা ই-মেইলে লেখা পাঠানো হলে তা অধিকতর গ্রহণযোগ্য।
- e-mail: editorsb@dfp.gov.bd
  dfpsb@yahoo.com

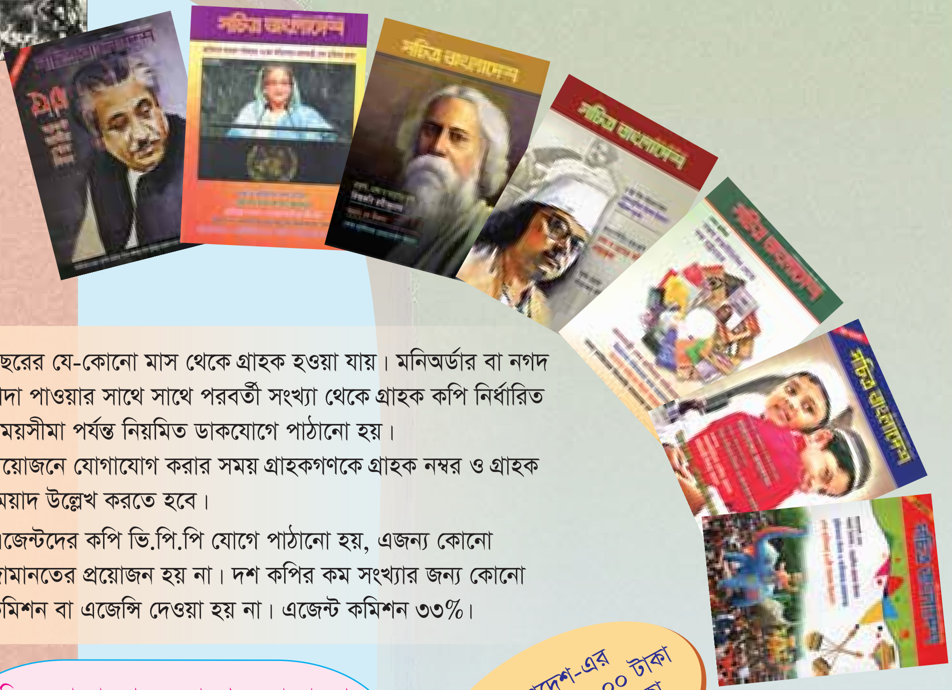

- বছরের যে-কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। মনিঅর্ডার বা নগদ চাঁদা পাওয়ার সাথে সাথে পরবর্তী সংখ্যা থেকে গ্রাহক কপি নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত নিয়মিত ডাকযোগে পাঠানো হয়।
- প্রয়োজনে যোগাযোগ করার সময় গ্রাহকগণকে গ্রাহক নম্বর ও গ্রাহক মেয়াদ উল্লেখ করতে হবে।
- এজেন্টদের কপি ভি.পি.পি যোগে পাঠানো হয়, এজন্য কোনো জামানতের প্রয়োজন হয় না। দশ কপির কম সংখ্যার জন্য কোনো কমিশন বা এজেন্সি দেওয়া হয় না। এজেন্ট কমিশন ৩৩%।

সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ, বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি ও অ্যাডহক প্রকাশনাসমূহ সহজে পেতে এই ০১৫৩১৩৮৫১৭৫ বিকাশ নম্বরে যোগাযোগ করে টাকা পাঠিয়ে দিন।

সচিত্র বাংলাদেশ-এর
বার্ষিক চাঁদা ৩০০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১৫০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২৫.০০ টাকা

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন

www.dfp.gov.bd

www.facebook.com/sachitrabangladesh/

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

নবারুণ
মোবাইল অ্যাপ্স-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ্স
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : **bangladeshquarterly@yahoo.com**
bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ, বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি ও অ্যাডহক প্রকাশনাসমূহ সহজে পেতে এই **০১৫৩১৩৮৫১৭৫** বিকাশ নম্বরে যোগাযোগ করে টাকা পাঠিয়ে দিন।

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 39, No. 10, April 2019, Tk. 25.00

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা।

সচিত্র বাংলাদেশ এপ্রিল ২০১৯ ▪ চৈত্র ১৪২৫–বৈশাখ ১৪২৬

সচিত্র বাংলাদেশ

এপ্রিল ২০১৯ ▫ চৈত্র ১৪২৫–বৈশাখ ১৪২৬

রমনা বটমূলে ছায়ানটের বর্ষবরণ

সম্পাদকীয়

নববর্ষ বাঙালির সর্বজনীন সাংস্কৃতিক আনন্দ-উৎসব। পহেলা বৈশাখে বাংলাদেশ উৎসবে মেতে ওঠে, সর্বত্র জেগে ওঠে প্রাণের উচ্ছ্বাস। এ আয়োজনে থাকে বাঙালি ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার প্রয়াস। ধর্ম-বর্ণ, ধনী-গরিব, উঁচু-নীচু ভেদাভেদ উপড়ে ফেলে এদিন সব মানুষ একই সত্তায় যেন একাকার হয়ে ওঠে। ঋতুর রূপবৈচিত্র্য আর রঙের খেলায় শুধু প্রকৃতিই বদলে যায় না, জনজীবনেও রূপান্তর ঘটে। বৈশাখ আসে রুদ্ররূপ ধারণ করে বাঙালির নবপ্রত্যয় জাগ্রত করতে। বাঙালি যেন এদিনের পরশমণির ছোঁয়ায় নতুনভাবে উদ্দীপিত হয়। এদিনে পুরোনো গ্লানি, জরা, হতাশা ও ব্যর্থতা ঝেড়ে ফেলে বর্ষবরণে বাঙালির কণ্ঠে ধ্বনিত হয় দৃঢ়প্রত্যয় – 'মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা/অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা'। সব অশুভ ও অসুন্দরকে পেছনে ফেলে বৈশাখ আসে নতুনের কেতন উড়িয়ে। নতুন বছর সবার জন্য কল্যাণ বয়ে আনুক। নতুন দিনের মঙ্গলযাত্রায় বাংলাদেশ অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হোক। *সচিত্র বাংলাদেশ*-এর পক্ষ থেকে সকলের প্রতি রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা। স্বাগত ১৪২৬। শুভ নববর্ষ। এই সংখ্যায় নববর্ষ, বর্ষবরণ ও মঙ্গল শোভাযাত্রা নিয়ে রয়েছে একাধিক প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও কবিতা।

১৭ই এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে অনন্য এদিন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ১০ই এপ্রিল গঠিত স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার ভবেরপাড়া আমবাগানে আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করে ১৯৭১ সালের এদিনে। শপথ অনুষ্ঠানে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র গৃহীত হয় এবং সরকার দায়িত্বভার গ্রহণ করে। পরে এ স্থানের নামকরণ করা হয় মুজিবনগর। বাংলাদেশের এই অস্থায়ী সরকার মুজিবনগর সরকার নামে বহুল পরিচিত। এ সরকারের সফল নেতৃত্বে নয় মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জিত হয়। এ সংখ্যায় ঐতিহাসিক 'মুজিবনগর দিবস' সম্পর্কে রয়েছে একটি প্রবন্ধ।

২২শে মার্চ ছিল বিশ্ব পানি দিবস। বিশ্ব পরিবেশ ও প্রতিবেশের সাথে টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেশীয় ও আন্তঃদেশীয় নদীর পানি বণ্টনের গুরুত্ব বিবেচনায় 'পানি ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক প্রবন্ধটিও এ সংখ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩রা এপ্রিল জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস। এ দিবস উপলক্ষে চলচ্চিত্র বিষয়ে রয়েছে কয়েকটি প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও ফিচার। ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত ভ্রমণকাহিনিটিও এ সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ। এছাড়া এ সংখ্যায় স্থান পেয়েছে প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার, কবিতা ও অন্যান্য নিয়মিত প্রতিবেদন।

আশা করি, এপ্রিল ২০১৯ সংখ্যাটি সবারই ভালো লাগবে।

প্রধান সম্পাদক
মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন

সম্পাদক
সুফিয়া বেগম

কপি রাইটার
মিতা খান

সহ-সম্পাদক
সাবিনা ইয়াসমিন
জান্নাতে রোজী
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

সহকারী শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সম্পাদনা সহযোগী
শারমিন সুলতানা শান্তা
জান্নাত হোসেন

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৪৯৩৫৭৯৩৬
E-mail : editorsb@dfp.gov.bd
dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা।
নিয়মিত গ্রাহক হওয়ার জন্য যোগাযোগ : **সহকারী পরিচালক**
(বিক্রয় ও বিতরণ), চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর;
স্থানীয় এজেন্ট এবং সকল জেলা তথ্য অফিস।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়
সূচিপত্র

নিবন্ধ/প্রবন্ধ

অভিনব ও চিরায়ত নববর্ষের মঙ্গল শোভাযাত্রা ৪
মফিদুল হক

মুজিবনগর দিবস
সতেরোই এপ্রিলের সেই অবিস্মরণীয় দিনটি ৬
খালেক বিন জয়েনউদদীন

কবিতায় নানামাত্রিক বৈশাখ: বাঙালি ও বাঙালিয়ানা ৮
বদরু মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান

পহেলা বৈশাখ বাঙালির সর্বজনীন উৎসব ১০
শামস সাইদ

বাংলা নববর্ষের কথা ১২
মিজানুর রহমান মিথুন

পানি ব্যবস্থাপনা ১৩
সুফিয়া বেগম

বাংলাদেশে মেলা ১৫
শামসুজ্জামান শামস

৩রা এপ্রিল: জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস ১৭
সাবিত্রী রানী

চলচ্চিত্রের ভাষা পাঠ ১৮
শ্যামল দত্ত

প্রথম বিএ পাস মুসলমান অভিনেত্রী বনানী চৌধুরী ২২
অনুপম হায়াৎ

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে মুক্তিযুদ্ধ ২৩
মোহাম্মদ নজরুল হাসান ছোটন

অস্কারজয়ী বাঙালি চলচ্চিত্র পরিচালক
সত্যজিৎ রায়ের প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি ২৫
আপন চৌধুরী

ঘুরে এলাম ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত ২৮
রফিকুর রশীদ

হরিণাকুণ্ডে যাদের ঘর নাই তাদের জন্য ঘর:
প্রকল্পের সাফল্য ৩২
ম. জাভেদ ইকবাল

ভাষা ও সংস্কৃতি ৩৩
শহিদুল ইসলাম

সরকারের উদ্যোগে সবার জন্য শিক্ষা ৩৫
আবু সালেহ মোহাম্মদ মুসা

চিকিৎসা শিক্ষায় এগিয়ে নারীরা ৩৭
মোতাহার হোসেন

বঙ্গবন্ধু উদ্ধৃতি শীর্ষক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে ৩৮
কে সি বি তপু
বিদায় কিংবদন্তি শিল্পী শাহনাজ রহমতুল্লাহ ৩৯
ফারিহা রেজা
ডিএফপি কর্তৃক ঐতিহাসিক সাতই মার্চ এবং মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন ৪০
মিতা খান

কবিতাগুচ্ছ ১৩, ৪১, ৪২, ৪৩
নাসির আহমেদ, হাবীবুল্লাহ্ সিরাজী, জাহাঙ্গীর ফিরোজ হাসান হাফিজ, সৈয়দ লুৎফুল হক, জাকির হোসেন চৌধুরী সোহরাব পাশা, রুস্তম আলী, শাহনাজ, মিলি হক শাহরিয়ার নূরী, আতিক আজিজ, সৈয়দ শাহরিয়ার সাদিয়া সিমরান, শাহরুবা চৌধুরী, ইজামুল হক

গল্প
অপরিণামদর্শিতা ৪৪
ফকির জসীমউদ্দিন

বিশেষ প্রতিবেদন
রাষ্ট্রপতি ৪৬
প্রধানমন্ত্রী ৪৭
তথ্যমন্ত্রী ৪৮
জাতীয় ঘটনা ৪৯
আন্তর্জাতিক ৫১
উন্নয়ন ৫২
ডিজিটাল বাংলাদেশ ৫২
শিক্ষা ৫৩
শিল্প-বাণিজ্য ৫৪
বিনিয়োগ ৫৪
নারী ৫৪
সামাজিক নিরাপত্তা ৫৫
কৃষি ৫৬
কর্মসংস্থান ৫৬
নিরাপদ সড়ক ৫৭
পরিবেশ ও জলবায়ু ৫৭
যোগাযোগ ৫৮
মাদক প্রতিরোধ ৫৮
স্বাস্থ্যকথা ৫৯
প্রতিবন্ধী ৫৯
শিশু ও কিশোর উন্নয়ন ৬০
সংস্কৃতি ৬১
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ৬১
চলচ্চিত্র ৬২
ক্রীড়া ৬৩
না ফেরার দেশে হাসির রাজা টেলি সামাদ ৬৪
এক নজরে বাচসাস পুরস্কার ৬৪

হাইলাইটস

অভিনব ও চিরায়ত নববর্ষের মঙ্গল শোভাযাত্রা

মঙ্গল শোভাযাত্রা একেবারে হালের উৎসব। সমষ্টির কল্যাণ কামনা করে সাজসজ্জা নিয়ে ঢোল বাজিয়ে সম্মিলিতভাবে রাজপথ পরিক্রমণের মধ্যে অভিনবত্ব রয়েছে, তবে এর অবলম্বন যে নতুন বছরের প্রথম দিন, সেখানে রয়েছে চিরায়ত এক মাত্রা। এ চিরায়তের আধার বাঙালির নববর্ষ, বৈশাখের প্রথম দিবস। নববর্ষ আবাহনের পদ্ধতি ইতিহাসের পথপরিক্রমণে নানাভাবে রূপান্তরিত হয়েছে। এ বিষয়ে 'অভিনব ও চিরায়ত নববর্ষের মঙ্গল শোভাযাত্রা' শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন পৃষ্ঠা-**৪**

মুজিবনগর দিবস সতেরোই এপ্রিলের সেই অবিস্মরণীয় দিনটি

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ৭ই মার্চ, ২৬শে মার্চ, ১০ই এপ্রিল, ১৬ই ডিসেম্বর ও ১০ই জানুয়ারির মতো একাত্তরের ১৭ই এপ্রিলও একটি অবিস্মরণীয় দিন। ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন এবং ২৬শে মার্চ তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১০ই এপ্রিল গঠিত হয় প্রথম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। ১৬ই ডিসেম্বর আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিজয় অর্জিত হয় এবং ১০ই জানুয়ারি বাহাত্তরে বঙ্গবন্ধু স্বদেশে ফিরে আসায় মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। অনুরূপভাবে একাত্তরের ১০ই এপ্রিলে গঠিত সরকারের আনুষ্ঠানিক শপথ অনুষ্ঠিত হয় ১৭ই এপ্রিল। এদিন শপথ অনুষ্ঠানে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র গৃহীত হয় এবং সরকার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে প্রাবন্ধিক খালেক বিন জয়েনউদদীন রচিত 'মুজিবনগর দিবস: সতেরোই এপ্রিলের সেই অবিস্মরণীয় দিনটি' শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন পৃষ্ঠা-**৬**

পহেলা বৈশাখে বাঙালি ও বাঙালিয়ানা

পহেলা বৈশাখ বাংলা বছরের প্রথম দিন– নববর্ষ। বাঙালি এ দিনে নতুন বছরকে বরণ করে নেয়। অতীতের দুঃখ-গ্লানি ভুলে বর্ষবরণ করে। প্রত্যাশা থাকে– ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয় জীবনে পহেলা বৈশাখ নিয়ে আসে আনন্দ, সুখ ও সমৃদ্ধি। দিনে দিনে নববর্ষ পালনে বাঙালির মুন্সিয়ানার প্রকাশ পেয়েছে। বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরে বাঙালি চেতনার শৈল্পিক প্রকাশ দেখা যায় নববর্ষ উৎসবে। আমাদের একান্ত অনুষঙ্গ নববর্ষ। পহেলা বৈশাখ–নববর্ষ বিষয়ে 'কবিতায় নানামাত্রিক বৈশাখ:বাঙালি ও বাঙালিয়ানা', 'পহেলা বৈশাখ: বাঙালির সর্বজনীন উৎসব' ও 'বাংলা নববর্ষের কথা' শীর্ষক তিনটি প্রবন্ধ দেখুন যথাক্রমে পৃষ্ঠা-**৮, ১০ ও ১২**

পানি ব্যবস্থাপনা

২২শে মার্চ বিশ্ব পানি দিবস। বিগত একটি বছরে পানি দিবসের প্রতিপাদ্যে পানির সঙ্গে কর্মসংস্থানের কথা বলা হয়েছিল। পরিবেশবিদরা দাবি করেছেন, বিশ্বে সুপেয় পানির চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে ভারসাম্য নেই বলে পৃথিবীর শতকরা ৬০ ভাগ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাই বিভিন্ন নদনদীর পানি সংরক্ষণ, নাব্যতা অক্ষুণ্ন, আন্তঃদেশীয় নদনদীর পানির ন্যায্য হিস্যা আজ সময়ের দাবি। বিশ্ব পরিবেশ ও প্রতিবেশের সাথে টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেশীয় ও আন্তঃদেশীয় পানি ব্যবস্থাপনার গুরুত্বসহ নানা তত্ত্ব, তথ্য ও উপাত্ত পাওয়া যাবে 'পানি ব্যবস্থাপনা' প্রবন্ধে। দেখুন পৃষ্ঠা-**১৩**

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail: editorsb@dfp.gov.bd, dfpsb@yahoo.com
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

মুদ্রণে : রূপা প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং, ২৮/এ-৫ টয়েনবি সার্কুলার রোড মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। ফোন: ৭১৯৪৭২০

অভিনব ও চিরায়ত নববর্ষের মঙ্গল শোভাযাত্রা

মফিদুল হক

মঙ্গল শোভাযাত্রা একেবারে হালের উৎসব। সমষ্টির কল্যাণ কামনা করে সাজসজ্জা নিয়ে ঢোল বাজিয়ে সম্মিলিতভাবে রাজপথ পরিক্রমণের মধ্যে অভিনবত্ব রয়েছে, তবে এর অবলম্বন যে নতুন বছরের প্রথম দিন, সেখানে রয়েছে চিরায়ত এক মাত্রা। এ চিরায়তের আধার বাঙালির নববর্ষ, বৈশাখের প্রথম দিবস। নববর্ষ আবাহনের পদ্ধতি ইতিহাসের পথপরিক্রমণে নানাভাবে রূপান্তরিত হয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে বঙ্গভূমিতে সাল-গণনার বিভিন্ন ধরন বজায় ছিল, তার মধ্যে একটা সমন্বয় আনার চেষ্টা করেন মধ্যযুগের মোগল সম্রাট আকবর। তাঁর শাসনামলেই রাজস্ব আদায় ব্যবস্থা কার্যকর করার লক্ষ্য নিয়ে প্রবর্তিত হয় বঙ্গাব্দ, ফসলি সাল হিসেবে পরিচয়প্রাপ্ত এ বর্ষপঞ্জির সূচনার মাস হিসেবে বৈশাখকে নির্ধারণ করা হয়। সেই সঙ্গে বর্ষগণনার সূচনাকাল হিসেবে ধার্য হয় মক্কা থেকে মদিনায় নবি করিমের (সা.) হিজরত গ্রহণের বছর। ইতিহাসই বুঝি বাঙালির ললাটে মিলন-মিশ্রণের সংস্কৃতির তিলক কেটে দিয়েছিল এবং অন্তঃসলিলাভাবে হলেও সেই পরিচয় বহন করছে বাংলা বর্ষপঞ্জি। হিন্দু পণ্ডিতের সব আচার-অনুষ্ঠান-উৎসব যে পঞ্জিকা অনুসারে নির্ধারিত হচ্ছে, সেখানে ইসলামের ইতিহাসের সম্পৃক্তি তাই রয়ে গেছে অমোচনীয়ভাবে। ফসলি সালের সঙ্গে বাংলা বর্ষবরণের যে যোগ সেটা ঔপনিবেশিক আমলে ক্ষীণভাবে বহমান ছিল জমিদারের খাজনা আদায় ও পুণ্যাহ অনুষ্ঠানে, আর এর জের হিসেবে টিকেছিল ব্যবসায়ীদের হালখাতা অনুষ্ঠান, যখন সাবেকি ধারকর্জ চুকিয়ে নতুনভাবে খোলা হতো হিসাবের খাতা। সমাজজীবনে এই উৎসব আনন্দময় ও কর্ম-প্রাসঙ্গিক করে তোলার অবলম্বন ছিল বৈশাখি মেলা। এসব মিলেই গড়ে উঠেছিল বাঙালির বর্ষ-আবাহনের চারিত্র্য, এর সঙ্গে ধর্মের যোগ ছিল, তবে তা ছিল অপ্রধান। চৈত্রসংক্রান্তি কিংবা শিবের গাজনে এর যে প্রকাশ সেখানে ধর্মাচারের পাশাপাশি ছিল লোকাচার; লোকরঞ্জক ভূমিকা ছিল প্রধান। সেই বিচারে বৈশাখ ঘিরে বাঙালি সমাজে আলোড়নের ছিল এক সেকুলার মাত্রা এবং ছিল সর্বজনীনতা।

দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসন পদানত জাতিগুলোর ঐতিহ্যিক জীবনধারা তছনছ করে দিয়েছিল। আফ্রিকার বহু দেশে তা পালটে দিয়েছিল জনগোষ্ঠীর ধর্ম, তাদের ভাষা, আচার, পোশাক। কিন্তু সবকিছুর পরও একেবারে মুছে দেওয়া যায়নি তাদের লোকাচার ও লোকসংস্কৃতি। নাগরিক সংস্কৃতি নিজ দেশ ও নিজ সমাজের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা তৈরি করলেও অন্তরের গভীরে নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য জাতি নানাভাবে লালন করে চলেছিল। জাতির পুনর্জাগরণ ও সংহতি রচনায় তাই সংস্কৃতি পালন করেছিল নিয়ামক ভূমিকা। আফ্রিকার বহু দেশের মানুষ ভুলে গেছে তাদের মাতৃভাষা, হারিয়েছে তাদের ধর্ম, তাদের নাম-পদবি। শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যসন-ভূষণ, জীবনবৃত্তি ও জীবনাচারে তারা শেকড়চ্যুত রয়েছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম, সেই পতিত জনগোষ্ঠীর জন্যও তো জাগরণের অবলম্বন হয়েছিল সংস্কৃতি। জাগরণের সূত্র হিসেবে আমরা দাখিল করতে পারি আফ্রিকার মুক্তি-আন্দোলনের নেতা গিনি-বিসাউয়ের আমিলকার কাবরালের উক্তি, সত্তরের দশকে ইউনেস্কোর এক সেমিনারে তিনি বলেছিলেন, 'অ্যান অ্যাক্ট অব কালচার ইজ অ্যান অ্যাক্ট অব লিবারেশন'। সাংস্কৃতিক কোনো কর্মকাণ্ড নিহিতার্থে মুক্তিরই কর্মপ্রয়াস। নিজের দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি বুঝেছিলেন, আফ্রিকানরা যখন হারিয়েছে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, পদানত জাতি হিসেবে খুইয়েছে তার অর্থনৈতিক-সামাজিক অধিকার ও স্বকীয়তা, নগরে প্রশ্রয় পেয়েছে ভিনদেশীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি, তখনো রয়ে যায় তার লোকায়ত সংস্কৃতি, হয়ত প্রকাশ্য নয়, সরব নয়, মূলধারায় তার অবস্থান নেই; কিন্তু দূর অরণ্যে পাহাড়ের কন্দরে কেউ যখন মাদলে বাজায় বোল, মেতে ওঠে গানে-নৃত্যে, সেখানেই মেলে জাতি ও জনগোষ্ঠীর নিজেকে আবার ফিরে পাওয়ার অবলম্বন, জাগরণের সূত্র, তবে এসব তো তত্ত্বের কথা।

বাস্তবের দিকে মুখ ফেরালে আমরা দেখি সাতচল্লিশের দেশ ভাগ সাম্প্রদায়িক মতাদর্শের ভিত্তিতে যে বিভাজন ও বিদ্বেষ সমাজে আরোপ করেছিল, দ্বিজাতিতত্ত্বভিত্তিক যে ধর্মীয় জাতীয়তাবোধ চাপিয়ে মুছে ফেলতে চেয়েছিল বাঙালি সত্তা, তার বিপরীতে বাঙালির জাগরণ ছিল ভাষাভিত্তিক নৃতাত্ত্বিক জাতিচেতনা নিয়ে, স্বভাবগতভাবে যা অসাম্প্রদায়িক, বিভাজনের বিপরীতে সংযুক্তির আদর্শবহ। এরই অসাধারণ প্রকাশ আমরা পাই বাংলা ভাষার অধিকারের দাবিতে একুশে ফেব্রুয়ারির আন্দোলনে, যা বাঙালিকে সচকিত করেছিল নিজ সংস্কৃতি বিষয়ে এবং জুগিয়েছিল এ উপলব্ধি যে, ধর্ম-পরিচয় জাতিসত্তা মুছে ফেলে না, বরং নানা ধর্মের মানুষের মিলনক্ষেত্র রচনা করে জাতীয়তা, বাংলার হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান-মুসলমান সবাই বাঙালি পরিচয়ে ভূষিত ও গর্বিত। কিন্তু বাঙালিত্ব দমন করে মুসলিম ধর্ম-পরিচয়কে জাতি-পরিচয় হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার জবরদস্তিতায় মেতে উঠেছিল পাকিস্তান। অথচ পাকিস্তান তথাকথিত ইসলামি রাষ্ট্র হলেও সে দেশে পাঠান-পাঞ্জাবি-বেলুচ-সিন্ধিদের অবস্থান ও জাতি-পরিচয় মুছে দেওয়ার সাধ্য তার নিজেরও হয়নি। বাঙালিত্ব খারিজ করতে গিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে

শাসকগোষ্ঠী এক সময় কায়েম করেছিল এক ইউনিট, বাতিল করেছিল সেখানকার জাতিভিত্তিক প্রদেশগুলো, যেন পাকিস্তানে কোনো জাতিসত্তা নেই, আছে কেবল ইউনিট। সেই এক ইউনিটও বাতিল হলো বাঙালির আন্দোলনের ফলে, ১৯৭০ সালের নির্বাচনকালে। পাকিস্তান আবার ফিরে পেল জাতিসত্তাভিত্তিক প্রদেশগুলো, ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের পক্ষেও জাতিসত্তা অস্বীকার করা যে সম্ভব নয়, এ ছিল তার আরেক প্রকাশ। একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল ভাষার সূত্রে, হয়েছিল সাংস্কৃতিক জাগরণের অবলম্বন, শেকড়ের সন্ধানে যাত্রা, মিলনক্ষেত্র তৈরির পরিসর। ভাষাকে অবলম্বন করে শুরু হয়েছিল পূর্ব বাংলার বাঙালির ব্যতিক্রমী জাগরণ, শহিদমিনার হয়ে উঠল যার প্রতীক, যে প্রতীক ক্রমান্বয়ে ছড়িয়ে পড়ে সারাদেশে, সেকুলার এক সম্মিলনী রূপে। বাঙালির মিলনের এ উপলক্ষ চরিত্রগতভাবে সাংস্কৃতিক এবং কাঠামোগতভাবে রাজনৈতিক। একুশে জাতির অন্তরে মূর্ত হয়ে ওঠার পেছনে সাহিত্যিক-সাংগীতিক-সাংস্কৃতিক উদ্যোগগুলোই ছিল প্রধান। আবদুল গাফফার চৌধুরী রচিত আলতাফ মাহমুদ সুরারোপিত প্রভাতসংগীত 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো'-এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ, তবে একমাত্র নয়। হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত *একুশে ফেব্রুয়ারি* সংকলন সাহিত্যিক যৌথতার নবযাত্রা সূচিত করেছিল। আরো কতভাবেই না গানে-কবিতায়-গল্পে-উপন্যাসে-চলচ্চিত্রে-নাটকে মূর্ত হয়ে উঠল একুশে এবং জাতির অন্তরে খোদিত করে দিল এর স্থায়ী রূপ, যা প্রতীকী ব্যঞ্জনা পেয়েছিল নভেরা আহমেদ আর হামিদুর রহমান কৃত শহিদমিনারের নকশায়।

ইউনেস্কো যখন একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করল, তখন আমরা উদ্বেলিত হয়েছি বাংলা ভাষার এ বৈশ্বিক স্বীকৃতিতে। বিশ্ব সভ্যতায় বাঙালির অবদান বিশ্বায়ন। আরোপিত সংস্কৃতির সমরূপত্বের সংকটকালে। বাঙালির একুশে বিশ্বকে স্মরণ করিয়ে দেয় মাতৃভাষার গুরুত্ব, ভাষাভিত্তিক জাতিসত্তার তাৎপর্য, যা আমরা কোনোভাবে যেন খুইয়ে না ফেলি। একুশের পথ বেয়ে জাতির সংহত হয়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন ছিল আরো অনেক কাজ, অনেক উপলক্ষ। তারই জোগান দিল ১৯৬৭ সালে ছায়ানট আয়োজিত রমনার অশ্বত্থতলে বর্ষবরণের সংগীতানুষ্ঠান। উন্মুক্ত প্রান্তরে প্রকৃতির আশ্রয়ে নতুন বছরের প্রথম প্রভাতে। ভৈরবী রাগনির্ভর যে সুর ভেসে এল তা জাতিকে অনুপ্রাণিত করল বিপুলভাবে। এ উৎসব অচিরেই পেল প্রতীকী মর্যাদা এবং ক্রমে পেতে শুরু করল বিস্তার। নগর থেকে বিতাড়িত বাংলা নববর্ষ আবার ফিরে এল শহরে নতুন মাত্রা নিয়ে। নতুন করে সবার নজর ফিরল গ্রামীণ বর্ষবরণ, গ্রামীণ মেলা ও ক্রীড়া নবপ্রাণ লাভের সুযোগ যেন পেল এবার। ছায়ানটের এমন সীমিত আকারের ছোটো আয়োজন যে এত প্রভাবশালী হয়ে উঠতে পারল তার কারণ এমন এক উৎসবের জন্য জাতি বুঝি প্রস্তুত হয়েছিল। বৈশাখ হয়ে উঠল বাঙালির ঐক্যবদ্ধ হওয়ার উৎসব-আয়োজন। এই বাঙালিই বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে রাজনৈতিক ঐক্য সংহত করেছিল জাতীয় মুক্তির লক্ষ্যে এবং একাত্তরে ছিনিয়ে এনেছিল স্বাধীনতা। স্বাধীন বাংলাদেশে বৈশাখি উৎসব ক্রমে বিস্তৃতি অর্জন করেছে, শেকড়ের সন্ধানে বাঙালি। আরো নিষ্ঠাবান হতে চেয়েছে এবং খুঁজে ফিরছে জাতীয় মানস ও জাতীয় সংস্কৃতির রূপ। বাধাবিঘ্ন এসেছে অনেক, বিশেষভাবে বাঙালিকে তার অসাম্প্রদায়িক উদার জাতিসত্তা থেকে বিচ্যুত করে ধর্মান্ধতা ও কূপমণ্ডূকতার পথে ঠেলে দিতে আয়োজন হয়ে ওঠে প্রতাপশালী, একপর্যায়ে লাভ করে রাষ্ট্রশক্তির সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা। সংস্কৃতি ঘিরে চলছিল এক লড়াই। এ প্রয়াসে জাতি যেন দাবি করছিল তার ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত নতুন আরো অনেক আয়োজন, উৎসব-আনন্দে মিলিত হওয়ার আরো অনেক উপলক্ষ। এ উপলক্ষের জোগান এল চারুকলা ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে, তরুণ শিক্ষকদের প্রণোদনায়। সমষ্টিমঙ্গল কামনা করে সজ্জিত শোভাযাত্রার ধারণা তাদের মধ্যে দেখা দেয় প্রথম, সেজন্য উপযুক্ত উপলক্ষ খুঁজছিল নবীন শিল্প-শিক্ষার্থীরা, কেবল উপলক্ষ নয়, খুঁজছিল উপযুক্ত ফর্মও, যা প্রকাশ করবে বাঙালির সত্তা ও আকুতি। স্বাভাবিকভাবে অনুমান করা যায়, এ প্রেরণার উৎস শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের শিল্পশিক্ষা, যিনি লোকায়ত শিল্পরূপের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দিতে ছিলেন সদা উন্মুখ। জয়নুল আবেদিন প্রয়াত হলেও এ শিল্পছাপ রয়ে গিয়েছিল তার প্রতিষ্ঠিত শিক্ষালয়ে। ১৯৮৬ সালে শিল্প শিক্ষালয়ের নবীন স্নাতকরা যশোরে আয়োজন করেছিল বর্ষবরণের সজ্জিত শোভাযাত্রার। ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বরে জয়নুল জন্মোৎসবে মুখোশ-মুকুট-ফেস্টুন নিয়ে আনন্দ শোভাযাত্রার আয়োজন করে শিক্ষার্থীরা এ আয়োজনে লোকসমাজের সাড়া তারা অনুভব করেছিলেন এবং সেটাই তাদের ব্রতী করে বাংলা বর্ষবরণের শোভাযাত্রার আয়োজনে। ১৯৮৯ সালের পহেলা বৈশাখ সকালে ঢাকঢোল নিয়ে সুসজ্জিত যে শোভাযাত্রা বের হয় চারুকলা ইনস্টিটিউট থেকে, তা তারুণ্যের আনন্দ-উৎসব হিসেবে মন কেড়ে নেয় শহরবাসীর। স্বৈরশাসনপীড়িত বাংলাদেশে বৈশাখের শোভাযাত্রা কেবল আনন্দময় ছিল না, ছিল প্রতিবাদীও। কেবল মনোমুগ্ধকরতা ছিল না এর অবয়বে, ছিল গভীরতাশ্রয়ী অনুসন্ধানও। যেসব প্রতীক তারা বেছে নেন শোভাযাত্রাকারীদের বহন করার জন্য, তার উৎস ছিল লোকশিল্প। ফলে বাংলার বর্ষবরণে অভিনব মাত্রা বয়ে আনল চারুকলা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে প্রবর্তিত শোভাযাত্রা, পরের বছর যা অভিহিত হলো মঙ্গল শোভাযাত্রা হিসেবে এবং চিরায়ত উৎসবের সঙ্গে যুক্ত করে অভিনব মাত্রা।

অশ্বত্থতলের বৈশাখি সংগীতায়োজনের মতো, কিংবা তারও চেয়ে অনেক বেশি দ্রুততায়, মঙ্গল শোভাযাত্রা ছড়িয়ে পড়ল সারাদেশে। এখানেও চারুকলার স্নাতক কিংবা শিক্ষার্থীদের রয়েছে বিশেষ ভূমিকা। শিল্পশিক্ষা এখন পেয়েছে বিস্তার, ঢাকার বাইরে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে গড়ে উঠেছে অনেক শিক্ষালয়, তারা হয়েছে মঙ্গল শোভাযাত্রার শৈল্পিক জোগানদার। ঢাকায় শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পী কিংবা শিল্প-নবিশরা তাদের নিজ নিজ জেলা-উপজেলা শহরে গিয়ে হাত লাগান মঙ্গল শোভাযাত্রা সজ্জাকরণের কাজে। ফলে বৈশাখের প্রথম প্রভাত প্রায় দেশব্যাপী জাতীয় এক শোভাযাত্রার রূপ নিয়েছে যা অভাবিত, অনন্য ও অভিনব। সাংস্কৃতিক জাগরণে যে শৈল্পিক মাত্রা প্রয়োজন সেটা আমরা অনেক সময়ে ভুলে যাই রাজনীতির চাপে। ছায়ানটের প্রভাতি সংগীতায়োজন কিংবা দেশব্যাপী প্রকৃতির কোলে এমনি সংগীতায়োজনের শৈল্পিক মাত্রাই তাকে এত প্রভাবসঞ্চারী করে তুলতে পেরেছে। এ আয়োজন দেশ, মানুষ, সমাজ, সংগীত, সংস্কৃতি একত্রে গেঁথে প্রকৃতি-বন্দনা ও মানব-বন্দনায় মুখর হয়ে ওঠে। মঙ্গল শোভাযাত্রাও নিছক কোনো আনন্দ-আয়োজন নয়, আনন্দ তার অনুষঙ্গ বটে, তবে সেই সুবাদে। এখানে আমরা পাই লোকশিল্পের নবায়ন ও নবউদ্ভাসন, ঐতিহ্যিক শিল্পের রূপশ্রী অবলম্বন করে সম্মিলিতভাবে রাজপথ পরিক্রমণ নিবিড় এক আনন্দ ও গভীর এক বার্তা সঞ্চার করে সবার মনে। মঙ্গল শোভাযাত্রা সবাইকে একত্র করে শিল্পের ঐতিহ্যিক ধারায়, এর নানা রূপানুসন্ধান। শৈল্পিক অভিযাত্রায় ব্রতী করে অনেককে। এ সাধনার সম্মিলিত মাত্রা একে জোগায় জাতীয় জাগরণের নতুন শক্তি। এসবের স্বীকৃতি আমরা দেখি ইউনেস্কোর ঘোষণায়, বাংলাদেশের মঙ্গল শোভাযাত্রা কালচারাল হেরিটেজ অব হিউম্যানিটির তালিকায় অন্তর্ভুক্তকরণে। স্বীকৃতি প্রদানের বার্তায় ইউনেস্কো যে উপলব্ধির পরিচয় দিয়েছে তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ইউনেস্কো বলেছে, মঙ্গল শোভাযাত্রা হয়ে উঠেছে সজীব ঐতিহ্য নিয়ে বাংলাদেশের মানুষের গর্ব, সেই সঙ্গে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় এবং অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাদের প্রত্যয় ও সাহসের পরিচয়।

মঙ্গল শোভাযাত্রা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে বটে; তবে এর মর্মবাণী সমাজে প্রতিষ্ঠার জন্য আরব্ধ রয়েছে অনেক কাজ। সমষ্টি মঙ্গলের বার্তা আমরা পাই বৈশাখি শোভাযাত্রা ও প্রভাতি সংগীতের দেশব্যাপী উদ্যোগ আয়োজনে। কিন্তু সমাজে এর প্রতিষ্ঠায় আরো সক্রিয়, আরো প্রত্যয়ী ও আরো সাহসী হওয়ার বাণী আমরা শুনতে পাই সংগীতের ও শোভাযাত্রার আয়োজনে। নতুন বছরে সেই নতুন পণ গ্রহণ করবে বাঙালি– এমনটাই সবার প্রত্যাশা।

লেখক: সাংস্কৃতিক ব্যক্তি, গবেষক ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি

মুজিবনগর দিবস

সতেরোই এপ্রিলের সেই অবিস্মরণীয় দিনটি

খালেক বিন জয়েনউদদীন

আমরা অনেকেই জানি না বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ৭ই মার্চ, ২৬শে মার্চ, ১০ই এপ্রিল, ১৬ই ডিসেম্বর ও ১০ই জানুয়ারির মতো একাত্তরের ১৭ই এপ্রিলও একটি অবিস্মরণীয় দিন। ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন এবং ২৬শে মার্চ তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১০ই এপ্রিল গঠিত হয় প্রথম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। ১৬ই ডিসেম্বর আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিজয় অর্জিত হয় এবং ১০ই জানুয়ারি বাহাত্তরে বঙ্গবন্ধু স্বদেশে ফিরে আসায় মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়।

১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের একটি চিত্র

অনুরূপভাবে একাত্তরের ১০ই এপ্রিলে গঠিত সরকারের আনুষ্ঠানিক শপথ অনুষ্ঠিত হয় ১৭ই এপ্রিল। এদিন শপথ অনুষ্ঠানে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র গৃহীত হয় এবং সরকার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এ প্রজন্মের অনেকের অজানা– শপথ অনুষ্ঠানটি কুষ্টিয়া জেলার চুয়াডাঙ্গা মহকুমার মেহেরপুরের অদূরে বৈদ্যনাথতলার ভবেরপাড়া আমবাগানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। শপথ অনুষ্ঠানের দিনই সরকার ঐ স্থানটির নামকরণ করেন মুজিবনগর। এই মুজিবনগরেই রাজধানী স্থাপন করেন এবং নিরাপত্তার কারণে সরকারের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন কলকাতার ৮ নম্বর থিয়েটার রোড থেকে।

মেহেরপুরের মুজিবনগর এখন আমাদের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্থাপনা। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সরকার তথা বিপ্লবী সরকারের প্রথম রাজধানী। আমরা প্রতিবছর তাই ১৭ই এপ্রিল মুজিবনগর দিবস পালন করি। স্বাধীনতার আটচল্লিশ বছরেও মুজিবনগরের ১৭ই এপ্রিলের ঐতিহাসিক স্মৃতি অমলিন। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সেই স্মৃতি কোনোদিন মোছা যাবে না। অবশ্য '৭৫-এর পর একুশ বছর কোনোদিনই ক্ষমতাসীন সরকার মুজিব এবং মজিবনগর ও মুজিবনগর দিবস শব্দগুচ্ছ উচ্চারণ করেনি। ভাবলে অবাক হতে হয়– মুজিবনগর সরকারই মুক্তিযুদ্ধকে যোগ্য নেতৃত্ব দিয়ে পরিচালিত করে এবং নয় মাসের মধ্যেই আমাদের দেশ শত্রুমুক্ত হয় পাকিস্তানিদের পরাজিত করে এবং তাদের আত্মসমর্পণের মাধ্যমে। তবে এ কথাও অনস্বীকার্য যে, আমাদের স্বাধীনতা অর্জনে ভারত-রাশিয়ার অবদান কোনোদিন ভোলার নয়।

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস সুদীর্ঘকালের। ১৭৫৭ সালের পর থেকে উপমহাদেশে হারানো স্বাধীনতা প্রাপ্তির লক্ষ্যে সংগ্রাম-আন্দোলন হয়েছে। ১৮৫৭ সালে সশস্ত্র যুদ্ধ হয়েছে। শত শত মানুষ প্রাণ দিয়েছে। ১৮৫৭-এর পরে একশ বছর উপমহাদেশে ব্রিটিশ তাড়ানোর ইতিহাস কারো অজানা নয়। অবশেষে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ব্রিটিশ সরকার ভারত ত্যাগের ঘোষণা দেয়। পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভক্ত হয়। ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। যার মূলে ছিল হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্ব– এক কথায় জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্ব। আমাদের পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। এক পর্যায়ে পূর্ব বাংলা পূর্ব পাকিস্তান নাম ধারণ করে। অপর অংশ পশ্চিম পাকিস্তান। তাও আবার হাজার মাইল দূরে। পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের কোনো মিল ছিল না। ধর্ম ছাড়া ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। অন্যদিকে পাকিস্তানিরাই শাসন ক্ষমতায় জেঁকে বসল। বাঙালিরা হলো বঞ্চিত ও শোষিত। সাতচল্লিশের স্বাধীনতার স্বাদ বিস্বাদে পরিণত হলো। স্বাধীনতার এক বছরের মধ্যেই তারা মাতৃভাষা বাংলার ওপর আক্রমণ করল। গুলি করে হত্যা করল বাংলা মায়ের দামাল ছেলেদের। এসব শোষণ, বঞ্চনা, নিপীড়ন ও হত্যার বিরুদ্ধে বাঙালি জেগে উঠল। আর এর নেতৃত্ব দিলেন শেখ মুজিব নামে গোপালগঞ্জের এক তরুণ নেতা। তিনি পাকিস্তানি অসাম্যের বিরুদ্ধে ৬ দফা ঘোষণা করলেন। পাকিস্তানিরা ছিল ধূর্তবাজ। তারা পাকিস্তান ভাঙার ষড়যন্ত্রের জন্য শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করল। এক পর্যায়ে বাঙালি জেগে উঠল। গণ-অভ্যুত্থানে আইয়ুবের মসনদ কেঁপে উঠল। মুক্তি পেলেন মুজিব সেই '৬৯-এর ২২শে ফেব্রুয়ারি। ২৩শে ফেব্রুয়ারি দেশের মানুষ তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করল। সত্তরে হলো সাধারণ নির্বাচন। নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর দল উভয় পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করল। বাঙালির দুর্ভাগ্য পাকিস্তানিদের সামরিক শাসক ইয়াহিয়া বাঙালির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে ২৫শে মার্চ বাংলাদেশে গণহত্যার নির্দেশ দেয়। অগত্যা বঙ্গবন্ধু ঐদিন দিবাগত রাতে অর্থাৎ ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ঘোষণার পর পরই তাঁকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। শুরু হয় বাঙালির পাকিস্তানিদের রুখে দেবার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। এক পর্যায়ে '৭০-এ নির্বাচিত প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্যরা আগরতলায় মিলিত হন এবং স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রণয়ন করে সরকার গঠন করেন। সিদ্ধান্ত হয়– ১৭ই এপ্রিল এই সরকার আনুষ্ঠানিক শপথ নিয়ে বিশ্বকে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের কথা জানিয়ে দেবে। আরো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় চুয়াডাঙ্গার মুক্ত অঞ্চল মেহেরপুরে শপথ হবে। সে মোতাবেক একাত্তরের ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার ভবেরপাড়ায় একটি বিপ্লবী সরকারের শপথ অনুষ্ঠিত হয়।

তখন এত প্রচারমাধ্যম ছিল না। রেডিও ছিল সবেধন নীলমণি। পাকিস্তান বেতারে খবরটি আদৌ প্রচারিত হয়নি। তবে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, আকাশবাণী ও বিবিসি যথারীতি বাংলাদেশ সরকারের আনুষ্ঠানিক শপথ ও জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করে। গোটা বিশ্ব জেনে যায় বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের কথা ও বাঙালির পাকিস্তানি হটানো যুদ্ধের কথা।

আগরতলায় ১০ই এপ্রিল ১৯৭১ সালে গঠিত সরকার কলকাতায় অস্থায়ী কার্যালয় স্থাপন করে। ১৭ই এপ্রিল শপথ অনুষ্ঠানের দিন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ-এর প্রিন্সিপাল এইডএমএনএ ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলাম (রহমত আলী) ছদ্মনাম নিয়ে প্রেসব্রিফিং করে দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের নিয়ে দুপুরের আগে বৈদ্যনাথতলায় পৌঁছান। সরকারের উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, মন্ত্রিপরিষদের সদস্য ক্যাপটেন এম. মনসুর আলী, এএইচএম কামারুজ্জামান, প্রধান সেনাপতি আতাউল গণি ওসমানী, অধ্যাপক ইউসুফ আলী, মহকুমা প্রশাসক তৌফিক-ই-এলাহী চৌধুরী, কমান্ডার আবু ওসমান চৌধুরী, ঝিনাইদহের পুলিশ সুপার মাহবুবউদ্দিন আহমদ, বিএসএফ-এর কর্নেল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল পবিত্র কালামে পাক তেলাওয়াতের মাধ্যমে। তেলাওয়াত করেন দর্শনা কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র মো. বাকের আলী। তেলাওয়াতের পর জাতীয় সংগীত গীত হয়। পরিচয় পর্বের শেষে নেতৃবৃন্দের ভাষণ ও সংবাদ সম্মেলন। সবশেষে মিষ্টি বিতরণ। দু-একদিনের মধ্যেই সমগ্র অঞ্চল ভাগ করে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করা হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ, শরণার্থীদের আশ্রয় এবং পাকিস্তানি সৈন্যের বাঙালি নিধনযজ্ঞের খবর বিদেশে প্রেরণের জন্য মুজিবনগর সরকার সঠিক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেন। অবশ্য সকল ক্ষেত্রেই সর্বপ্রথম ভারত সরকার, ভারতের জনসাধারণ বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও আসামের মানুষ সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন। অনেক রক্তক্ষয় ও প্রাণের বিনিময়ে আমরা হানাদারদের পরাস্ত করি ১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বরে।

১৭ই এপ্রিল শপথ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন অধ্যাপক ইউসুফ আলী। তেরো বিভক্তির এই ঘোষণাপত্রের পঞ্চম ভাগ থেকে অষ্টম ভাগ পর্যন্ত বলা হয়েছে:

> যেহেতু পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ তাহাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার পরিবর্তে এবং বাংলাদেশের প্রতিনিধিগণের সহিত আলোচনা অব্যাহত থাকা অবস্থায় একটি অন্যায় ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করে,
>
> এবং
>
> যেহেতু এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ তারিখে ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন এবং বাংলাদেশের মর্যাদা ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান,
>
> এবং
>
> যেহেতু একটি বর্বর ও নৃশংস যুদ্ধ পরিচালনায় পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ, অন্যান্যের মধ্যে, বাংলাদেশের বেসামরিক ও নিরস্ত্র জনগণের উপর নজীরবিহীন নির্যাতন ও গণহত্যার অসংখ্য অপরাধ সংঘটন করিয়াছে এবং এখনও অনবরত করিয়া চলিতেছে,
>
> এবং
>
> যেহেতু পাকিস্তান সরকার একটি অন্যায় যুদ্ধ চাপাইয়া দিয়া, গণহত্যা করিয়া এবং অন্যান্য দমনমূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতিনিধিগণের পক্ষে একত্রিত হইয়া একটি সংবিধান প্রণয়ন এবং নিজেদের মধ্যে একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে,
>
> এবং
>
> যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ তাহাদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিপ্লবী উদ্দীপনার মাধ্যমে বাংলাদেশের ভূখণ্ডের উপর তাহাদের কার্যকর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, সেহেতু আমরা বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ, বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী জনগণ কর্তৃক আমাদিগকে প্রদত্ত কর্তৃত্বের মর্যাদা রক্ষার্থে, নিজেদের সমন্বয়ে যথাযথভাবে একটি গণপরিষদরূপে গঠন করিলাম, এবং পারস্পরিক আলোচনা করিয়া,
>
> এবং
>
> বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করণার্থে, সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্ররূপে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করিলাম এবং তদ্দারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ইতিপূর্বে ঘোষিত স্বাধীনতা দৃঢ়ভাবে সমর্থন ও অনুমোদন করিলাম,
>
> এবং
>
> এতদ্দারা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, সংবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি থাকিবেন এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রজাতন্ত্রের উপ-রাষ্ট্রপতি থাকিবেন
>
> এবং
>
> রাষ্ট্রপতি প্রজাতন্ত্রের সকল সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হইবেন, ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতাসহ প্রজাতন্ত্রের সকল নির্বাহী ও আইন প্রণয়ন ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন, একজন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ এবং তাঁহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় অন্যান্য মন্ত্রী নিয়োগ ক্ষমতার অধিকারী হইবেন, কর আরোপণ ও অর্থ ব্যয়ন ক্ষমতার অধিকারী হইবেন, গণপরিষদ আহ্বান ও মূলতবীকরণ ক্ষমতার অধিকারী হইবেন,

[এই ঘোষণাপত্র সংবিধানের অংশ এবং তা সপ্তম তফসিল ১৫০ (২) অনুচ্ছেদে স্থাপিত]।

শপথ অনুষ্ঠানের পরেই সরকার মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা, বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গঠন, শরণার্থীদের আশ্রয়, যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ, বিদেশে দূতিয়ালী, ৫০ কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন বেতার কেন্দ্র স্থাপন এবং যোগ্য ও দক্ষ নেতৃত্বের কারণে নয় মাসেই দখলদার পাকিস্তানিবাহিনী আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে তাঁর নামেই মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত করেছিল তাঁর সহচর সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপটেন এম. মনসুর আলী ও এএইচএম কামারুজ্জামান। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অবদান অমলিন। আর বাংলাদেশ রাষ্ট্রের কারণেই বঙ্গবন্ধুর হত্যার পরে ৩রা নভেম্বর জেলখানায় তাঁদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে মুজিবনগর দিবস যুদ্ধ জয়ের লালিত স্বপ্নে উদ্বেলিত একটি দিন। সেদিন সমগ্র বাঙালি আত্মপরিচয়ের প্রথম ঠিকানা খুঁজে পেয়েছিল মেহেরপুরের আমবাগানে। সেদিনের অনুষ্ঠানের অনেকেই আজ বেঁচে নেই। কিন্তু তাঁদের যোগ্য নেতৃত্বদানের কথা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। আর আমিও সেদিনের অনুষ্ঠানের পুরো বিবরণ ভারতীয় হাইকমিশনের ধারণকৃত রেকর্ড সংগ্রহ করেছি উত্তরসূরিদের জন্য। এই মহান দিনটিতে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ক্যাপটেন এম. মনসুর আলী ও এএইচএম কামারুজ্জামানসহ একাত্তরের বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং সকল পর্যায়ের স্বাধীনতার অংশীদারদের। যাঁদের ত্যাগে আত্মদানে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছিল। স্মরণ করছি ভারতের মিত্রমাতা ইন্দিরা গান্ধীকে এবং ভারতের স্বাধীনতাকামী জনগণকে, যাঁরা আমাদের সর্বপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতা করে বাংলাদেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছিল।

লেখক: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

নিবন্ধ

কবিতায় নানামাত্রিক বৈশাখ বাঙালি ও বাঙালিয়ানা

বদরু মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান

ভাষাতাত্ত্বিক দিক থেকে আমরা বাঙালি। আমরা বাঙালি জাতির একটি অংশ স্বাধীন ভূখণ্ড বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে অবশ্যই বাংলাদেশি। তাই বাঙালি আর বাংলাদেশি একে অপরের ক্ষেত্রে যেমন পরিপূরক তেমনি অনিবার্যও বটে।

বাংলা ভাষার উদ্ভব বিচার করে যদি বিষয়টিকে সামনে নিয়ে আসি তবে অবশ্যই বলা যাবে যে, এ ভাষার জন্ম এদেশের এই সোদা কাদামাটি জলে, শিকড়টা অবশ্যই প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে বঙ্গজ। সুতরাং বাংলা এবং বঙ্গ ভাষাকে যতই ভোলানোর অপচেষ্টা হয়ে থাকুক বা হোক না কেন তা অবশ্যই ব্যর্থতায় পর্যবষিত হয়েছে এবং হবে। কারণ বাংলা ভাষা এমন একটি রক্তবীজ উৎপাদনকারী ভাষা যা অমর এবং অক্ষয়তার ইস্পাত দিয়ে মোড়ানো।

বাংলা এবং বাঙালিয়ানাকে ভুলিয়ে দেওয়ার একটি অপচেষ্টা চলেছিল আমাদের এই ভূখণ্ডকে পাকিস্তানিয়ানার মোড়কে আবৃত করার মধ্য দিয়ে। আর এরই ফলশ্রুতিতে '৪৮, '৫২ এবং '৭১। '৭১ সালে রক্তক্ষয়ী আন্দোলন-সংগ্রাম এবং মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়।

বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদার প্রশ্নে যে রক্তদান তার মধ্যে অবশ্যই বাঙালি সংস্কৃতিকে মেলে ধরা ও বিকশিত করার মহান উদ্যোগটিও ছিল। আমরা পাকিস্তানি নাকি বাঙালি এই বিপরীতধর্মী চৈতনিক প্রবণতা যখন একে অপরের মুখোমুখি ঠিক তখনই ছায়ানট (১৯৬১) একটি বটবৃক্ষের ছায়া হয়ে বৈশাখে আবির্ভূত হয়েছিল রমনার বটমূলে। রমনার বটমূলে করা ছায়ানটের ১লা বৈশাখের সেই উৎসব কালক্রমে বাঙালির তথা বাংলাদেশিদের জাতীয় উৎসবে পরিণত হলো। বৈশাখ তাই আমাদের জাতীয় জীবনের অনুষঙ্গ ও প্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়ালো। বৈশাখ এল রৌদ্রছায়ার লুকোচুরি কিংবা রুদ্র বৈশাখ হয়ে নয়, এল বাঙালির যাপিত জীবনের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে আদিকালের এক অনিবার্য ধারাবাহিকতায়।

বৈশাখ তাই এসেছে আমাদের বিশাল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক

বৈশাখি মেলায় মৃৎশিল্পের সমাহার

অগ্নিমুখ হয়ে। বৈশাখ অবশ্যই রুদ্র। তবে তা ভাঙনের জয়গান গাইতে গাইতে নবতর চেতনার উজ্জ্বল উদ্ভব। আর এই বিষয়টি উপলব্ধি করে বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বললেন, 'ঐ নতুনের কেতন ওড়ে/কালবৈশাখী ঝড়/তোরা সব জয়ধ্বনি কর'। ভাঙনের জয়গান এমন সুন্দর আর প্রাণবন্তভাবে আর কোনো দেশের কবি গেয়েছেন কি-না আমাদের জানা নেই। আবার বিশ্বকবি বাঙালির প্রাণের কবি রবীন্দ্রনাথ 'এসো হে বৈশাখ/এসো এসো' তে নতুনকে আহ্বান করেছেন নির্মিতির প্রশ্নটিকে সামনে রেখে।

বৈশাখ নিয়ে মজা করেছেন রসময় কবি সুকুমার রায়। তিনি বলেছেন,

> আম পাকে বৈশাখে কুল পাকে ফাগুনে
> কাঁচা ইট পাকা হয় পোড়ালে তা আগুনে।

কবি এখানে বৈশাখের রুদ্রমূর্তি ভুলে গিয়ে পাকা আম নিয়ে মেতে ওঠেন।

আবার আধুনিক কালের কবি তার গীতি কবিতায় বলেন,

> বৈশাখী মেঘের কাছে জল চেয়ে
> তুমি কাঁদবে আমি চাই না
> স্বপ্নকে সত্যি ভেবে তুমি কাঁদবে
> আমি চাই না।

বৈশাখি মেঘের সাথে না-পাওয়ার বেদনাকে এক করে দেবার যে শৈল্পিক ও সুরেলা প্রকাশ তা কবি আবু জাহিদের মর্মবেদনাকে ছুঁয়ে গেছে, শুধু কি কবিকে? অবশ্যই তা চিরচেনা বাঙালি হৃদয়ের এক অনবদ্য অনুরণন।

আবার পশ্চিমবঙ্গের এক গীতিকবি যখন গেয়ে ওঠেন–

> এক বৈশাখে দেখা হলো দুজনায়
> জ্যৈষ্ঠতে হলো পরিচয়
> আসছে আষাঢ় মাস
> মন তাই বলছে কি জানি কি হয়।

এই দেখা হওয়া এবং পাওয়া না-পাওয়ার দোলায় দোলায়িত ভাবনাকে বিশ্বের তাবৎ বাঙালির প্রেমিক মনকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। বৈশাখে কীভাবে কার সাথে দেখা হয়েছিল তার–নিশ্চয়ই কোনো এক বৈশাখি মেলাতে।

আবার যদি আমরা পেছনে ফিরে যাই রবীন্দ্রনাথে তাহলে তাঁর শঙ্খ কবিতার কাছে আমরা দেখব রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল কীভাবে এক জায়গায় এসে একাকার হয়েছেন–

> ধ্বংসের রূপে দেখা দিক আজ
> স্রষ্টা মধুসূদন
> মহারুদ্রের হউক উদ্বোধন।

বৈশাখ বাংলায় আসে একদিকে ধ্বংস আরেকদিকে গড়ার প্রত্যয় নিয়ে।

আবার কবি জীবনানন্দের ধূসর পাণ্ডুলিপি কাব্যের 'মৃত্যুর আগে' শিরোনামীয় কবিতায় ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ভাবনার সাথে বৈশাখের প্রকাশ ঘটে এভাবে–

> ... নরম জলের গন্ধ নিয়ে নদী বার বার তীরটিরে মাখে,
> খড়ের চালের ছায়া গাঢ় রাতে জ্যোৎস্নার উঠানে বাড়িয়াছে;
> বাতাসে ঝিঁঝির গন্ধ-বৈশাখের প্রান্তরের সবুজ বাতাসে
> নীলাভ নোনার বুকে ঘন রস প্রগাঢ় আকাঙ্ক্ষায় নেমে আসে,

উদ্ধৃত কবিতাংশের শেষদিকে বৈশাখি প্রান্তর আর সবুজ বাতাস এক হয়ে ধরা দিয়েছে।

আবার কল্লোলের কবি বিষ্ণু দে 'সন্দীপের চর' কাব্যে বৈশাখ এসেছে এভাবে–

> দগ্ধদিনে বৈশাখীর বৃষ্টি পড়ে
> ঈশান হাওয়ায় পড়ে ঝড়ের শান্তিতে পড়ে
> বৃষ্টি পড়ে খানায় ডোবায়
> বৃষ্টি পড়ে ...

বৈশাখে বৃষ্টি কবি দেখেন দগ্ধদিনের শীতল পরশ আর ঝড়ের পরে এক চিলতে শান্তির মতন। বৃষ্টির শব্দে কবি শুনতে পান টুংটাং চুড়ির শব্দও।

আবার কবি বিষ্ণু দে যুদ্ধের ভয়াবহতা ও প্রেমকে দেখেন এক অনন্য চেতনার অগ্নিতে ঝালিয়ে। তারই উচ্চারণ পাই তাঁর 'চোরাবালি' কাব্যগ্রন্থের 'ক্রেসিডা' শিরোনামের কবিতায়

> হেলেনের প্রেমে আকাশে বাতাসে ঝঞ্ঝার করতাল
> ফুলোকে ভূলোকে দিশাহারা দেবদেবী
> বৈশাখি মেঘ মেদুর হয়েছে সুদূর গগন কোণে
> কুরুক্ষেত্রে উড়েছে হাজার রথচক্রের ধূলি।
> স্বপ্ন গোধূলি ডুবে গেল খর রক্তের কোলাহলে।

'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার'-এর কবি বিষ্ণু দে তাঁর 'নদীর উৎস যদি জানা থাকে' কবিতায় বৈশাখকে এনেছেন এভাবে-

> আমার বৈশাখে তুমি শ্রাবণের সেই নদী
> প্রেমের লাবণ্যে স্নেহে কবিতায় আশ্বিনের স্বচ্ছ স্রোত
> পাড়ে পাড়ে ঝিকিমিকি এক ও অনেক।

মাহমুদ কামাল তাঁর 'এসো হালখাতা' কবিতায় বলেন–

> যদি বৈশাখের সাথে নারীর যৌবনকে তুলনা করি
> তবে কি খুব বেশী ভুল হবে–
> এই প্রশ্নে পরিকীন এক প্রাকৃত যুবতী
> আকাশের মতো উদার বিস্ময়ে বলে
> তবে সে বৈশাখ নয়-যুবতী বৈশাখী।

কবি এখানে বৈশাখের সাথে যুবতীর যৌবনকে তুলনা করে বৈশাখকে নিয়ে গেছেন এক অতিপ্রাকৃত ভাবনার মাত্রিকতায়। বৈশাখ এখানে এসেছে যুবতীর নিটোল শরীরকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে।

কবি কাজী নজরুল ইসলাম বৈশাখকে নিয়ে ভাঙনের জয়গান গেয়েছেন। সেই গান ভাঙনের তো বটেই তার সাথে ভয়ংকরও। রবীন্দ্রনাথও বৈশাখকে আহ্বান করেছেন ইতিবাচক নির্ভরতায় এবং তা গঠনমূলক। দুজন দু প্রকৃতির। একজন দুরন্ত আরেকজন শান্ত-সৌম্য।

আবার কবি কাজী রোজী বৈশাখকে তার কবিতায় এনেছেন অন্যভাবে। তিনি তাঁর 'বাতাসের বৈঠা' কাব্যগ্রন্থের 'বৈশাখের জ্বল জ্বলে কাহন' কবিতার এক জায়গায় বলেছেন–

> তোমরা যদি আসো
> আমি কাল বোশেখি ঝড় সহজে আসতে দেব না।
> মৃদুমন্দ বাতাসের সাথে
> টুপটাপ কাঁচা আম ঝরে যায় যাবে।
> ঝিনুকের ছুরি দিয়ে ফালি ফালি কেটে কেটে
> খাওয়াব সে আম।

সর্বোপরি বৈশাখ আমাদের চেতনায়, আমাদের সত্তায়। বৈশাখ দিয়েই শুরু। শেষ হলে আবার বৈশাখ। সেই বৈশাখ আমাদের মুক্তিযুদ্ধের গানে এসেছে এভাবে–

> ... বৈশাখেরই রুদ্র ঝড়ে
> আকাশ যখন ভেঙে পড়ে
> ছেঁড়া পাল আরও ছিঁড়ে যায়
> হাতছানি দেয় বিদ্যুৎ আমায়
> হঠাৎ কে যে শঙ্খ শোনায়
> শুনি ঐ ভোরের পাখি গায়।
> জানি শুধু বাইতে হবে তরী পার নিতে হবে
> আমি যে সাগর মাঝিরে
> তীর হারা এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেব রে...।

বৈশাখ আমাদের সকল কাজের সকল সংগ্রামের প্রেরণাদায়ী উৎস। আমাদের যাপিত জীবন এবং সংস্কৃতির প্রকাশ ও বিকাশে আছে বৈশাখ। বছর শেষ হলে নতুন বছরের প্রথম সকালটাই বলে দেয় এইতো এসেছি আমি। এইতো আমি তোমাদের। আমি তোমাদের চেতনায় ও বিশ্বাসে-নিশ্বাসে। বৈশাখ তাই বাঙালি সংস্কৃতি তথা বাঙালি জাতির সুখ-দুঃখ ও সংগ্রামের এক অমর মহাকাব্য।

লেখক: কবি ও প্রাবন্ধিক

স্বাধীনতা পুরস্কার পেলেন যাঁরা

জাতীয় পর্যায়ে গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ১২ বিশিষ্ট ব্যক্তি ও এক প্রতিষ্ঠানকে ২০১৯ সালের স্বাধীনতা পুরস্কারের জন্য চূড়ান্তভাবে মনোনীত করেছে সরকার। ১০ই মার্চ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এবছর স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য মনোনীত হয়েছেন– শহিদ বুদ্ধিজীবী মোফাজ্জল হায়দার (মরণোত্তর), শহিদ এটিএম জাফর আলম (মরণোত্তর), আবদুল খালেক (মরণোত্তর), অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ (মরণোত্তর)। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আকম মোজাম্মেল হক, ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, ডা. কাজী মিসবাহুন নাহার।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য মনোনীত হয়েছেন– ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডা. নূরুন্নাহার ফাতেমা বেগম, সমাজসেবক ও জনসেবায় ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ, সংস্কৃতিতে মুর্তজা বশীর, সাহিত্যে হাসান আজিজুল হক, গবেষণা ও প্রশিক্ষণে অধ্যাপক ড. হাসিনা খান এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রতিষ্ঠান হিসেবে মনোনীত হয়েছে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫শে মার্চ রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে দেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় এ পুরস্কার প্রদান করেন।

২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সরকার ১৯৭৭ সাল থেকে প্রতিবছর এ পুরস্কার দিয়ে আসছে।

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

পহেলা বৈশাখ
বাঙালির সর্বজনীন উৎসব

শামস সাইদ

পহেলা বৈশাখ বাংলা সনের প্রথম দিন, তথা বাংলা নববর্ষ। এ দিনটি বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গে নববর্ষ হিসেবে বিশেষ উৎসবের সাথে পালিত হয়। ত্রিপুরায় বসবাসরত বাঙালিরাও এই উৎসবে অংশ নেয়। সে হিসেবে এটি বাঙালির সর্বজনীন উৎসব। বিশ্বের সকল প্রান্তের বাঙালি এ দিনে নতুন বছরকে বরণ করে নেয়, ভুলে যাবার চেষ্টা করে অতীতের দুঃখ-গ্লানি। সবার কামনা থাকে নতুন বছরটি সমৃদ্ধ ও সুখময় হোক। ব্যবসায়ীরা নতুনভাবে ব্যবসা শুরুর লক্ষ্যে নতুন বছরকে বরণ করে নেয়। গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জি অনুসারে ১৪ই এপ্রিল অথবা ১৫ই এপ্রিল পহেলা বৈশাখ পালিত হয়। আধুনিক বা প্রাচীন যে-কোনো পঞ্জিকাতেই এই বিষয়ে মিল রয়েছে। বাংলাদেশে প্রতিবছর ১৪ই এপ্রিল এ উৎসব পালিত হয়। বাংলা একাডেমি কর্তৃক নির্ধারিত আধুনিক পঞ্জিকা অনুসারে এই দিন নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পহেলা বৈশাখে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে।

বৈশাখি মেলায় ঐতিহ্যবাহী লাঠিখেলা ও মোরগ লড়াই

বাংলা দিনপঞ্জির সঙ্গে হিজরি ও খ্রিষ্টীয় সনের মৌলিক পার্থক্য হলো হিজরি সন চাঁদের হিসাবে আর খ্রিষ্টীয় সন ঘড়ির হিসাবে চলে। এ কারণে হিজরি সনে নতুন তারিখ শুরু হয় সন্ধ্যায় নতুন চাঁদের আগমনে। ইংরেজি দিন শুরু হয় মধ্যরাতে। বাংলা সনের দিন শুরু হয় সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে। কাজেই সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় বাঙালির পহেলা বৈশাখের উৎসব।

বঙ্গাব্দের সূচনা সম্পর্কে দুটি মত চালু আছে। প্রথম মত অনুযায়ী– প্রাচীন বঙ্গদেশের (গৌড়) রাজা শশাঙ্ক (রাজত্বকাল আনুমানিক ৫৯০-৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ) বঙ্গাব্দ চালু করেছিলেন। সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে শশাঙ্ক বঙ্গদেশের রাজচক্রবর্তী রাজা ছিলেন। আধুনিক ভারতের বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার অধিকাংশ এলাকা তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অনুমান করা হয় যে, জুলিয়ান ক্যালেন্ডারের সোমবার ১২ই এপ্রিল ৫৯৪ এবং গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের সোমবার ১৪ই এপ্রিল ৫৯৪ বঙ্গাব্দের সূচনা হয়েছিল।

দ্বিতীয় মত অনুসারে, ভারতে ইসলামি শাসনামলে হিজরি পঞ্জিকা অনুসারেই সকল কাজকর্ম পরিচালিত হতো। মূল হিজরি পঞ্জিকা চান্দ্র মাসের উপর নির্ভরশীল। চান্দ্র বৎসর সৌর বৎসরের চেয়ে ১১/১২ দিন কম হয়। কারণ সৌর বৎসর ৩৬৫ দিন, আর চান্দ্র বৎসর ৩৫৪/৩৫৫ দিন। একারণে চান্দ্র বৎসরে ঋতুগুলো ঠিক থাকে না। চাষাবাদ ও এ জাতীয় অনেক কাজ ঋতুনির্ভর। এজন্য ভারতের মোগল সম্রাট আকবরের সময়ে প্রচলিত হিজরি চান্দ্র পঞ্জিকাকে সৌর পঞ্জিকায় রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সম্রাট আকবর ইরান থেকে আগত বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিদ আমীর ফতেহউল্লাহ সিরাজীকে হিজরি চান্দ্র বর্ষপঞ্জিকে সৌর বর্ষপঞ্জিতে রূপান্তরিত করার দায়িত্ব প্রদান করেন। আমীর ফতেহউল্লাহ সিরাজীর সুপারিশে পারস্যে প্রচলিত সৌর বর্ষপঞ্জির অনুকরণে ৯৯২ হিজরি অনুযায়ী ১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট আকবর হিজরি সৌর বর্ষপঞ্জির প্রচলন করেন। তবে তিনি উনত্রিশ বছর পূর্বে তার সিংহাসন আরোহণের বছর থেকে এ পঞ্জিকা প্রচলনের নির্দেশ দেন। এজন্য ৯৬৩ হিজরি সাল থেকে বঙ্গাব্দ গণনা শুরু হয়। ইতঃপূর্বে বঙ্গে প্রচলিত শকাব্দ বা শক বর্ষপঞ্জির প্রথম মাস ছিল চৈত্র। কিন্তু ৯৬৩ হিজরি সালের মহররম মাস ছিল বাংলা বৈশাখ, এজন্য বৈশাখ মাসকেই বঙ্গাব্দ বা বাংলা বর্ষপঞ্জির প্রথম মাস এবং ১লা বৈশাখকে নববর্ষ ধরা হয়।

নববর্ষ পালনের ইতিহাস থেকে জানা যায়। হিন্দু সৌর পঞ্জিকা অনুসারে বাংলা বারোটি মাস অনেক আগে থেকেই পালিত হতো। এই সৌর পঞ্জিকার শুরু হতো গ্রেগরীয় পঞ্জিকায় এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়। হিন্দু সৌর বছরের প্রথম দিন আসাম, বঙ্গ, কেরল, মনিপুর, নেপাল, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, তামিল নাড়ু এবং ত্রিপুরার সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে অনেক আগে থেকেই পালিত হতো। এখন যেমন নববর্ষ নতুন বছরের সূচনার নিমিত্তে পালিত একটি সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে। এক সময় এমন ছিল না। তখন নববর্ষ বা পহেলা বৈশাখ আর্তব উৎসব তথা ঋতুধর্মী উৎসব হিসেবে পালিত হতো। তখন এর মূল তাৎপর্য ছিল কৃষিকাজ। প্রাযুক্তিক প্রয়োগের যুগ শুরু না হওয়ায় কৃষকদের ঋতুর উপরই নির্ভর করতে হতো।

বাংলাদেশে পহেলা বৈশাখ নানাভাবে উদ্‌যাপন করা হয়। বিশেষ করে নতুন বছরের উৎসবের সঙ্গে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কৃষ্টি ও সংস্কৃতির নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। গ্রামে মানুষ ভোরে ঘুম থেকে ওঠে, নতুন জামাকাপড় পড়ে এবং আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে বেড়াতে যায়। বাড়িঘর পরিষ্কার করে, সুন্দর করে সাজায়। বিশেষ খাবারের ব্যবস্থাও থাকে। কয়েকটি গ্রামের মিলিত এলাকায়, কোনো খোলা মাঠে আয়োজন করে বৈশাখি মেলার। মেলাতে থাকে নানারকম কুঠির শিল্পজাত সামগ্রীর বিপণন, থাকে নানারকম পিঠা পুলির আয়োজন। অনেক স্থানে ইলিশ মাছ দিয়ে পান্তা ভাত খাওয়ার ব্যবস্থা থাকে। এই দিনের একটি পুরোনো সংস্কৃতি হলো গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন। এর মধ্যে থাকে নৌকাবাইচ, লাঠিখেলা কিংবা কুস্তির।

ঢাকা শহরে পহেলা বৈশাখের মূল অনুষ্ঠানের কেন্দ্রবিন্দু রমনা বটমূলে। সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানট-এর গানের মাধ্যমে নতুন বছরের সূর্যকে আহ্বান করে। পহেলা বৈশাখ সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ছায়ানটের শিল্পীরা সম্মিলিত কণ্ঠে গান গেয়ে নতুন বছরকে আহ্বান জানান। স্থানটির পরিচিতি বটমূল হলেও প্রকৃত পক্ষে যে গাছের ছায়ায় মঞ্চ তৈরি হয় সেটি বটগাছ নয়, অশ্বত্থ গাছ। ১৯৬০-এর দশকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নিপীড়ন ও সাংস্কৃতিক সন্ত্রাসের প্রতিবাদে ১৯৬৭ সাল থেকে ছায়ানটের এই বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের সূচনা।

বৈশাখি উৎসবের একটি আবশ্যিক অঙ্গ মঙ্গল শোভাযাত্রা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে পহেলা বৈশাখ সকালে এই শোভাযাত্রাটি বের হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় চারুকলা ইনস্টিটিউটে এসে শেষ হয়। এই শোভাযাত্রায়

গ্রামীণ জীবন এবং আবহমান বাংলাকে ফুটিয়ে তোলা হয়। শোভাযাত্রায় সকল শ্রেণি-পেশার বিভিন্ন বয়সের মানুষ অংশগ্রহণ করে। শোভাযাত্রার জন্য বানানো হয় রং-বেরঙের মুখোশ ও বিভিন্ন প্রাণীর প্রতিলিপি। ১৯৮৯ সাল থেকে এই মঙ্গল শোভাযাত্রা পহেলা বৈশাখের উৎসবের একটি অন্যতম আকর্ষণ।

ঈশা খাঁর সোনারগাঁয় ব্যতিক্রমী এক মেলা বসে পহেলা বৈশাখে। যার নাম 'বউমেলা'। জয়রামপুর গ্রামের মানুষের ধারণা, প্রায় ১০০ বছর ধরে পয়লা বৈশাখে শুরু হয় এই মেলা। চলে পাঁচ দিনব্যাপী। প্রাচীন একটি বটবৃক্ষের নিচে এই মেলা বসে, যদিও সনাতন ধর্মাবলম্বীরা সিদ্ধেশ্বরী দেবীর পুজো হিসেবে এখানে সমবেত হয়। বিশেষ করে কুমারী, নববধূ, এমনকি জননীরা পর্যন্ত তাঁদের মনস্কামনা পূরণের আশায় এই মেলায় এসে পূজা-অর্চনা করেন। সন্দেশ-মিষ্টি-ধান দূর্বার সঙ্গে মৌসুমি ফলমূল নিবেদন করে ভক্তরা। পাঁঠাবলির রেওয়াজও পুরোনো। তবে এখন বদলে যাচ্ছে পুরোনো অর্চনার পালা। এখন কপোত-কপোতি উড়িয়ে শান্তির বার্তা পেতে চায় ভক্তরা দেবীর কাছ থেকে। বউমেলায় কাঙ্ক্ষিত মানুষের খোঁজে কাঙ্ক্ষিত মানসীর প্রার্থনা কিংবা গান্ধর্ব প্রণয়ও ঘটে।

এছাড়া সোনারগাঁ থানার পেরাব গ্রামের পাশে আরেকটি মেলার আয়োজন করা হয়। এটির নাম ঘোড়ামেলা। লোকমুখে প্রচলিত জামিনী সাধক নামের এক ব্যক্তি ঘোড়ায় করে এসে নববর্ষের এই দিনে সবাইকে প্রসাদ দিতেন এবং তিনি মারা যাওয়ার পর ওই স্থানেই তাঁর স্মৃতিস্তম্ভ বানানো হয়। প্রতিবছর পহেলা বৈশাখে স্মৃতিস্তম্ভে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা একটি করে মাটির ঘোড়া রেখে এখানেও মেলার আয়োজন করে। এ কারণে লোকমুখে প্রচলিত মেলাটির নাম ঘোড়ামেলা। এ মেলার অন্যতম আকর্ষণ হচ্ছে নৌকায় খিচুড়ি রান্না করে রাখে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাই কলাপাতায় আনন্দের সঙ্গে তা ভোজন করে। সকাল থেকেই এ স্থানে মানুষের আগমন ঘটতে থাকে। শিশু-কিশোররা সকাল থেকেই উদগ্রীব হয়ে থাকে মেলায় আসার জন্য। এক দিনের এ মেলাটি জমে ওঠে দুপুরের পর থেকে। হাজারো লোকের সমাগম ঘটে। যদিও সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কারণে এ মেলার আয়োজন করা হয়। তথাপি সব ধর্মের লোকজনেরই প্রাধান্য থাকে এ মেলায়। এ মেলায় শিশু-কিশোরদের ভিড় বেশি থাকে। মেলায় নাগরদোলা, পুতুল নাচ ও সার্কাসের আয়োজন করা হয়। নানারকম আনন্দ-উৎসব করে পশ্চিমের আকাশ যখন রক্তিম আলোয় সজ্জিত উৎসবে যখন লোকজন অনেকটাই ক্লান্ত, তখনই এ মেলার ক্লান্তি দূর করার জন্য নতুন মাত্রায় যোগ হয় কীর্তন। এ কীর্তন হয় মধ্যরাত পর্যন্ত। এভাবেই শেষ হয় বৈশাখের এই ঐতিহ্যবাহী মেলা।

চট্টগ্রামে বর্ষবরণ

বন্দরনগরী চট্টগ্রামে পহেলা বৈশাখের উৎসবের মূল কেন্দ্র ডিসি পাহাড় পার্ক। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের আয়োজনে এখানে পুরোনো বছরকে বিদায় ও নতুন বছরকে বরণ করার জন্য দুদিনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মুক্তমঞ্চে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি থাকে নানা গ্রামীণ পণ্যের পসরা। থাকে পান্তা ইলিশের ব্যবস্থাও। চট্টগ্রামে সম্মিলিতভাবে পহেলা বৈশাখ উদ্যাপনের উদ্যোগ ১৯৭৩, ১৯৭৪ ও ১৯৭৫ সালে রাজনৈতিকগণের চেষ্টায়। ইস্পাহানি পাহাড়ের পাদদেশে এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। ১৯৭৮ সালে এই উৎসব এখনকার ডিসি হিল পার্কে সরিয়ে নেওয়া হয়। ১৯৭৮ সালের উদ্যোগের সঙ্গে জড়িত ছিলেন ওয়াহিদুল হক, নির্মল মিত্র, মিহির নন্দী, অরুণ দাশগুপ্ত, আবুল মোমেন, সুভাষ দে প্রমুখ। প্রথম দিকে প্রত্যেক সংগঠন থেকে দুজন করে নিয়ে একটি স্কোয়াড গঠন করা হতো। সেই স্কোয়াডই সম্মিলিত সংগীত পরিবেশন করত। ১৯৮০ সাল থেকে সংগঠনগুলো আলাদাভাবে গান পরিবেশন শুরু করে। পরে গ্রুপ থিয়েটার সমন্বয় পরিষদ যুক্ত হওয়ার পর অনুষ্ঠানে নাটকও যুক্ত হয়েছে। নগরীর অন্যান্য নিয়মিত আয়োজনের মধ্যে রয়েছে শিশু সংগঠন ফুলকীর তিন দিনব্যাপী উৎসব যা শেষ হয় বৈশাখের প্রথম দিবসে। নগরীর মহিলা সমিতি স্কুলে একটি বর্ষবরণ মেলা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার প্রধান তিনটি ক্ষুদ্র জাতিসত্তা রয়েছে যাদের প্রত্যেকেরই বছরের নতুন দিনে উৎসব আছে। ত্রিপুরাদের বৈশুখ, মারমাদের সাংগ্রাই ও চাকমাদের বিজু উৎসব। বর্তমানে তিনটি জাতিসত্তা একত্রে এই উৎসবটি পালন করে। যৌথ এই উৎসবের নাম বৈসাবি। উৎসবের নানা দিক রয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো মারমাদের পানি উৎসব।

পশ্চিমবঙ্গে পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন

পশ্চিমবঙ্গে মহাসমারোহে সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয় বাংলা নববর্ষারম্ভ পহেলা বৈশাখ। বঙ্গাব্দের প্রথম দিনটিতে বিপুল উৎসাহ এবং উদ্দীপনার সাথে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়ে থাকে সমগ্র পশ্চিম বাংলায়। বাংলার গ্রামীণ এবং নাগরিক জীবনের মেলবন্ধন সাধিত হয়ে সকলে একসূত্রে বাঁধা পড়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর আনন্দে। চৈত্র মাসজুড়েই চলতে থাকে বর্ষবরণের প্রস্তুতি। চৈত্র মাসের শেষ দিন অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তি বা মহাবিষুব সংক্রান্তির দিন পালিত হয় চড়কপূজা অর্থাৎ শিবের উপাসনা। এইদিনেই সূর্য মীন রাশি ত্যাগ করে মেষ রাশিতে প্রবেশ করে। এদিন গ্রামবাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে আয়োজিত হয় চড়ক মেলা। এই মেলায় অংশগ্রহণকারীগণ বিভিন্ন শারীরিক কসরৎ প্রদর্শন করে মানুষের মনোরঞ্জন করে থাকে। এছাড়া বহু পরিবারে বর্ষশেষের দিন টক এবং তিতা ব্যঞ্জন ভক্ষণ করে সম্পর্কের সকল তিক্ততা ও অম্লতা বর্জন করার প্রতীকী প্রথা একবিংশ শতাব্দীতেও বিদ্যমান। পরেরদিন অর্থাৎ পহেলা বৈশাখ প্রতিটি পরিবারে স্নান সেরে বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রণাম করার রীতি বহুলপ্রচলিত। বাড়িতে বাড়িতে এবং সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চলে মিষ্টান্ন ভোজন। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকাংশই এদিন থেকে তাদের ব্যবসায়িক হিসাবের নতুন খাতার উদ্‌বোধন করে, যার পোশাকি নাম হালখাতা। গ্রামাঞ্চলে এবং কলকাতা শহরের উপকণ্ঠে পয়লা বৈশাখ থেকে আরম্ভ হয় বৈশাখি মেলা। এই মেলা সমগ্র বৈশাখ মাসজুড়ে অনুষ্ঠিত হয়।

ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী কলকাতা পয়লা বৈশাখ উদ্‌যাপনে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। নববর্ষারম্ভ উপলক্ষে শহরের বিভিন্ন পাড়ার অলি-গলিতে নানা সংগঠনের উদ্যোগে প্রভাতফেরি আয়োজিত হয়। চৈত্র মাসে শহরের অধিকাংশ দোকানে ক্রয়ের উপর দেওয়া হয়ে থাকে বিশেষ ছাড়, যার প্রচলিত কথ্য নাম 'চৈত্র সেল'। তাই পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে এবং এই ছাড়ের সুবিধা গ্রহণ করতে অর্থনৈতিক অবস্থা নির্বিশেষে কলকাতার সমস্ত মানুষ একমাস ধরে নতুন জামাকাপড় ইত্যাদি ক্রয় করে থাকে। পহেলা বৈশাখের দিন উল্লেখযোগ্য ভিড় চোখে পড়ে কলকাতার বিখ্যাত কালীঘাট মন্দিরে। সেখানে বিভিন্ন ব্যবসায়ী ভোর থেকে প্রতীক্ষা করে থাকেন দেবীকে পূজা নিবেদন করে হালখাতা আরম্ভ করার জন্য। ব্যবসায়ী ছাড়াও বহু গৃহস্থও পরিবারের মঙ্গল কামনা করে দেবীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে কালীঘাটে গিয়ে থাকেন। এইদিন বাঙালির ঐতিহ্যবাহী পোশাক ধুতি-পাঞ্জাবি এবং শাড়ি পড়ার রেওয়াজ প্রচলিত।

বাংলা একাডেমি কর্তৃক বাংলা সন সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয় ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬ সালে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র নেতৃত্বে এ কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি বিভিন্ন বাংলা মাস ও ঋতুতে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সাংস্কৃতিক জীবনে কিছু সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতাকে নির্ণয় করে সেগুলো থেকে উত্তরণের প্রস্তাবনা প্রদান করেন। কমিটির প্রস্তাব অনুযায়ী বাংলা একাডেমি সরকারিভাবে এই সংশোধিত বাংলা মাসের হিসাব গ্রহণ করে। যদিও ভারতের পশ্চিম বাংলায় পুরোনো বাংলা সনের প্রচলনই থেকে গেছে।

লেখক: কথাসাহিত্যিক

বাংলা নববর্ষের কথা

মিজানুর রহমান মিথুন

বাঙালি জীবনের অন্যতম প্রধান উৎসব পহেলা বৈশাখ। এ দিন বর্ষবরণের দিন। শুভ বাংলা নববর্ষ। দিনটি আমাদের জীবনে নিয়ে আসে সীমাহীন উৎসব আর আনন্দ। আলপনা আঁকা, শাড়ি আর পাঞ্জাবি পড়া এদিনে সবার কাছে একটি অপরিহার্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই সঙ্গে লাল-সবুজ আর সাদার মিশ্রণে হাতে, গালে ফুলকি আঁকা এখন নতুন সংযোজন হয়েছে। ধীরে ধীরে প্রতিবছরই বর্ষবরণের আয়োজনের পরিধি বেড়ে চলছে। দেশের বিভিন্ন টেলিভিশন রমনার বটমূলের বর্ষবরণের বিশেষ আয়োজনটি সরাসরি সম্প্রচার করছে। পান্তা-ইলিশ, বাঁশি, ঢাকঢোলের বাজনায় আর মঙ্গল শোভাযাত্রায় পূর্ণতা পাচ্ছে বাঙালির এ বর্ষবরণ উৎসব।

এবার জেনে নেওয়া যাক এ বর্ষবরণের আদিকথা, সৌরপঞ্জি থেকে জানা যায়, বাংলায় বারোটি মাস অনেক আগে থেকেই হিসাব হয়ে আসছে। কিন্তু গ্রেগরীয় পঞ্জিকায় দেখা যায়, এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময় এই সৌর বছর গণনা শুরু হতো। ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্য শুরুর পর থেকে আরবি বছর হিজরি পঞ্জিকা অনুযায়ী তারা কৃষিপণ্যের খাজনা আদায় করত। কিন্তু হিজরি সাল চাঁদের ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় কৃষি ফলনের সাথে এর কোনো মিল পাওয়া যেত না। আর তখনই সম্রাট আকবর-এর সুষ্ঠু সমাধানের জন্য বাংলায় বর্ষপঞ্জি সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সম্রাটের অনুরোধে সে সময়কার বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদ আমীর ফতেহউল্লাহ সিরাজী সৌর বছর ও আরবি হিজরি সালেরও ওপর ভিত্তি করে নতুন বাংলা সনের নিয়ম তৈরির কাজ শুরু করেন। বাংলা বছর নির্ধারণ নিয়ে লেখা বিভিন্ন বইয়ের প্রাপ্ত তথ্যমতে, ১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই মার্চ বা ১১ই মার্চ থেকে বাংলা সন গণনা শুরু হয়। তবে পরীক্ষামূলক এই গণনা পদ্ধতিকে কার্যকর ধরা হয় ১৫৫৬ সালের ৫ই নভেম্বর তারিখ থেকে। অর্থাৎ সম্রাট আকবরের সিংহাসন আরোহণের তারিখ থেকে।

প্রথমে 'ফসলি সন' বলা হলেও পরে 'বঙ্গাব্দ' বা 'বাংলা বর্ষ' নামে পরিচিতি পেতে শুরু করে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলা মাসের নামগুলো বিভিন্ন তারকারাজির নাম থেকে নেওয়া হয়েছে। যেমন- বিশাখা থেকে বৈশাখ, জেষ্ঠ্যা থেকে জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়া থেকে আষাঢ়, শ্রবণা থেকে শ্রাবণ, ভাদ্রপদ থেকে ভাদ্র, কৃত্তিকা থেকে কার্তিক, অগ্রইহনী থেকে অগ্রহায়ণ, পূষ্যা থেকে পৌষ, মঘা থেকে মাঘ, ফল্গুনি থেকে ফাল্গুন এবং চিত্রা থেকে চৈত্র। আগেকার দিনে অগ্রহায়ণ মাসে ধান কাটা শুরু হতো বলে এই মাসকে বছরের প্রথম মাস ধরা হতো। তাই এ মাসের নামই রাখা হয় অগ্রহায়ণ। অগ্র অর্থ প্রথম আর হায়ন অর্থ বর্ষ বা ধান।

তখনকার দিনে শুধু কৃষিকাজ করার তাৎপর্যকে ধারণ করেই বাংলায় বছর গণনার রীতি চালু হয়। কিন্তু বহির্বিশ্বের সাথে বাঙালিদের যোগাযোগ নিরবচ্ছিন্ন রাখার সুবিধার্থে বাংলাদেশের সব জায়গাতেই খ্রিষ্টীয় সন ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশে প্রতিবছর ১৪ এপ্রিল নববর্ষ পালিত হয়। বাংলা একাডেমি কর্তৃক নির্ধারিত পঞ্জিকা অনুসারে এ দিনটিকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। বাংলা দিনপঞ্জির সাথে হিজরি ও খ্রিষ্টীয় সনের মৌলিক কিছু পার্থক্য রয়েছে। তাহলো হিজরি সাল চলে চাঁদের সাথে আর খ্রিষ্টীয় সাল চলে ঘড়ির সাথে। এ কারণে হিজরি সনের নতুন তারিখ শুরু হয় সন্ধ্যায় নতুন চাঁদের আগমনের মধ্য দিয়ে, ইংরেজি দিন শুরু হয় মধ্যরাতে আর বাংলা সনের শুরু হয় সূর্য ওঠার মধ্য দিয়ে।

বাংলাদেশে বর্ষবরণের মূল আয়োজন ঢাকার রমনা পার্কের বটমূলকে ঘিরেই। সেই আনন্দ আয়োজন আর পান্তা ইলিশের বাঙালিয়ানায় পুরো জাতি নিজেকে খুঁজে ফিরে ফেলে আসা গত দিনগুলোর স্মৃতি রোমন্থন আর নতুন অনাগত সময়কে বরণের ব্যস্ততায়।

বর্ষবরণের অনুষ্ঠানমালায় ভিন্নমাত্রা যোগ করেছে মঙ্গল শোভাযাত্রা। ১৯৮৯ সালে এই শোভাযাত্রার প্রচলন শুরু করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা। পহেলা বৈশাখের মঙ্গল শোভাযাত্রা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে বের হয়ে রাজধানীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এখানে পশুপাখির মুখাকৃতির ছবিসহ গ্রামীণ ঐতিহ্যের নানা অনুষঙ্গকে ফুটিয়ে তোলা হয় নানা রং-বেরঙের মুখোশ ও আলপনার মাধ্যমে। ছেলে বুড়ো সবাই তখন মেতে ওঠে বর্ষবরণের মঙ্গল শোভাযাত্রার আনন্দে।

বৈশাখ মাস বলতে তো মেলার মাসকেই বোঝায়। বাঁশের বেতের তৈজস আর নানা জাতের খেলার সামগ্রী, নারকেল মুড়কিসহ আরো কত কী থাকে এসব মেলায় তার ইয়ত্তা নেই। মেলার সময়ে নৌকাবাইচ, লাঠিখেলা, কুস্তির আসর বসে। চট্টগ্রামে লালদীঘির ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় ঐতিহ্যবাহী জব্বারের বলিখেলা।

প্রাচীন বর্ষবরণের রীতির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবেই জড়িত একটি বিষয় হলো হালখাতা। তখন প্রত্যেকে চাষাবাদ বাবদ চৈত্র মাসের শেষ দিনের মধ্যে সকল খাজনা, মাশুল ও শুল্ক পরিশোধ করে দিত। এরপর দিন অর্থাৎ পহেলা বৈশাখ ভূমির মালিকরা তাদের প্রজা সাধারণের জন্য মিষ্টান্ন দিয়ে আপ্যায়নের ব্যবস্থা রাখতেন। যা পরবর্তীতে ব্যবসায়িক পরিমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে। দোকানিরা সারা বছরের বাকির খাতা সমাপ্ত করার জন্য পহেলা বৈশাখের দিনে নতুন সাজে বসে দোকানে। গ্রাহকদের মিষ্টিমুখ করিয়ে শুরু করেন নতুন বছরের ব্যবসা। এ উৎসবগুলো সামাজিক রীতির অংশ হিসেবে পরিণত হয়েছে। এখনো গ্রাম ছাড়াও নববর্ষে হালখাতার হিড়িক পড়ে বাজার, বন্দর ও গঞ্জে।

আধুনিক নববর্ষ পালন সম্পর্কে জানা যায়, ১৯১৭ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশদের বিজয় কামনা করে সে বছর পহেলা বৈশাখে হোম, কীর্তন ও পূজার আয়োজন করা হয়েছিল। এরপরে ১৯৮৩ সালে একইভাবে ভালো কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয় নববর্ষ পালনের জন্য। ১৯৬৭ সালের আগে ঘটা করে পহেলা বৈশাখ পালন করা হয়নি। এরপর থেকে প্রতিবছরই বাড়তে থাকে পহেলা বৈশাখ বরণের আয়োজন।

অতীত বছরের পুরোনো দুঃখ-দুর্দশা ভুলে পুরো জাতিই মেতে ওঠে পহেলা বৈশাখের নববর্ষ পালনের আনন্দে। জাতীয় এই উৎসবটি এখন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো অসাম্প্রদায়িক উৎসবে পরিণত হয়েছে। এদিনে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই বাংলা বছরের প্রথম দিনকে বরণের আনন্দে থাকে মাতোয়ারা। উৎসব প্রিয় বাঙালিরা জাতীয় উন্নয়নে এসব পার্বণ থেকে নতুন উদ্যম নিয়ে দেশের জন্য কাজ করলেই পিছিয়ে থাকবে না আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি। আমরা ক্রমান্বয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাবো।

লেখক: সহ-সম্পাদক, জাগোনিউজ ২৪.কম

পানি ব্যবস্থাপনা

সুফিয়া বেগম

২২শে মার্চ বিশ্ব পানি দিবস। বিগত একটি বছরে পানি দিবসের প্রতিপাদ্যে পানির সঙ্গে কর্মসংস্থানের কথা বলা হয়েছিল। এ বছরের পানি দিবসের প্রতিপাদ্য: ‘Leaving no one behind’ যা বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত যথার্থ। পরিবেশবিদরা দাবি করেছেন, বিশ্বে সুপেয় পানির চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে ভারসাম্য নেই বলে পৃথিবীর শতকরা ৬০ ভাগ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাই বিভিন্ন নদনদীর পানি সংরক্ষণ, নাব্যতা অক্ষুণ্ন, আন্তঃদেশীয় নদনদীর পানির ন্যায্য হিস্যা আজ সময়ের দাবি। বিশ্ব পরিবেশ ও প্রতিবেশের সঙ্গে টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেলক্ষ্যে ২০শে মে ২০১৩ সালে থাইল্যান্ডের চিয়াইমাইয়ে আন্তর্জাতিক দ্বিতীয় এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বের ৭৩০ কোটি মানুষের মধ্যে শতকরা ৩০ জনের বাস এশিয়া মহাদেশে। ৫৭টি সীমান্ত সংলগ্ন নদী রয়েছে। এগুলোর ৫৪টি ভারত-বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। এই অভিন্ন নদীর পানির হিস্যা বণ্টন, নদী শাসন ও নদী ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রয়োজন পরস্পরের প্রতি সহমর্মী হওয়া। সম্প্রতি বিপাশা, রবি ও শতদ্রু নদীর পানি আটকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত। পূর্বে ভারত এই তিনটি নদীর পানির শতকরা ৯৩ থেকে ৯৪ ভাগ ব্যবহার করত, অবশিষ্ট পানি এতদিন পাকিস্তান ব্যবহার করে আসছে। বর্তমানে নয়াদিল্লি উল্লিখিত এই তিন নদীর পানি পাকিস্তানকে না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ১৯৬০ সালে বিশ্বব্যাংকের মধ্যস্থতায় দুই দেশের মধ্যে সম্পাদিত সিন্ধু চুক্তি অনুযায়ী ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ৬টি নদীর পানি ভাগাভাগি করা হয়। এর মধ্যে পূর্বাঞ্চলের তিনটি নদী বিপাশা, রবি এবং শতদ্রুর নিয়ন্ত্রণ ভারতের হাতে। আর পশ্চিমাঞ্চলের তিনটি নদী সিন্ধু, ঝিলম এবং চন্দ্রভাগ পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণে। ভারতের পানি সম্পদমন্ত্রী নীতিন গড়করি স্পষ্ট করেই জানান, নিজেদের অধিকারে থাকা এই তিনটি নদীর পানি যমুনা নদীর দিকে ঘুরিয়ে দিবে ভারত। এতে বাড়তি সুবিধা পাবে ভারতের মানুষ। উজানের দেশ বরাবরই যৌথ নদীর পানি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সুবিধা পেয়ে আসছে। ভাটির দেশ অনেক ক্ষেত্রেই বঞ্চিত হয়। ভারত যখন উজানের দেশ, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান তখন ভাটির দেশ। আবার চীন যখন উজানের দেশ, ভারত তখন ভাটির দেশ। যে নদী এক বা একাধিক দেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয় সেটি আন্তর্জাতিক নদী। পানির হিস্যার প্রশ্নে পানির একচেটিয়া ব্যবহার নয়; সমঝোতার ভিত্তিতে হবে পানি ব্যবহার। প্রাকৃতিক জলপ্রবাহের ধারা এমনভাবে পরিবর্তন করা যাবে না, যার পরিণতি অন্যান্য রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রসমূহের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে।

১৯৯২ সালে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্ব ধরিত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় যে বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাতে বিশ্বের সব নাগরিকের জন্য দারিদ্র্যমুক্তি, নিরাপদ খাবার পানি ও সঠিক পয়ঃনিষ্কাশনের কথা বলা হয়েছে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে নিরাপদ পানি পাওয়ার সুযোগ একটি মানবাধিকার বলে ঘোষণা দেওয়ার পরও ৭৫ কোটির বেশি মানুষ এই মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত রয়েছে। নিরাপদ পানি পানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত অধিকাংশ মানুষই দরিদ্র। তারা বাস করে গ্রামাঞ্চলে কিংবা বস্তিতে। ইউনিসেফ ও ডব্লিউএইচও’র হিসাব মতে, বিশ্বের মোট জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ বাস করে ১০টি দেশে। দেশগুলোর মধ্যে ভারত, পাকিস্তান, নাইজেরিয়া, ইথিওপিয়া, ইন্দোনেশিয়া, কঙ্গো, তানজানিয়া ও কোরিয়ার অধিকাংশ জনগণ নিরাপদ পানি পান থেকে বঞ্চিত রয়েছে।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, নিরাপদ খাবার পানি, জলজ প্রাণীদের জন্য নদী, খাল-বিল-ঝিল, হাওর-বাঁওড় ও অন্যান্য জলাভূমি রক্ষণাবেক্ষণ, নৌপথ সচল রাখা, নদীর তীর ও উপকূলীয় অঞ্চলের সুরক্ষা সেই সঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপাদন অব্যাহত রাখা বিশ্ব পানি ব্যবস্থাপনারই অংশ।

নদনদী দখল-দূষণমুক্ত রাখা, নৌপথের নাব্যতা রক্ষা, পানি সম্পদের সদ্ব্যবহার, সুষম বণ্টন এসবই আমাদের নদী ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত। নদী বাঁচলে দেশ বাঁচবে। ছোটো নদী ও খালের প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেলে ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়া পড়ে মৎস্য, নৌ-চলাচল ও উদ্ভিদের ওপর। বিগত শতাব্দীর আশির দশক পর্যন্ত পানি ব্যবস্থাপনার প্রধান লক্ষ্য ছিল– বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অপরিকল্পিত নগরায়ন, জলাধার দখল-দূষণ, মাত্রাতিরিক্ত ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের কারণে আমাদের পানি নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব এক্ষেত্রে এক ভারসাম্যহীন অবস্থার সৃষ্টি করেছে। পৃথিবীর মোট পানির শতকরা ২.৯৭ ভাগ পানের যোগ্য। বাদ বাকি শতকরা ৯৭.৩ ভাগ সমুদ্রের পানি যা পানের অযোগ্য। তাই বৃষ্টির পানি ও বরফগলা পানিই আমলযোগ্য। সীমান্ত নদীর পানির হিস্যা, সুষ্ঠু বণ্টন এবং ভূগর্ভস্থ ও ভূপৃষ্ঠের পানির সঠিক ব্যবহার পানির চাহিদা ও সরবরাহের ব্যবধান কমিয়ে আনবে নিঃসন্দেহে। ক্রমবর্ধমান শিল্পে পানির চাহিদা, সমন্বিত কৃষিতে পর্যাপ্ত সেচ ব্যবস্থা আমাদের টেকসই উন্নয়নের অংশ। তাই বিভিন্ন নদনদীর পানি সংরক্ষণ, নাব্যতা অক্ষুণ্ন, অন্যান্য আন্তঃদেশীয় নদনদীর পানির ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিতকরণ আজ চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিয়েছে।

তবে আন্তঃদেশীয় নদীর পানি বণ্টন দিন দিন জটিল হয়ে উঠছে। প্রবহমান অভিন্ন নদীর দুটি দেশের মধ্যে পরস্পরের প্রতি আস্থা ও সদিচ্ছা না থাকলে পানি বণ্টন চুক্তি হলেও যথোপযুক্ত বাস্তবায়ন না হলে ভাটিতে অবস্থানরত দেশটি পানির ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত

শুধু তুমি জানবে না

নাসির আহমেদ

একটা নদীর সঙ্গে তোমার দেখা হতে পারতো যদি একবার
আসতে ওই বিচ্ছিন্ন শহর ছেড়ে; এই হৃদয়হীন অচেনা মুখের
ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের পশ্চিম দুয়ার খুলে তোমার মাটিতে যদি আসতে
এই শীতে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তোমার জন্য প্রতীক্ষার রোদ।
তোমার অপেক্ষায় বিষণ্নতায় স্তব্ধ হয়ে আছে একটা নিষ্প্রাণ ঢেউহীন
নদী, আনন্দসাঁতারে যেখানে তুমি কবিতার ছন্দ খুঁজেছো একদিন।
একটা বিপন্ন গ্রাম তার সমস্ত সবুজ আর মমতার হাত এখনো
বাড়িয়ে আছে তোমাকে আলিঙ্গন করতে; তীব্র আবেগে
কম্পমান সেই বিধুর গ্রামের সঙ্গে তোমার নাড়ির সম্পর্ক
তোমার শূন্যতায় ম্লান সূর্যের আলো, বিবর্ণ ধূসর ঘাসেরা।
একটা গৌরবের ইতিহাস রক্ত দিয়ে লেখা ভালোবাসার কিংবদন্তি
কী রকম ক্ষণকালীনতার তাণ্ডবে ক্ষতবিক্ষত। মহাকালের
সূর্য কীভাবে মিথ্যের কুয়াশা ঢেকে দিচ্ছে– যদি তুমি
দেখতে, নিশ্চয়ই বুঝতে তোমার শূন্যতায়ই ঘটছে এসব।
তোমাকে যদি সবুজ বনভূমি, উদার পাহাড় অথবা মহান
নিসর্গের সঙ্গে তুলনা করা যেত, তাহলে বুঝতে
কী অপার সম্ভাবনা ধ্বংস হতে পারে, মরুময় হয়ে যেতে
পারে একটা আশ্চর্য সবুজ ভূগোল আর তার পবিত্র নদী।
এমন দিগন্তপ্লাবি শস্যসম্ভাবনা এই হেমন্তে এই শীতে
অকালে নষ্ট হয়ে গেল জীবনানন্দের রূপসী বাংলায়
তোমার অভাবে, শুধু তুমি জানলে না। ভালোবাসা না পেলে
ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল গোপন কান্নার প্লাবনে ভেসে যায়।
ভালোবাসা না পেলে স্বদেশ বিধ্বস্ত হয়ে যায়, অকালে মাতৃহীন
হয়ে যায় নিরীহ সন্তান, শোকে শস্যহীন হয়ে যায় দেশ।

রয়েই যাবে। অভিন্ন নদীর পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে অবশ্যই উভয় দেশের পরস্পরের ক্ষেত্রে সহমর্মী ও চমৎকার এক সমঝোতা থাকতে হবে।

ভারত বাংলাদেশের বৃহৎ প্রতিবেশী ও বন্ধু রাষ্ট্র। সম্প্রতি অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ সুবিধা পাবার লক্ষ্যে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার এলাহাবাদ থেকে হলদিয়ায় ১ হাজার ৬০০ কিলোমিটার দীর্ঘ মোট ১৬টি বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা করছে। নতুন করে বাঁধ নির্মিত হলে গঙ্গার পানি প্রবাহে ব্যাপক পরিবর্তন আসবে। বাংলাদেশের নদনদীতে এর নেতিবাচক প্রভাব এড়ানো যাবে না। ইতোমধ্যে ভারতের গঙ্গা নদীর ওপর নির্মাণ করেছে ছোটো-বড়ো ৪০০টি বাঁধ।

বলাবাহুল্য ফারাক্কা বাঁধ, আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প এবং টিপাইমুখ বাঁধ সবটাই বাংলাদেশের পানি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা। সেই সঙ্গে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহকে বাঁধাগ্রস্ত করছে কৃত্রিম খাল। ভারত যদি গঙ্গার উপরে ১৬টি বাঁধ নির্মাণ করে তাতে নদীমাতৃক বাংলাদেশের চিত্র এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে। নিঃসন্দেহে গঙ্গা নদীর ওপর ফাঁরাক্কা বাঁধ, মেঘনা নদীর মূল প্রবাহে বরাক নদীর ওপর টিপাইমুখ বাঁধ, পিয়াই নদীর ওপর পিয়াই বাঁধ, মহুরী নদীতে বেলুনিয়া বাঁধ, খোয়াই নদীর ওপর শহর প্রতিরক্ষা বাঁধ– সবটাই সুজলা-সুফলা বাংলাদেশের জন্য মরণ ফাঁদ।

যেখানেই বাঁধ সেখানেই শুরু হয় নদীর সঙ্গে মানুষের এক অসম লড়াই। অথচ নদী পাড়ের মানুষের সঙ্গে নদীর সুনিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠা সখ্য সভ্যতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নদীতে বাঁধ দিলে কিংবা নদীর গতিপথ পরিবর্তন করা হলে নদী অববাহিকায় বসবাসকারী মানুষের জীবন ও জীবিকা বিপন্ন হয় অনায়াসেই।

১৯৯৮ সালের ২২শে ডিসেম্বর সরকার দেশে প্রথম জাতীয় পানি নীতি ঘোষণা করেছে। পানিনীতিতে উল্লেখ করা হয়েছে জনস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার কথা। সেই সঙ্গে দারিদ্র্য বিমোচন এবং খাদ্য স্বনির্ভরতা। প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষায় জাতীয় লক্ষ্য পূরণে পানিনীতি ঘোষিত হয়েছিল। পানিনীতি দেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে– এটা সকলেরই কাম্য।

পৃথিবীতে প্রায় ২১৪টি আন্তর্জাতিক নদী রয়েছে। নদী নিয়ে বিরোধ আমরা যুগে যুগে লক্ষ করেছি। আন্তর্জাতিক নদী ব্যবহারের ক্ষেত্রে ১৮১৫ সালে ভিয়েনা সম্মেলন, ১৯২১ সালে দানিয়ুব নদী কমিশন কর্তৃক প্রণীত আইন, ১৯৬৬ সালে আন্তর্জাতিক আইন সমিতির হেলসিংকি সম্মেলনে গৃহীত নীতিমালা এবং ১৯৭২ সালে স্টকহোমে অনুষ্ঠিত কনফারেন্সের ঘোষণাপত্রের অন্যতম বিষয় ছিল নদীর তীরবর্তী দুটি দেশ পানির অধিকার ভোগ করবে ন্যায্যভিত্তিতে।

লক্ষণীয় ১৯৪৯ সালে ব্রিটেন ও আলবেনিয়ার মধ্যে কারফু নদী নিয়ে, ১৯৫৭ সালে স্পেন ও ফ্রান্সের মধ্যে লেকলেনও নিয়ে বিরোধ মীমাংসাও হয়েছিল সুষম পানি বণ্টন নীতির ভিত্তিতে। ১৯২১ সালে সুদান ও মিশরের মধ্যে নীলনদ নিয়ে বিরোধ এবং ১৯৬০ সালে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি হয়েছিল এই চুক্তিতে যে, কোনো দেশ পানি নিয়ে এমন কোনো ব্যবস্থা নেবে না, যাতে অপর তীরবর্তী রাষ্ট্রের নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ বিঘ্নিত হতে পারে।

বাংলাদেশের ৭০ শতাংশ পানির উৎস ব্রহ্মপুত্র নদ। সেই দিক বিবেচনা করে ব্রহ্মপুত্র নদের একটি অববাহিকাভিত্তিক যৌথ ও সমন্বিত ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা যেতে পারে। সারাবিশ্বে একলা চলার দিন শেষ হয়ে এসেছে। পানি সংকটের কারণে পানি রাজনীতি এবং পানি কূটনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে বহুদেশ। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ব্রহ্মপুত্র নদীকে ঘিরে ত্রিদেশীয় নদী কমিশন আজ সময়ের দাবি। দেশের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব মধ্যাঞ্চল এবং দক্ষিণ-পশ্চিমের সব নদনদীর পানির উৎস গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা ও মেঘনা। এসব নদনদী ও এর উপনদীগুলোর উৎস ভারত, নেপাল, ভুটান ও তিব্বত (চীন)।

১৯৯৪ সালে বিশ্বব্যাংক পরিচালিত এক সমীক্ষায় জানা যায়, এ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে নদীতে তিনশ'র অধিক বৃহৎ আকারের বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে সারাবিশ্বে পানি নিয়ে হাহাকার ও সংঘাত বেড়েই চলেছে। '৯৪ সালের বিশ্বব্যাংকের এক সমীক্ষা থেকে জানা যায়, বাঁধ নির্মাণের ফলে সারা দুনিয়ায় প্রতিবছর ৪০ লাখ মানুষ তাদের পৈতৃক বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছে। ভারত ও চীন ২৬ হাজার ২৯টি বাঁধ নির্মাণ করেছে। এর মধ্যে চীন প্রায় ২২ হাজার বাঁধ নির্মাণ করেছে এবং ভারত করেছে ৩ হাজার ৩০০টি বাঁধ।

ভারত ১৯৭৫ সালে শুরু করে ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ। ফারাক্কা থেকে জঙ্গিপুর। ৩৮ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য খাল কাটা হয়। ফলে সৃষ্টি হয় বাংলাদেশের নদনদীতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া। হুগলি নদীর মোহনায় বাঁধের ফলে গতিশীল বিপুল জলধারা রুদ্ধ হচ্ছে। নদীতে দেখা দিচ্ছে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া।

গঙ্গ নদী একাই প্রতিবছর ৮০ থেকে ৮৫ হাজার টন পলি বহন করছে। ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের পূর্বে বর্ষা মৌসুমে নদীর প্রবল স্রোতধারা পলি ধুয়ে সাগরে নিয়ে যেত। এখন গতিশীল বিপুল জলধারা কেবল টনটন পলি এনে ভাটির দেশ বাংলাদেশের নদীগুলোর তলদেশ ভরাট করে চলেছে। নদনদী খালবিলের পানি প্রবাহিত হবে সমুদ্র অভিমুখে; এটাই প্রকৃতির নিয়ম। বিভিন্ন তথ্য পরিসংখ্যান সূত্রে জানা যায়, বছরে ৪১ হাজার কিউসেক টাটকা পানি সমুদ্রে পতিত হয়। যার মধ্যে ৪ হাজার ঘন কিউসেক পানির প্রবাহ পথে কোনো জনবসতি নেই। সমুদ্রে পতিত হওয়া পানির যথাযথ ব্যবহারে পৃথিবীর দুশ কোটি মানুষের পানির চাহিদা মিটতে পারে। ক্রমান্বয়ে গৃহস্থলি কাজে পানির ব্যবহার বাড়ছে। সেই সঙ্গে শিল্পকারখানা ও চাষাবাদ সম্প্রসারণের কারণে কয়েক দশকে পানির চাহিদা বেড়েছে দ্বিগুণ। এক হিসাব মতে, পৃথিবীর মোট পানির শতকরা ৭৩ ভাগ ব্যবহৃত হয় চাষবাসের জন্য।

এক্ষেত্রে পানির ব্যবহার বাড়ছে শতকরা ৮ ভাগ হারে। আবাদযোগ্য জমির তুলনায় মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় মানুষ নিয়ত চাষের জমির সন্ধান করছে। মানুষের দৃষ্টি পড়ছে অরণ্য ও পাহাড়ের দিকে। অরণ্য ও পাহাড় ধ্বংসের প্রভাব পড়ছে ভূমিতে ও জলাভূমিতে। ক্রমাগত ভূমিক্ষয়, বাতাস ও পানি প্রবাহিত হয়ে নদীতে এসে পড়ছে। ভরাট হচ্ছে নদনদীর তলদেশ। ফলে নদনদী হারাচ্ছে তার নাব্যতা।

প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন বিশুদ্ধ পানি। পানি বিশেষজ্ঞরা অনেকেই দাবি করেছেন, এ শতাব্দীতেই তেল নয়, পানিই হবে বিশ্ব সংঘাতের অন্যতম কারণ। বিশ্বব্যাংকের হিসাব মতে, বিশ্বের শতকরা ৪০ জন কোনো না কোনোভাবে পানি সংকট মোকাবিলা করছে। সেই হিসাব মতে প্রায় ২০০ কোটি মানুষ পানি সংকটের মধ্যে রয়েছে। ২০৫০ সালে এ ধরনের দেশের সংখ্যা দাঁড়াবে ৫৮টি।

সুপেয় পানির যোগান আসে মূলত বৃষ্টির পানি ও ভূগর্ভস্থ পানি থেকে। প্রাকৃতিক সরবরাহের তুলনায় পানি উত্তোলন মাত্রাতিরিক্ত হওয়ার ফলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ২ থেকে ৩ মিটার নিচে নেমে যাচ্ছে প্রতিবছর।

এমতাবস্থায় এই সংকট একা কোনো দেশের নয়। পারস্পরিক স্বার্থে আঘাত না করে পরিবেশ প্রতিবেশের ওপর কোনো নেতিবাচক প্রভাব না ফেলেও পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সারাবিশ্বে দারিদ্র্য বিমোচনে অন্যতম সহায়ক হতে পারে। মরু অঞ্চলের বরফ গলে যাওয়া এবং সমুদ্র তলদেশ উপরে উঠে আসার মতো পানি ঘটিত বিপর্যয় সামাল দিতে হলে দুনিয়ার যে-কোনো রাষ্ট্রকে একা ভালো থাকার মনোভাব ত্যাগ করতে হবে।

লেখক: সম্পাদক, সচিত্র বাংলাদেশ

বাংলাদেশে মেলা

শামসুজ্জামান শামস

মেলা হচ্ছে বাঙালি সংস্কৃতি ও কৃষ্টির অপরিহার্য অঙ্গ। আমাদের জীবনের সঙ্গে মেলার যোগ দীর্ঘকালের। উৎসব, বিনোদন, বিকিকিনি আর সামাজিক মেলামেশার উদার ক্ষেত্র হচ্ছে মেলা। বিভিন্ন পার্বণে মেলা হয়ে থাকে। নববর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত বৈশাখি মেলা বাঙালির চেতনাকে উজ্জীবিত করে। মেলার অর্থ মিলন বা সম্মিলন। দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে মেলা হয়ে থাকে। দীর্ঘকাল ধরেই মেলার প্রবর্তন লক্ষ করা যায়। এজন্য বলা হয় বাংলাদেশ একটি মেলাময় দেশ। সারাবছরই কোনো না কোনো স্থানে মেলা বসে ভিন্ন ভিন্ন উপলক্ষকে কেন্দ্র করে। আগে মেলার প্রায় সর্বাংশই ছিল গ্রামকেন্দ্রিক, যুগের পরিবর্তনে ধীরে ধীরে সেই চিত্র পালটে গিয়ে বর্তমানে গ্রাম ও শহর উভয় স্থানেই ছড়িয়ে পড়েছে। মেলার উৎপত্তি বিষয়ে গবেষকদের ধারণা– বাংলায় নানা ধরনের ধর্মীয় কৃত্যানুষ্ঠান ও উৎসবের সূত্র ধরেই মেলার উৎপত্তি হয়েছে। সেদিক দিয়ে বাংলাদেশের মেলার প্রাচীনত্ব হাজার বছরেরও অধিক পুরনো। পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন করা হয় জাতি-ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে। এ দিনটির সঙ্গে অন্য যে বিষয়টি নিবিড়ভাবে জড়িত তা হলো মেলা। মেলায় শিশু, কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীসহ মানুষের বিশাল সমাবেশ ঘটে। শিশুরা বাবা-মার হাত ধরে কিংবা কোলে বা কাঁধে চড়ে মেলায় এসে নির্মল আনন্দ লাভ করে। বৈশাখি মেলা সাধারণত দু'দিনব্যাপী হয়ে থাকে কোথায়ও কোথায়ও এর স্থায়িত্ব আরো বেশি হয়ে থাকে। চৈত্র মাসের শেষ দিনে চৈত্র সংক্রান্তির মেলা হয়।

গ্রামীণ মেলা

মেলায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পজাত হরেকরকম পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রি ছাড়াও আগতদের মনোরঞ্জনের জন্য নানা ব্যবস্থা করা হয়। অতীতে মেলা উপলক্ষে আয়োজন করা হতো কবি গান, জারি গান, পালা গান, বাউল গান, পুতুল নাচ, যাত্রা, গাজীর পাটসহ অনেক কিছু। বিনোদনের জন্য আরো থাকত বায়োস্কোপ, নাগরদোলা, কুস্তি, কাবাডি, ঘুড়ি ওড়ানো ও ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা, ষাঁড়ের লড়াই ও মোরগের লড়াই। এর সবকিছু না হোক কোনো কোনোটি এখনো টিকে আছে। মেলা উপলক্ষে যেসব খাবার, খেলনা ও কারুপণ্য তৈরি হয় তা আমাদের কৃষ্টির অন্যতম উপাদান। অতীতে বিভিন্ন স্থানে বৈশাখি মেলায় কাঠের আসবাবপত্র, কৃষিপণ্য, কৃষি উপকরণ, বীজ পাওয়া যেত। এখন এগুলো তেমন দেখা যায় না। মৃৎ ও কুটির শিল্পজাত বিভিন্ন পণ্যে লেগেছে আধুনিকতার ছোঁয়া। অনেক ক্ষেত্রে মেলা আয়োজনেও এসেছে নতুনত্ব। আগের অবস্থার কিছু পরিবর্তন ঘটলেও মেলা এখনো জমজমাট। সর্বস্তরের সব বয়সের মানুষের কাছে মেলা অনাবিল আনন্দের উৎস হিসেবে চিহ্নিত। মেলার মাধ্যমে স্থানীয় সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও সামাজিক অবস্থার পরিচয় মেলে।

গবেষকদের পরিসংখ্যান মতে, বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রাম-শহরজুড়ে প্রতিবছর এখনো পাঁচ হাজারের অধিক মেলা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে প্রচলিত প্রতিটি মেলা আয়োজনের পেছনে কোনো না কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে। সেটি হয় ধর্মীয়, নয়তো ব্রত-পালা-পার্বণ অথবা যে-কোনো একটি নির্ধারিত বিষয় বা ঐতিহ্যকে স্মরণ করে। মেলার একটি স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে নির্ধারিত স্থানে নির্ধারিত তারিখ বা তিথি-লগ্নে নর-নারী, শিশু-কিশোর, এমনকি আবাল-বৃদ্ধদের সমাগম ও সমাবেশ হয়ে থাকে। মেলার স্থান নির্বাচনে প্রাধান্য পায় নদীর তীর, গ্রামের বট পাকুড়াশ্রিত চত্বর কিংবা খেলার মাঠ, মঠ-মন্দির সংলগ্ন প্রাঙ্গণ, সাধু-সন্ত ফকির দরবেশের সাধনপীঠ বা মাজার, প্রসিদ্ধ পুণ্য 'স্থান' বা তীর্থ ক্ষেত্র। আবার কখনো স্কুল-কলেজের চত্বর বা খেলার মাঠেও মেলা বসে।

মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তা মিলে এদেশে বসবাসরত সব সম্প্রদায়ই তাদের নিজস্ব ধর্মীয় কৃত্যানুষ্ঠান উপলক্ষে উৎসব ও মেলার আয়োজন করে থাকে। বাংলাদেশের বেশিরভাগ মেলাই ধর্মীয় উপলক্ষে প্রবর্তিত। মুসলমান সম্প্রদায়ের উৎসবকেন্দ্রিক মেলার মধ্যে মহররমের মেলাগুলোই অধিক বর্ণাঢ্য। শিয়া মতবাদী মুসলিমরা কারবালার মর্মান্তিক ঘটনাকে স্মরণ করে শোভাযাত্রা বা তাজিয়া মিছিল বের করে বিভিন্ন ধরনের কৃত্যাচার পালনের সঙ্গে সঙ্গে কোথাও কোথাও জারিগানের আসরও বসে। মহররমের মেলার ঐতিহ্যের ভেতর দিয়ে বাংলাদেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। সনাতন ধর্ম সম্প্রদায়ের দুর্গাপূজা, শিবপূজা, কালীপূজা, রথযাত্রা, স্নানযাত্রা, দোলযাত্রা, জন্মাষ্টমী ইত্যাদি উপলক্ষে মেলা বসে। সনাতন ধর্ম সম্প্রদায়ের বিভিন্ন পার্বণ ও ধর্মীয় অনুষঙ্গে অনুষ্ঠিত মেলার মধ্যে রথের মেলা সবচেয়ে ঐতিহ্যবাহী। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে রথযাত্রা উপলক্ষে ৬২টির মতো মেলা বসে। তার মধ্যে ঢাকার ধামরাইয়ের রথের মেলাটি প্রাচীন ও জমকালো। সাধারণত বাংলা বছরের আষাঢ় মাসের শেষ সপ্তাহে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের রথের মেলা বসে। রথের মেলাকে বলা হয় রথযাত্রার মেলা। হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী, জগন্নাথ দেবের রথযাত্রাকে স্মরণ করে প্রতিবছর এদেশের সনাতন ধর্মাবলম্বীরা বহু স্থানে এ ধরনের রথযাত্রার মেলা করে থাকে। রথযাত্রার কৃত্যাচারে

দেখা যায় যে, আষাঢ় মাসে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রার দিন বা তিথি এলে মন্দির সম্মুখে রাখা রথকে টেনে দূরে নির্দিষ্ট কোনো স্থানে বা খোলা প্রান্তরে রেখে আসা হয় আর তার ঠিক সাতদিন পরে সে রথকেই আবার টেনে আনা হয় জগন্নাথ মন্দিরের সামনে। এ রথযাত্রা ও উলটোরথের পুরা সপ্তাহজুড়ে বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই রথের মেলা বসে। কোথাও তার নাম রথযাত্রার মেলা, আবার কোথাও তার নাম উলটোরথের মেলা।

সনাতন ধর্মীয় অনুষ্ঠান শারদীয় দুর্গোৎসবকে উপলক্ষ করেই এদেশে সর্বোচ্চ সংখ্যক মেলা বসে। সর্বজনীন দুর্গাপূজা সনাতন ধর্ম সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড়ো ও বর্ণাঢ্য ধর্মীয় উৎসব। ফলে দুর্গোৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মেলাগুলো ছড়িয়ে আছে সারা বাংলাদেশে। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে চট্টগ্রামের বিজুড়ি গ্রামের আশ্বিনী পূর্ণিমায় বসে তিন দিনের মেলা, কুমিল্লার বড়ইয়ায় মাঘী পূর্ণিমায় একদিনের মেলা বসে। সবচেয়ে বড়ো মহামুনির মেলা, যার স্থিতিকাল পুরো বৈশাখ মাস। এদেশের বেশিরভাগ কৃষি উপলক্ষের মেলা অনুষ্ঠানের ঐতিহ্যের সঙ্গে লোকধর্মীয় কৃত্যের যোগ থাকে। যেমন গোষ্ঠ মেলা, নবান্ন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত কার্তিক মেলা, পৌষসংক্রান্তি উপলক্ষে পৌষ মেলা, চৈত্রসংক্রান্তি উপলক্ষের মেলা। কৃষি মেলার অন্য কয়েকটি রূপ আছে বাংলাদেশের আদিবাসী সম্প্রদায়ের কৃত্যানুষ্ঠান ও উৎসবের মধ্যে, কৃষিকেন্দ্রিক কৃত্যানুষ্ঠানের সূত্রে এদেশের আদিবাসীরা প্রতিবছর বিজু, বৈজু বা বৈজু উৎসব মেলা এবং কারামপূজা উপলক্ষে একটি বিশেষ কৃষিভিত্তিক উৎসব ও মেলার আয়োজন করে। এ ধরনের মেলা ও উৎসবের আয়োজন স্থান হচ্ছে বাংলাদেশের বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল ও বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চল। বাংলাদেশের মেলার আরেকটি শ্রেণিতে আছে ঋতুভিত্তিক জাতীয় মেলা, যেমন বসন্তবরণ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত বসন্ত-উৎসব ও মেলা, বর্ষবরণ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত বৈশাখি মেলা ইত্যাদি।

বাংলাদেশের জাতীয় দিবসগুলো উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। যেমন একুশে ফেব্রুয়ারি, স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবস। একুশের গ্রন্থমেলাকে মূলত বাঙালির বুদ্ধিবৃত্তিক একটি মিলনমেলাও বলা চলে। তারপর সারাদেশের বিভিন্ন জায়গায় বছরের কোনো না কোনো সময়ে ঢাকা গ্রন্থমেলা, বিভিন্ন জেলাভিত্তিক গ্রন্থমেলা, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের ব্যানারে গ্রন্থমেলা, বিভিন্ন পেশাভিত্তিক গ্রন্থমেলা, কবিতার গ্রন্থমেলা, গল্পের গ্রন্থমেলা, উপন্যাসের গ্রন্থমেলা, প্রবন্ধের গ্রন্থমেলা ইত্যাদি নানা নামে মেলাগুলো চলতে থাকে।

১৪ই ফেব্রুয়ারি হয় ফাগুনের মেলা, চৈতালি মেলা ও বসন্তবরণ উৎসবে বসন্ত মেলা। এ মেলায় গৃহিণী-তরুণী সবাই বাসন্তী রঙের শাড়ি পরে মেলা উপভোগ করে থাকেন। ভাব জমিয়ে আড্ডা দেন কপোত-কপোতি। নবান্নে শুরু হয় পিঠা উৎসব ও বাহারি রং এবং পদের গ্রাম-বাংলার ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন পিঠা মেলা।

দেশি মাছের অন্যতম এলাকা হিসেবে পরিচিত সিলেটের বিশ্বনাথে দেশি টাটকা মাছের মেলা হয়। একই সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী হিসেবে পরিচিত হাঁকডাকের মাধ্যমে এলাকাবাসী সবাই একত্রে মিলে পলো দিয়ে মাছ ধরার মেলা, যা দেশের বিভিন্ন জায়গাতেই সেসব এলাকার রীতি অনুযায়ী হয়ে থাকে। কারণ বাঙালির ইতিহাস-ঐতিহ্যের সঙ্গে এসব সাংস্কৃতিক মেলা অনেক গুরুত্ব বহন করে। এলাকা ও ব্যক্তিভিত্তিক এসব মেলার অনেক বন্ধন রয়েছে সেসব এলাকার শেকড়ের সঙ্গে। মৌসুমভিত্তিক আরো যে গুরুত্বপূর্ণ মেলা আমাদের দেশকে মহিমান্বিত করেছে, তার মধ্যে রয়েছে কৃষি প্রযুক্তি মেলা, বৃক্ষ মেলা, বাণিজ্য মেলা, কৃষি মেলা, দেশীয় ফল মেলা, নিরাপদ ফল মেলা, রাসায়নিকমুক্ত সবজি মেলা, দেশীয় সবজি মেলা, পাখি মেলা, পরিবেশ মেলা, শিল্পোদ্যোক্তা মেলা, গার্মেন্ট মেলা, পর্যটন মেলা, দেশি-বিদেশি গাড়ি মেলা, মোবাইল মেলা, সিম মেলা, ল্যাপটপ মেলা, কম্পিউটার মেলা, তথ্যপ্রযুক্তি মেলা, আয়কর মেলা, ঈদে হয় বিভিন্ন পণ্য মেলা, ভিসার সহজীকরণ মেলা ইত্যাদি। এসব মেলার মাধ্যমে শুধু যে মানুষ আনন্দই উপভোগ করেন তাই নয়, এর মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রচার-প্রসার ও সম্প্রসারণ হয়ে থাকে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আয়কর মেলা, বৃক্ষ, কৃষি ও ফল ইত্যাদি মেলায় মানুষের মধ্যে অনেক সচেতনতা তৈরি হয়েছে। ফলে পরিবেশের দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন হয়েছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, এমন কোনো জিনিস নেই, যা নিয়ে বাংলাদেশে মেলা অনুষ্ঠানের উদাহরণ নেই। মেলাকে তাই আমাদের উপভোগের পাশাপাশি জনকল্যাণে ব্যবহার করতে হবে। তাহলেই বাঙালির এ চিরায়ত সংস্কৃতির মাধ্যমে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে উপকারও নিশ্চিত হবে। বাংলাদেশে এমন কোনো জেলা নেই যেখানে বছরের নানা সময়ে গ্রামে বা শহরে মেলা বসে না। বৃহত্তর ঢাকা জেলাতেই সবচেয়ে বেশি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। আর ছোটোখাটো জেলার মধ্যে টাঙ্গাইল জেলার মেলার সংখ্যা তুলনামূলক বেশি। অঞ্চল ও আবহাওয়াভেদে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরনের মেলা অনুষ্ঠিত হয়। আধুনিক সময়ের শহরে, নগরে প্রদর্শনী মেলার মতো সুন্দর ঢাকার উপকণ্ঠে ধামরাইয়ের রথের মেলা, লাঙ্গলবন্ধের অষ্টমী স্নানের মেলা কিংবদন্তির মতোই দেশে-বিদেশে স্মরণীয় হয়ে আছে। টাঙ্গাইলের নাগরপুর মেলা, ময়মনসিংহের তারনদিয়া মেলা, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ভাদুঘর মেলা, খুলনার খানজাহান আলীর দরগাহ মেলা, জয়দেবপুরের শীতল ও রথমেলা, টঙ্গীর দেওয়ান বাড়ির মেলা, নোয়াখালীর চন্দ্রপুরের ও ফকির চাড়ুমিজি শাহর দরগাহর মেলা, কোম্পানীগঞ্জ-নোয়াখালী নলদিয়া মেলা, রাজশাহীর মান্দর বনের মেলা, কুমিল্লার ময়নামতির মেলা, যা প্রতিবছর ৭ই বৈশাখ শুরু হয়। নরসিংদীর বৈশাখি মেলাকে বলা হয় চীন মেলা। এই মেলা বসে চৈত্র মাসের শেষ দিন শিবপুর থানার কাছারিতে।

গাজীপুর থানার ঘী ঘাটের মেলা বসে ৩০শে চৈত্র। নেত্রকোনার শাহ সুলতানের মেলা বসে ফাল্গুনের শেষের এবং চৈত্রের প্রথম সপ্তাহের পূর্ণিমাতে। মেলাটি সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকার আজিমপুরে বসে মহররমের মেলা। এই মেলা মহররমের ১০ তারিখে বসে। মোগল আমল থেকে এই মেলাটি তার ঐতিহ্য ধরে রেখেছে। নড়াইলে শিল্পী এস.এম. সুলতানের জন্মবার্ষিকীতে বসে এসএম সুলতানের মেলা। সোনারগাঁয়ের কারুশিল্প মেলা বসে মাসব্যাপী।

বগুড়ার মহাস্থান গড়ের মেলা, সিলেটে হজরত শাহজালাল (রহ.) ওরস মোবারক মেলা, যশোরের পাঁচ পীরের মেলা, চট্টগ্রামে সাঁওতালদের সবচেয়ে বড়ো মেলা সোহরাব মেলা, চট্টগ্রাম জব্বারের মেলা, যা ১৮০৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে তার ধারাবাহিক ঐতিহ্য ধরে রেখেছে। এখানে মেলা উপলক্ষে বলী খেলার আয়োজন করা হয়। সুন্দরবনের শেষ প্রান্তে বসে দ্বীপ দুবলার মেলা। বিভিন্ন সাধু-সন্ত প্রবর্তিত ওরস উপলক্ষে বিভিন্ন স্থানে মেলা বসে। ওরস উপলক্ষে সারাদেশেই অসংখ্য ছোটো-বড়ো মেলা বসে। এর মধ্যে লালন সাঁইয়ের আখড়াতে অনুষ্ঠিত দোলপূর্ণিমার ওরস মেলা, গোপালগঞ্জের ওড়াকান্দির হরিঠাকুরের মেলা, সানাল শাহ ফকিরের মেলা, বগুড়ার মহাস্থানগরের শাহ সুলতানের মেলা, চট্টগ্রামের মাইজভাণ্ডারের মেলা, সিরাজগঞ্জের এনায়েতপুরীর মেলা, নরসিংদীর বাউল ঠাকুরের মেলা, ফরিদপুরের সুরেশ্বরের মেলা।

জাতীয় জীবনে উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন বরেণ্য ব্যক্তি, কবি-সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, দার্শনিকের স্মরণে নিয়মিতভাবে স্মরণোৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই উপলক্ষেও মেলা বসে। এ ধরনের স্মারক মেলা সাধারণের কাছে খুবই জনপ্রিয়। খ্যাতিপ্রিয় লেখক-কবির আবির্ভাব বা তিরোধান বার্ষিকীতে উৎসব-অনুষ্ঠানের অনুষঙ্গী হয়ে এসব মেলার জন্ম। ছেঁউড়িয়ার লালন মেলা, সুনামগঞ্জের হাসনমেলা, শিলাইদহের রবীন্দ্রমেলা, দরিরামপুরের নজরুলমেলা, অম্বিকাপুরের জসীমমেলা, সাগরদাঁড়ির মধুমেলা। মেলা বর্তমানে বাঙালির জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছে।

লেখক: সাংবাদিক ও কথাসাহিত্যিক

৩রা এপ্রিল: জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস

সাবিত্রী রানী

দেশের চলচ্চিত্রের উন্নয়ন ও জাতীয় জীবনে সর্বস্তরের মানুষকে নিজেদের চলচ্চিত্র সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে প্রতিবছর ৩রা এপ্রিল জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস উদ্যাপিত হয়ে আসছে। তৎকালীন শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৭ সালের ৩রা এপ্রিল প্রাদেশিক আইন পরিষদে পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা বিল উত্থাপন করেন। বিলটি আইন পরিষদে পাস হয়। স্বাধীনতার পর এটি বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশন (বিএফডিসি) নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সরকার ঐতিহাসিক ৩রা এপ্রিলকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ২০১২ সালে ৩রা এপ্রিলকে জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস এবং চলচ্চিত্রকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা করেন। এরপর থেকে প্রতিবছর পালিত হয়ে আসছে দিবসটি।

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ ৩রা এপ্রিল বিএফডিসি-তে জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস ২০১৯ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন পর্বে বক্তৃতা করেন–পিআইডি

জাতীয় চলচ্চিত্র দিবসটি বরাবরের মতো এবারো যথাযথ মর্যাদায় উদ্যাপিত হয়েছে। চলচ্চিত্র দিবসের এবারের স্লোগান ছিল– 'চলচ্চিত্র বাঁচলে সংস্কৃতি বাঁচবে'। বর্ণাঢ্য আয়োজনে এসব কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্যই চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশ এবং সমৃদ্ধ করা। ছিল দুই দিনব্যাপী আয়োজন। এ উপলক্ষে বর্ণিল সাজে সেজেছিল বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশন (বিএফডিসি)। মূল ফটক থেকে শুরু করে প্রতিটি রাস্তাজুড়ে টাঙানো হয়েছিল স্বর্ণালি যুগের সব সিনেমার পোস্টার ও স্থিরচিত্র। এছাড়া ব্যানার ফেস্টুনে বর্ণিল সাজ ধারণ করেছিল এফডিসি। ৩রা এপ্রিল ছিল উদ্বোধন অনুষ্ঠান, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, আলোচনাসভা, আলোকচিত্র ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনী এবং বেলা ৩টায় এফডিসির ৮ নম্বর ফ্লোরে দেড় ঘণ্টা ব্যাপ্তির একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। আর ৪ঠা এপ্রিল বিকেলে অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। জনপ্রিয় শিল্পীদের পরিবেশনায় ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আরো ছিল আতশবাজি এবং লেজার শো।

৩রা এপ্রিল সকাল ১০টায় চলচ্চিত্র দিবসের উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। প্রথমে বিএফডিসির প্রবেশ দরজার সামনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে ফুলেল শ্রদ্ধা জানানোর পর ঝর্না স্পটের সামনে জাতীয় সংগীতের সঙ্গে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, শান্তির পায়রা ও একগুচ্ছ বেলুন উড়িয়ে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন তথ্যমন্ত্রী। উদ্বোধনের পর বিএফডিসির প্রশাসনিক ভবনের মূল মঞ্চে অতিথিরা আসন গ্রহণ করেন। এসময় বিশেষ অতিথি ছিলেন তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব আবদুল মালেক। চিত্রনায়ক আলমগীর, চিত্রনায়ক ইলিয়াস কাঞ্চন, চিত্রনায়িকা রোজিনা প্রমুখ আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। এতে স্বাগত বক্তব্য দেন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশনের ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও জাতীয় চলচ্চিত্র উদ্যাপন কমিটির সদস্য সচিব লক্ষন চন্দ্র দেবনাথ। চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতির সভাপতি মুশফিকুর রহমান গুলজার সঞ্চালিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় চলচ্চিত্র উদ্যাপন কমিটির আহ্বায়ক সৈয়দ হাসান ইমাম। অনুষ্ঠানে অভিনেতা ড. ইনামুল হক, খল অভিনেতা মিশা সওদাগর, শিল্পী সমিতির সাধারণ সম্পাদক জায়েদ খান, চিত্রনায়ক সুব্রত, সম্রাট, চিত্রনায়িকা অঞ্জনা, শাহনুর, আইরিনসহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেন, বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে স্বর্ণযুগ আনার জন্য সকলকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে দূরদৃষ্টি নিয়ে ঢাকায় চলচ্চিত্র শিল্পের গোড়াপত্তন করেছিলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই চলচ্চিত্রের বিকাশে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সারাবিশ্বে সমাদৃত হবে।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের প্রশংসা করে মন্ত্রী বলেন, এদেশে বহু কালজয়ী, জীবনধর্মী চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। সমগ্র বিশ্বে চলচ্চিত্রের কোনো বিকল্প নেই উল্লেখ করে তিনি আরো বলেন, টেলিভিশন, ইউটিউব বা আইম্যাক্স কোনোটিই চলচ্চিত্রের বিকল্প নয়, চলচ্চিত্রের বিকল্প চলচ্চিত্রই। এই চলচ্চিত্র বিকাশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্মাণ করেছেন বিশ্বমানের ফিল্ম আর্কাইভ, ৫৩ কোটি টাকা ব্যয়ে এফডিসি'র আধুনিকায়ন চলছে, ৩২২ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট সকল সুবিধাসহ এফডিসি'র নতুন সমন্বিত ভবন। ২০২১ সালে ঢাকায় বিশ্ব ফিল্ম আর্কাইভ সম্মেলনের আগেই এফডিসি নতুন রূপে সাজবে।

অনুষ্ঠানের সভাপতি সৈয়দ হাসান ইমাম চলচ্চিত্র অঙ্গনের সকলকে দিনটি আনন্দের সাথে উদ্যাপনের আহ্বান জানান এবং তথ্যসচিব আবদুল মালেক দেশ ও চলচ্চিত্রের স্বার্থে সকলকে আন্তরিকভাবে কাজ করার ব্রতে উজ্জীবিত হতে বলেন।

তথ্যমন্ত্রী এ সময় শিল্পী ও অতিথিদের সাথে নিয়ে দিবসটি উপলক্ষে বিএফডিসি প্রকাশিত স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন করেন, চলচ্চিত্রের ইতিহাসভিত্তিক আলোকচিত্র প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন ও বর্ণাঢ্য র‌্যালিতে নেতৃত্ব দেন।

লেখক: শিক্ষক ও প্রাবন্ধিক

চলচ্চিত্রের ভাষা পাঠ

শ্যামল দত্ত

এক অপার সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে চলচ্চিত্রের প্রতিটি ফ্রেমে। একজন চলচ্চিত্রকার নিজের মনের রঙেই তাঁর চারপাশের পরিবেশ এমনকি বিশ্ব জগতকেও রাঙিয়ে তুলতে পারেন। একজন কবি অথবা একজন চিত্রশিল্পীর মতোই শিল্পের ভুবনে তাঁর অবাধ স্বাধীনতা। আলোছায়া আর শব্দ ও সংগীতের মধ্য দিয়ে একজন কুশলী চলচ্চিত্রকার সিনেমার পর্দায় দৃশ্যকাব্য তৈরি করেন। একজন চলচ্চিত্রকার একাধারে একজন কবি, একজন চিত্রশিল্পী, একজন সংগীতজ্ঞ এবং আরো অনেক কিছু। চলচ্চিত্র একসাথে প্রায় সব শিল্প মাধ্যমের সমন্বিত প্রকাশ। এজন্য তার ব্যাপ্তি অনেক বড়ো। আর তাই 'Director's Media' নামে পরিচিত চলচ্চিত্রশিল্প অসংখ্য কলাকুশলীর মিলিত প্রয়াস হলেও সেটির কৃতিত্ব একান্তই নির্মাতার। কারণ একজন নির্মাতা যেভাবে তাঁর ভাবনাকে পর্দায় মেলে ধরতে চান, শেষ পর্যন্ত সেভাবেই একটি চলচ্চিত্র নির্মিত হতে পারে।

সাহিত্য, চিত্রশিল্প, সংগীত, অভিনয়, চারু ও কারুশিল্প, সূচিশিল্প সবই আছে এই বিশেষ শিল্পমাধ্যমে। অর্থাৎ শিল্পের নান্দনিকতার জন্য যেখানে যা প্রয়োজন, চলচ্চিত্র তাকেই আত্মস্থ করেছে।

কখনো শিল্পের সৌন্দর্য মানুষের দৃষ্টিকে মুগ্ধ করে আবার কখনো মুগ্ধ করে শ্রুতিকে। অর্থাৎ এমন কিছু দৃশ্য বা শব্দ তরঙ্গে মুগ্ধ হতে হয়, যা সত্যিই অকল্পনীয়। তবে যে-কোনো শিল্পের সৌন্দর্য উপলব্ধির জন্য প্রাথমিক কিছু ধারণা থাকা অপরিহার্য। অবশ্য অন্য কোনো শিল্প মাধ্যমের তুলনায় চলচ্চিত্রের রসাস্বাদন একটু ভিন্ন। চলচ্চিত্রের রস উপলব্ধির জন্য একটু বেশি প্রস্তুতির প্রয়োজন। অনন্য সাধারণ মেধাবী চলচ্চিত্রকার প্রয়াত আলমগীর কবির সবসময় তাঁর ছাত্রদের বলতেন, সিনেমা দেখার জন্য চোখ তৈরি করতে হয়। চলচ্চিত্রকার জহির রায়হানের একটি উদ্ধৃতি এখানে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ:

> চলচ্চিত্র হচ্ছে একটা অত্যন্ত জটিল মাধ্যম। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, সংগীত, চিত্রকলা, অভিনয়কলা সবকিছুর সমন্বয়ে গড়ে ওঠা একটি সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল মাধ্যম। তাই একটি ছায়াছবির অন্তর্নিহিত রস গ্রহণ করতে হলে সে মাধ্যমটি সম্পর্কে কিছু জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। চলচ্চিত্রের নিজস্ব একটা ভাষা আছে। সে ভাষাটা বোঝা এবং জানা দরকার। চলচ্চিত্রের নিজস্ব কতগুলো ভঙ্গী আছে, সেগুলোর সঙ্গে পরিচয় থাকা প্রয়োজন। নইলে চলচ্চিত্রের রস গ্রহণ সম্ভবপর নয়।

অন্য যে-কোনো শিল্পের তুলনায় চলচ্চিত্র নিঃসন্দেহে একটি জটিল মাধ্যম। তাই চলচ্চিত্রের কলা-কুশলীদের অবশ্যই এই মাধ্যমটি সম্পর্কে বিশেষ প্রস্তুতি এবং ধারণা থাকা প্রয়োজন। এই প্রস্তুতি চলচ্চিত্রের দর্শকদের বেলাতেও প্রযোজ্য। চলচ্চিত্রকার মৃণাল সেন খুব স্পষ্ট করেই বলেছেন:

> ছবি করবার সময়েই আমি ধরে নিই যে দর্শকের সমস্যা থাকবেই। অর্থাৎ সব দর্শকের আমার ছবি ভালো লাগবে না। অনেকেই বাতিল করবেন, বাকিরা গ্রহণ করবেন। কিন্তু এই বাতিল করতে বা গ্রহণ করতে, শিল্পসম্মত কায়দায় বাতিল করতে বা শিল্পসম্মত কায়দায় গ্রহণ করতে, আমার বিশেষ নির্বাচিত (ডিস্ক্রিমিনেটিং) দর্শক দরকার হবে। এবং এই দর্শক ক্রমেই বাড়বে।

চলচ্চিত্রের ভাষা মূলত ছবি ধ্বনি বা শব্দের সমন্বিত রূপ। এজন্য চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। চিত্রনাট্যের ভাষা এমন হতে হবে, যা দেখা কিংবা উপলব্ধি করা সম্ভব। চিত্রনাট্য সরাসরি দৃশ্যটি চোখের সামনে মেলে ধরে। এভাবেই সাহিত্য থেকে বিশ্বখ্যাত অন্যতম চলচ্চিত্র নির্মাতা ডেভিড ডব্লিউ গ্রিফিথ (D W Griffith) নির্মাণ করেছিলেন তাঁর কালজয়ী ছবি The Birth of a Nation (1914)। অবশ্য তখন ছবিটির নাম ছিল The Clansman। লেখক Dixon-এর অনুরোধে পরে ছবির নাম পালটানো হয়। পৌনে তিন ঘণ্টা ব্যাপ্তিকালের এই ছবিটি নির্মাণ করা হয়েছে ১,৩৭৫টি শটে। অর্থাৎ ১,৩৭৫টি চিত্রের সমন্বয়ে পুরো ছবিটি নির্মিত হয়েছে। এ যেন অজস্র ফুল দিয়ে একটি সম্পূর্ণ মালা গাঁথা। চলচ্চিত্রে প্রতিটি শট যেন একটি করে ফুল, কিন্তু ফুলগুলো ভিন্ন। বিভিন্ন ফুলের সমাহারে যথার্থভাবে মালাটি গেঁথে তোলাই এখানে আসল। চলচ্চিত্রে এটাই চিত্রনাট্য। চলচ্চিত্রকার গ্রিফিথ-এর এই ছবির চিত্রনাট্যের একটি অংশকে এভাবে দেখানো যেতে পারে:

শট-১: Full Shot লিংকনের দলবল। এক-এক করে তারা থিয়েটারের সর্বোচ্চ সিঁড়িতে ওঠেন এবং ঘুরে প্রেসিডেন্টের জন্য বিশেষ কক্ষে প্রবেশ করেন। লিংকনের দেহরক্ষীকে দেখা যায় সর্বাগ্রে এবং সর্বশেষে প্রেসিডেন্ট লিংকন স্বয়ং।

শট-২: থিয়েটারের অভ্যন্তর থেকে নেওয়া প্রেসিডেন্ট কক্ষ। প্রেসিডেন্টের সহযোগীরা কক্ষে প্রবেশ করেন।

শট-৩: Full Shot প্রেসিডেন্ট লিংকন কক্ষের বাইরে নিজের টুপি খুলে পরিচালকের হাতে দিলেন।

শট-৪: প্রেসিডেন্ট কক্ষ। কক্ষে লিংকন প্রবেশ করেন।

শট-৫: Mid Shot বেঞ্জামিন এবং এলসি অডিটোরিয়ামে বসে আছেন। তারা প্রেসিডেন্টের কক্ষের দিকে তাকান এবং উচ্ছ্বসিত হাততালি দিতে দিতে উঠে দাঁড়ান।

শট-৬: অডিটোরিয়ামের দিক থেকে। প্রেসিডেন্ট কক্ষ ফ্রেমের ডান দিকে। দর্শকরা Back to Camera-য় দাঁড়ানো অবস্থায় হাততালি দিয়ে লিংকনকে সম্ভাষণ জানাচ্ছেন।

শট-৭: প্রেসিডেন্ট কক্ষ। লিংকন এবং মিসেস লিংকন সামনের দিকে নুয়ে দর্শকদের অভিবাদন গ্রহণ করেন।

শট-৮: শট-৬-এর অনুরূপ।

শট-৯: প্রেসিডেন্ট কক্ষ। অভিবাদন গ্রহণ শেষে লিংকন আসন গ্রহণ করেন।

নিজের দেশের দিকে চোখ ফিরাই। আবু ইসহাকের কাহিনি অবলম্বনে চলচ্চিত্রকার মসিহউদ্দিন শাকের এবং শেখ নিয়ামত আলী নির্মাণ করেছেন 'সূর্য দীঘল বাড়ী' (১৯৭৯)। সরকারি অনুদানে নির্মিত সাদা-কালো এ ছবির দৈর্ঘ্য ১২,৩৮৭ ফুট। নানাভাবে নন্দিত এ ছবির প্রথম দৃশ্যের চিত্রনাট্য সাজানো হয়েছে এভাবে:

শট-১: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ Insert of a Card-এ তুলে ধরা হলো।

শট-২: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্লেন উড়ছে এবং বোমা বর্ষণ করছে। নিচে ট্যাংক বাহিনী এগিয়ে যাচ্ছে।

শট-৩: গোডাউনে স্তূপীকৃত বস্তা। ব্যবসায়ীরা খাদ্যের দাম বৃদ্ধির জন্য খাদ্যশস্য অন্যায়ভাবে মজুত করে রেখেছে।

শট-৪: স্টিল: জয়নুল আবেদিনের পেইন্টিং।

(ক) পঞ্চাশের মন্বন্তরের বিখ্যাত স্কেচসহ আরও দু-টি স্কেচ।

(খ) স্থির আলোকচিত্র: অনশনক্লিষ্ট মা ও তার শিশু এবং আরো কয়েকটি দুর্ভিক্ষের স্থিরচিত্র।

শট-৫: একটি উড়ন্ত শকুন।

শট-৬: টাইটেল দৃশ্য।

শট-৭: জয়গুন ফুটপাতের এক দেয়ালে ঘুঁটে তৈরির জন্য গোবর দিচ্ছে। সে কী যেন ভাবছে। বস্তির মন্বন্তরক্লিষ্ট নরনারীর সঙ্গে জয়গুনরা বাস

করছে। হঠাৎ তার মনে ঢেঁকির শব্দ ভেসে আসে। অর্থাৎ গ্রাম তাকে ডাকছে। কারণ পৌষ-মাঘ মাসের ধানের মৌসুম তাকে হাতছানি দেয়।

চলচ্চিত্র এমনই একটি শিল্প মাধ্যম, যেখানে রয়েছে দৃষ্টি আর শ্রুতির নিবিড় মেলবন্ধন। চলচ্চিত্রের সেই আদি যুগে, ফরাসি দেশে লুমিয়ের ভ্রাতৃদ্বয় (Louis Lumiere Ges Auguste Lumiere) থেকে শুরু করে বর্তমান সময়ের অত্যাধুনিক প্রযুক্তির খোলা দরজা পেরিয়েও চলচ্চিত্রশিল্প মানুষকে মুগ্ধ করে চলেছে। এখনো কোনো কালজয়ী সিনেমার কথা মনে করে দর্শক সেই সিনেমার বিশেষ কোনো দৃশ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেন। চলচ্চিত্রের নির্বাক যুগে চলমান দৃশ্য দেখে মানুষ যেমন অবাক হয়েছে, তেমনি খুশিও হয়েছে। একটি অভাবনীয় কাণ্ড মানুষ তখন নিজের চোখের সামনে সিনেমার রুপালি পর্দায় ঘটতে দেখেছে। এই দেখার মধ্যে কৌতূহলের পাশাপাশি অপার বিস্ময়ও ছিল। এরপর চলচ্চিত্রে আসে সবাক যুগ। পর্দায় চলমান মানুষের ছবিগুলো এবার সত্যি সত্যিই যেন কথা বলে উঠল। এর আরো পরে আসে রঙিন চলচ্চিত্র। এই চলচ্চিত্র এসে মানুষের চৈতন্যের প্রায় সবটাই যেন দখল করে নেয়। কারণ চলচ্চিত্র এমনই সর্বগ্রাসী একটি মাধ্যম, যেখানে শিল্পকলার প্রতিটি শাখা উপস্থিত। অবশ্য নাটক, চিত্রকলা, সংগীত ইত্যাদির প্রভাব থাকা সত্ত্বেও চলচ্চিত্রশিল্প সম্পূর্ণ আলাদা বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। যেন শিল্পের সকল রসাধার থেকে রস আহরণ করে এক পরিপূর্ণ মাধ্যম।

সাহিত্যের সাথে চলচ্চিত্রের সম্পর্ক অতি নিবিড়। কারণ বিশ্বব্যাপী অসংখ্য মহৎ সাহিত্যকর্ম সিনেমার রুপালি পর্দায় চিত্রায়িত হয়েছে। ইতালির বিশিষ্ট লেখক লুইগি বার্তোলিনি (Luigi Bartolini) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে রোম শহরে এক দরিদ্র পিতা ও তার পুত্রের চুরি হয়ে যাওয়া সাইকেল অনুসন্ধানের একটি মর্মস্পর্শী গল্প রচনা করেছিলেন। পরে সে দেশের অন্যতম চলচ্চিত্রকার ভিত্তোরিও দে সিকা (Vittorio De Sica) গল্পটি অবলম্বনে নির্মাণ করেন কালজয়ী চলচ্চিত্র The Bicycle Thief (1948)। যদিও ছবিটি ইতালির একজন সাহিত্যিকের গল্প অবলম্বনে নির্মিত, কিন্তু সেই চলচ্চিত্রের কৃতিত্ব অবশ্যই নির্মাতা ভিত্তোরিও দে সিকা-র। তবে এটাও ঠিক যে, নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্রের প্রায়োগিক ভাষা তৈরি হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে অন্যতম কৃতী নির্মাতা শেখ নিয়ামত আলী বলেন: প্রতি দশকে নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে চলচ্চিত্রে জন্ম নিচ্ছে এমন সব প্রয়োগ ভাষা, যেগুলো বাস্তবিকই এ শিল্পকে দিন দিন জীবন্ত ও সৃজনশীল করে চলছে।

বাংলা সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের ইতিহাসে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি চিরস্মরণীয় নাম। তাঁর কালজয়ী উপন্যাস 'পথের পাঁচালি' অবলম্বনে বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় নির্মাণ করেন 'পথের পাঁচালি' (১৯৫৫), 'অপরাজিত' (১৯৫৭) ও 'অপুর সংসার' (১৯৫৯) নামে ত্রয়ী বা 'ট্রিলজি' চলচ্চিত্র। এককথায় এই ছবিগুলো অসাধারণ। বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে বলা যায় যে, প্রতিটি শিল্প মাধ্যমের প্রকাশভঙ্গি আলাদা। সাহিত্যে 'পথের পাঁচালি'-তে যেভাবে গল্প বর্ণনা করা হয়েছে, চলচ্চিত্রে সেভাবে বলা হয়নি। সেভাবে বলা যায়ও না। কারণ সাহিত্যের ভাষা চলচ্চিত্রের ভাষা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। দুটি মাধ্যমও ভিন্ন। দুটি মাধ্যমের প্রায়োগিক নমুনা হিসেবে একটি অংশ তুলে ধরা যেতে পারে। উপন্যাসে দৃশ্যটি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে—

> দেশের স্টেশনে নামিয়া বৈকালের দিকে সে হাঁটিতে হাঁটিতে গ্রামে আসিয়া পৌঁছিল। পথে বড় একটা কাহারও সহিত দেখা হইল না, দেখা হইলেও সে হনহন করিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে কাহারও দিকে বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া বাড়ির দিকে চলিল। দরজায় ঢুকিতে ঢুকিতে আপনমনে বলিল— উঃ দ্যাখো কাণ্ডখানা, বাঁশঝাড়টা ঝুঁকে পড়েছে একেবারে পাঁচিলের উপর। ভুবনকাকা কাটাবেনও না—মুস্কিল হয়েছে আচ্ছা। পরে সে বাড়ির উঠানে ঢুকিয়া অভ্যাসমত আগ্রহের সুরে ডাকিল, ওমা দুগ্‌গা—ও অপু—তাহার গলার স্বর শুনিয়া সর্বজয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। হরিহর হাসিয়া বলিল— বাড়ির সব ভাল? এরা সব কোথায় গেল? বাড়ি নেই বুঝি? ...

উপন্যাসের এই অংশটুকু বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় তাঁর চলচ্চিত্রের জন্য চিত্রনাট্যে সাজিয়েছিলেন এভাবে:

১. মেঘলা দিন। হরিহরের ভিটার পিছনের বাঁশবন।

Long Top Shot: দূর থেকে দেখা যায় হরিহর আসছে।

হরিহর: অপু!

২. মেঘলা দিন। ইন্দিরের দাওয়া।

Close up: হরিহরের গলার স্বর শুনে সর্বজয়ার reaction —গালটা হাত থেকে সামান্য সরে গিয়ে শাঁখাটা আলগা হয়ে একটুখানি নিচের দিকে নেমে এল।

৩. মেঘলা দিন। হরিহরের ভিটার দক্ষিণের পাঁচিলের পাশে।

Med Shot: হরিহর এসে থমকে দাঁড়ায়। একটা আমডাল ভেঙে পাঁচিলের ওপর পড়ে তার খানিকটা অংশ ভেঙে দিয়েছে।

হরিহর: (স্বগত) ইস্, আর ক'টা দিন সবুর সইল না?

হরিহর ডালটা ডিঙিয়ে এগিয়ে আসে—Camera সঙ্গে সঙ্গে Pan করে।

হরিহর এগিয়ে এসে বাড়ির দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে তার ভগ্ন কোঠার দিকে চেয়ে থাকে। তারপর উঠোনের দরজার দিকে ছবির গণ্ডির বাইরে চলে যায়। Camera আর Pan করে না—ভাঙা পাঁচিলের পিছনে ভাঙা গোয়ালে গরুটা জাবর কাটছে। তার পিছনে হরিহরের দাওয়া। [নেপথ্যে হরিহরের দরজা খুলে ঢোকার শব্দ]।

কিছুক্ষণ পরে হরিহরকে Long-এ দেখা গেল তার দাওয়ার সামনে পৌঁছেছে।

সে উদ্বিগ্নভাবে এদিক-ওদিক চায়।

হরিহর: (উদ্বিগ্ন কণ্ঠে) দুর্গা।

সর্বজয়া হরিহরের পাশ দিয়ে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে দাওয়ায় ওঠে।

হরিহর: ওঃ—তুমি আছ।

সর্বজয়া: এসো...

হরিহর সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করে।

এই যে ভিন্ন দুটি মাধ্যম— সাহিত্য এবং চলচ্চিত্র, প্রকাশ ভঙ্গি আলাদা হলেও দুটি মাধ্যম স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। এ কথা ঠিক যে, চলচ্চিত্রে সৃজনশীলতার বহুমাত্রিক সুযোগ রয়েছে, যা অন্য কোনো শিল্পের বেলায় সীমিত। এখানে একজন সৃজনশীল নির্মাতা ইচ্ছে করলেই তাঁর বহুমাত্রিক ভাবনার ডানা অনায়াসেই চলচ্চিত্রের পর্দায় মেলে ধরতে পারেন। অর্থাৎ নির্মাতার ভাবনা এবং কল্পনাতে সৃষ্টির অপূর্ব সুযোগ রয়েছে সিনেমায়। দেশে-বিদেশে এভাবে অসংখ্য সাহিত্যকর্ম চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে।

চলচ্চিত্রে ধ্বনি বা শব্দের কথা বলতে গেলে প্রথমেই মনে রাখা উচিত যে, ধ্বনি বা শব্দ চলচ্চিত্রে ইমেজ থেকে আলাদা কোনো বিষয় নয়। বরং ইমেজের পরিপূরক। চলচ্চিত্রের প্রতিটি শট পেইন্টিং-এর মতোই। এখানে অবশ্য ধ্বনি বা শব্দ ব্যবহারের সুযোগ আছে। কিন্তু তারপরও চলচ্চিত্রের এক একটি ছবি যেন এক একটি বাক্য। নির্বাক চলচ্চিত্রের যুগে দর্শক এভাবেই চলচ্চিত্র উপভোগ করেছেন। তবে সবাক চলচ্চিত্রের যুগে দর্শককে চোখ-কান দু-টোই খোলা রাখতে হয়। কারণ শুধু শব্দ বা ধ্বনি শুনে চলচ্চিত্রের বিষয় উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। এখানে ইমেজটা গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় শব্দহীন ইমেজও

চলচ্চিত্রে অনেক বড়ো ধ্বনি বা শব্দ ব্যঞ্জনা তৈরি করে, যা ধ্বনি বা শব্দ প্রয়োগে সম্ভব নয়।

বাংলা সিনেমা যেমন বাঙালির স্বকীয়তায় উজ্জ্বল, তেমনি বাঙালির বাদ্যযন্ত্রেও আছে নিজস্বতা। পাশ্চাত্যের অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক বাদ্যযন্ত্রের ভিড়ে আজও টিকে আছে বাংলার ঢোল, বাঁশি, খঞ্জনি, একতারা, দোতারা ইত্যাদি। অবশ্য বিদেশি যন্ত্র ব্যবহারেও বাঙালি সুরশিল্পীরা অনাগ্রহী নন। বরেণ্য চিত্রনির্মাতা সত্যজিৎ রায় এ প্রসঙ্গে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন:

> সংগীতের ব্যঞ্জনা আছে, কিন্তু পরিষ্কার কোন ভাষা নেই। এখানে সাযুজ্যের একটা প্রশ্ন আসে। সব কথায় সুর বসে না। গান সেখানেই সার্থক যেখানে সুর হল ভাষার ব্যঞ্জক।... পথের পাঁচালি ছিল গ্রাম্য পরিবেশের কাহিনী। কিন্তু তা বলে তা লোকসাহিত্য নয়। তার ভাষায়, তার মেজাজে রীতিমত sophistication আছে। তার চরিত্রবর্ণনে আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির ছাপ আছে। ছবিতেও অনুরূপ sophistication আনবার চেষ্টা করা হয়েছিল।

বেহুলা সিনেমার শুটিংয়ে পরিচালক জহির রায়হান নির্দেশনা দিচ্ছেন

সুতরাং এর আবহসংগীতে কেবল গ্রাম্য যন্ত্রে গ্রাম্য সুর বাজানোর কোনো সার্থকতা আছে বলে আমরা মনে করিনি। বাঁশি, গুপিযন্ত্র, ঢোল ইত্যাদির সঙ্গে সেতার, সরোদ পাখোয়াজ মেশাতে তাই রবিশঙ্কর দ্বিধা করেননি।

চলচ্চিত্রে সংগীত একটি আবশ্যিক মাধ্যম যা কেবলই সুরসমৃদ্ধ বাণীনির্ভর কোনো গান নয়। যে-কোনো বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারও সংগীতের অংশ। তাই বাণীনির্ভর গান ছাড়াও চলচ্চিত্র নির্মিত হতে পারে কিন্তু সবাক চলচ্চিত্র যুগে সংগীতবিহীন চলচ্চিত্রের কথা ভাবা অসম্ভব। যদি বলি, সংগীত কেন অপরিহার্য, এক কথায় এ রকম উত্তর হতে পারে যে, সংগীত পরিবেশবান্ধব। প্রকৃতি ও পরিবেশের সব কিছুই ছন্দোবদ্ধ। প্রকৃতির সর্বত্র একটা নির্দিষ্ট রীতি বা ধারার অনুসরণ রয়েছে। প্রকৃতি শান্তি ও স্বস্তির আধার। যেখানে শৃঙ্খলা, সেখানেই শান্তি। যেহেতু প্রকৃতির সর্বত্র শৃঙ্খলা বিরাজমান, তাই একমাত্র প্রকৃতিতেই শান্তি। শুচিস্নিগ্ধ প্রকৃতিই বিশ্ব চরাচরকে শান্তির পাঠে উজ্জীবিত করতে পারে। ফারসি প্রবাদে বলা হয়, 'তলোয়ার দিয়ে রাজ্য জয় করা যায়, কিন্তু সংগীত দিয়ে শত্রুকে বন্ধু করা যায়'। পাশ্চাত্যের চলচ্চিত্রবোদ্ধারাও চলচ্চিত্রে সংগীতের প্রয়োজনের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন।

ফটোগ্রাফি বা চিত্রায়ন চলচ্চিত্রের মুখ্য ভাষা। অসংখ্য ছবির মেলবন্ধনেই চলচ্চিত্রের ভাষা মূর্ত হয়ে ওঠে। প্রয়াত চলচ্চিত্রকার জহির রায়হানের নামটি এখানে খুবই প্রাসঙ্গিকভাবে এসে যায়। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের উপর নির্মিত তাঁর অসাধারণ প্রামাণ্যচিত্র 'স্টপ জেনোসাইড' (১৯৭১)। 'গণহত্যা বন্ধ করো' এই শিরোনাম তুলে ধরে যে ফটোগ্রাফি বা চিত্রায়নে ছবিটি নির্মাণ করা হয়েছে, তা এককথায় অসাধারণ। এক দেশের মানুষের মুখের ভাষা অন্য দেশের মানুষের কাছে বোধগম্য না হলেও ছবির অসাধারণ ভাষায় সর্বগ্রাহী দৃশ্যপট নির্মাণ করা হয়েছে এই ছবিতে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উপর নির্মিত এই ছবিটি এখন পর্যন্ত দেশের প্রামাণ্যচিত্রের ক্ষেত্রে এক অনন্য মাইলফলক। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা সংগ্রামকে আশ্রয় করে জহির রায়হান আরো কয়েকটি ছবি নির্মাণ করেছেন: 'বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার' (১৯৭১), 'এ স্টেট ইজ বর্ন' (১৯৭১), 'লিবারেশন ফাইটার্স' (১৯৭১) এবং 'ইনোসেন্ট মিলিয়নস্' (১৯৭১)। অবশ্য স্বাধীনতাযুদ্ধের আগে তাঁর নির্মিত কাহিনিচিত্র 'জীবন থেকে নেয়া' (১৯৭০) এদেশের মানুষকে স্বাধীনতা সংগ্রামে যে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

চলচ্চিত্রায়ন যে ছবির আসল ভাষা সে কথার সার্থক প্রমাণ মেলে জহির রায়হানের 'জীবন থেকে নেয়া' (১৯৭১) ছবিতে। যদিও ছবিটি প্রতীকধর্মী কিন্তু তা সত্ত্বেও এ ছবির ফটোগ্রাফি এবং ফ্রেমিং অনেক কথা বলে দেয়, যা সংলাপে বলার প্রয়োজন হয়নি। ছোট্ট একটি উদাহরণ হিসেবে ছবিতে সমবেত কণ্ঠে 'কারার ঐ লৌহকপাট' গানের দৃশ্যটির কথা বলা যেতে পারে। অভিনয়ে প্রতিটি চরিত্রের শাণিত অভিব্যক্তির পাশাপাশি শটগুলোর ফ্রেম কম্পোজিশন দেখলেই বোঝা যায়, কী অসাধারণ নৈপুণ্যে প্রতিরোধ ও প্রতিবাদের ইমেজ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। প্রতিরোধের অস্ত্র হিসেবে দেখানো হয়েছে অসংখ্য লাঙল। এরই ফাঁকে ফাঁকে খুব ক্লোজ শট ধরা হয়েছে চরিত্রগুলোর। গানটি সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হলেও চরিত্রগুলোর ক্লোজ শট-এ তাদের প্রতিবাদী ইমেজ তুলে ধরে যে বার্তাটি নির্মাতা দিতে চেয়েছেন, তা খুবই প্রাসঙ্গিক। একই ছবিতে 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি চিত্রায়িত করা হয়েছে। দুটি গান সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি আঙ্গিকের। চিত্রায়নও করা হয়েছে সেভাবে। শটগুলো এমনভাবে কম্পোজ করা হয়েছে, যেখানে অভিনেতা অথবা অভিনেত্রীকে ক্লোজ ভিউ-তে রেখে গ্রামবাংলার পরিবেশকে দেখানো হয়েছে বড়ো পরিসরে। চমৎকার শট ডিভিশন গানের আবেদনকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

ছবির ভাষা যে ছবি, সেজন্য অতিরিক্ত শব্দ বা সংলাপ প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না–এ কথার প্রমাণ অনেক ছবিতেই মেলে। স্মরণ করা যেতে পারে কালজয়ী নির্মাতা ঋত্বিক ঘটকের 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৭৩) ছবির কথা। অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসকে কেন্দ্র করে ছবিটি নির্মাণ করা হয়েছে। মূলত বাংলাদেশের তিতাস নদী পাড়ের অবহেলিত জেলেদের সুখ-দুঃখ নিয়েই এই ছবি। অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাঁর উপন্যাস সম্পর্কে নিজেই বলেছেন:

> তিতাস একটি নদীর নাম। তার কূলজোড়া জল, বুকভরা ঢেউ, প্রাণভরা উচ্ছ্বাস। স্বপ্নের ছন্দে সে বহিয়া যায়। ভোরের হাওয়ায় তার তন্দ্রা ভাঙ্গে, দিনের সূর্য তাকে তাতায়, রাতের চাঁদ ও

তারারা তাকে ঘুম পাড়াইতে বসে, কিন্তু পারে না।... তিতাস শাহী মেজাজে চলে। তার সাপের মতো বক্রতা নাই, কৃপণের মতো কুটিলতা নাই। কৃষ্ণপক্ষের ভাঁটায় তার বুকের খানিকটা শুষিয়া নেয়, কিন্তু কাঙ্গাল করে না। শুক্লপক্ষের জোয়ারের উদ্দীপনা তাকে ফোলায়, কিন্তু উদ্বেল করে না।

চলচ্চিত্রকার ঋত্বিককুমার ঘটক যে খুবই বিশ্বস্ততার সাথে উপন্যাসটির চিত্রায়ন করেছেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। সাদা-কালো এ ছবির ফটোগ্রাফিই যেন ছবির ভাষা। অনেক না বলা কথা কেবল চিত্রায়নের মধ্য দিয়েই ফুটে উঠেছে। অদ্বৈত মল্লবর্মণের উপন্যাসের প্রেক্ষাপট চলচ্চিত্রকার এভাবে বর্ণনা করেছেন:

> 'তিতাস পূর্ব বাংলার একটা খণ্ডজীবন, এটি একটি সৎ লেখা। ইদানীং সচরাচর বাংলাদেশে (দুই বাংলাতেই) এ রকম লেখার দেখা পাওয়া যায় না। এর মধ্যে আছে প্রচুর নাটকীয় উপাদান, আছে দর্শনধারী ঘটনাবলী, আছে শ্রোতব্য বহু প্রাচীন সঙ্গীতের টুকরো– সব মিলিয়ে একটা অনাবিল আনন্দ ও অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করা যায়। ব্যাপারটা ছবিতে ধরা পড়ার জন্য জন্ম থেকেই কাঁদছিল।... অদ্বৈতবাবু অনেক অতিকথন করেন। কিন্তু লেখাটা একেবারে প্রাণ থেকে, ভেতর থেকে লেখা। আমি নিজেও বাবুর চোখ দিয়ে না দেখে ওইভাবে ভেতর থেকে দেখার চেষ্টা করেছি। অদ্বৈতবাবু যে সময়ে তিতাস নদী দেখেছেন, তখন তিতাস ও তার তীরবর্তী গ্রামীণ সভ্যতা মরতে বসেছে। বইয়ে তিতাস একটি নদীর নাম। তিনি এর পরের পুনর্জীবনটা দেখতে যাননি। আমি দেখাতে চাই যে, মৃত্যুর পরেও এই পুনর্জীবন হচ্ছে। তিতাস এখন আবার যৌবনবতী। আমার ছবিতে গ্রাম নায়ক, তিতাস নায়িকা'।

১৫৯ মিনিটের এই ছবিতে খুব কমই সংলাপ ব্যবহার করা হয়েছে। আঞ্চলিক ভাষাকে অবিকৃত রেখে সংলাপ প্রয়োগ ছাড়াও সারা ছবিজুড়ে যে ধরনের দৃশ্যকল্প তৈরি করা হয়েছে, তা কেবল ঋত্বিককুমার ঘটকের পক্ষেই সম্ভব।

এখানে আমরা সাধারণ দর্শকের দৃষ্টিতে চলচ্চিত্রের বহিরাবরণ বা সৌন্দর্য উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি মাত্র। যে-কোনো শিল্পমাধ্যমেরই বহিরাবরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। সুন্দর প্রচ্ছদপট, মনোরম বাঁধাই আর ঝকঝকে মুদ্রণের একটি বই স্বাভাবিকভাবেই একজন পাঠককে আকৃষ্ট করে। তেমনি একটি সুন্দর পরিপাটি চিত্রের ক্যানভাস দর্শককে প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ করে থাকে।

চলচ্চিত্রের সৌন্দর্যের কথা বলতে গেলে এভাবে বলা যায় যে, একজন নির্মাতার দৃষ্টিভঙ্গিই শেষকথা। নির্মাতার চেষ্টাই একটি চলচ্চিত্রকে সুন্দর করতে পারে। এখানে অবশ্যই চলচ্চিত্রকারের মেধা, মননশীলতা এবং রুচিবোধ সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। একজন চলচ্চিত্রকারের দায়িত্ব দর্শকের দৃষ্টি ও শ্রুতিকে একত্রে আকৃষ্ট করা। চলচ্চিত্র গবেষক সাজেদুল আউয়াল বিষয়টি এভাবে বিশ্লেষণ করেছেন:

> চলচ্চিত্রের নন্দনতত্ত্ব বিষয়টি এখনো সম্পূর্ণভাবে শাস্ত্রাবদ্ধ হয়নি। তবে অন্যান্য শিল্পাঙ্গিকের নান্দনিকতার ধরনটি অন্বেষণের ক্ষেত্রে যেসব প্রশ্ন ও বিবেচনার মুখোমুখি হতে হয় সেসব প্রশ্নের মুখোমুখি চলচ্চিত্রের নন্দনতত্ত্ব অন্বেষকদেরও হতে হয়। নন্দনতত্ত্বের বিষয়টি দর্শনশাস্ত্রের শিল্পসম্বন্ধীয় চিন্তাভাবনার আওতাধীন।... ভালো সিনেমা অহেতুক বকবক করে না। অপ্রয়োজনীয় শব্দ আর কথোপকথন অতিষ্ঠ করে তোলে না। বরং ইমেজগুলো উপহার দেয় নানা ইঙ্গিত এবং সংকেত।... ভালো সিনেমা এই ইঙ্গিতের ব্যবহারের মধ্য দিয়েই তার বিষয় উপস্থাপন করে। একজন কবি বা সাহিত্যিক বিভিন্ন শব্দ একসঙ্গে সংস্থাপন করে যে সুন্দর বাক্যটি রচনা করেন সেটি অনেক কিছু বলে দিয়েও কিছু বাকি রাখে সেটিই ইঙ্গিত।

নির্মাতা বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত-র চলচ্চিত্রের ভাষা ও নান্দনিকতা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে চলচ্চিত্র গবেষক সাজেদুল আউয়াল যথার্থই বলেছেন, ছবিতে অপ্রয়োজনীয় শব্দের চেয়ে ইমেজ অনেক বেশি কার্যকর। এসব ইমেজ চলচ্চিত্রের সৌন্দর্যের অন্যতম উপাদান। সাজেদুল আউয়ালের মতোই বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় মন্তব্য করেছেন:

> চিত্রপরিচালকের হাতে তথ্য পরিবেশনের যত রকম উপায় আছে তার মধ্যে দুর্বলতম হচ্ছে কথা। দৃশ্য বা ধ্বনির সাহায্যে কাজ না হলেই চিত্রনাট্যকার তথা পরিচালক কথার আশ্রয় গ্রহণ করেন। অন্তত সার্থক চলচ্চিত্রের এই নিয়ম। চীনাদের সেই উক্তি– 'এক ছবি হাজার কথার সামিল'– চলচ্চিত্রকারকে তাই মনে রাখতে হয়। শক্তিমান পরিচালকের প্রধান গুণ হল বাক্যের সাহায্য না নিয়েও দৃশ্যকে বাঙ্ময় করে তোলা। একাজে ক্যামেরা অভিনয় দৃশ্যগত ডিটেল সম্পাদনা ইত্যাদি সবকিছুই প্রয়োজনে আসতে পারে।

চলচ্চিত্রে ফটোগ্রাফি বা সিনেমাটোগ্রাফি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চলচ্চিত্রের সৌন্দর্য অনেকাংশে নির্ভর করে তার চিত্রায়নে। সত্যজিৎ রায়ের সাদা-কালো 'পথের পাঁচালি' (১৯৫৫) ছবিতে কাশবনের মধ্য দিয়ে দুই কিশোর-কিশোরী অপু ও দুর্গার ট্রেন দেখার জন্য ছুটে যাওয়ার দৃশ্যটির কথা ভাবা যেতে পারে। সাদা কাশবন আর ট্রেনের কয়লার ইঞ্জিনের কালো ধোঁয়ায় মিলেমিশে অপরূপ এক দৃশ্যপট। এভাবেই সুন্দর দৃশ্য সংযোজনার মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্রের সৌন্দর্য বিবেচিত হতে পারে। চলচ্চিত্রের কোনো দৃশ্যের শট এবং ফ্রেমগুলো সুন্দর হলেই সেই দৃশ্যটি সুন্দর হয়। দৃশ্যকল্প নির্মাণশৈলীর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। প্রয়াত চলচ্চিত্রকার আলমগীর কবির সিনেমা সম্পর্কে প্রায়ই বলতেন, Film is nothing but a make belief game অর্থাৎ বিশ্বাসযোগ্যতার যত বেশি কাছাকাছি যাওয়া যাবে, ততই সেটি সফল চলচ্চিত্র নির্মিত হবে। তাই অভিনয় যে চলচ্চিত্রের সৌন্দর্যের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, সে কথা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ সিনেমার দৃশ্যগত ডিটেল, সম্পাদনা ইত্যাদি। চলচ্চিত্রপ্রিয় দর্শকদের নিশ্চয়ই মনে আছে, পথের পাঁচালি-র সেই ঝড়-জলের পর অপু-দুর্গাদের বাড়ির ভাঙাচোরা রান্নাঘরটির কথা। দৃশ্যগত ডিটেল নির্মাণ করতে গিয়ে সেখানে একটি মরা ব্যাঙের উপস্থিতি যে কত জরুরি হতে পারে, সেটা না দেখলে বোঝা সম্ভব নয়। এখানেও ওই বিশ্বাসযোগ্যতার কথা ঘুরেফিরে আসে। আবার সম্পাদনার টেবিলে ভিন্ন-ভিন্ন শট জোড়া দিয়ে যখন দৃশ্য নির্মাণ করা হয়, তখনও 'make belief game'-এর কথাটাই মাথায় থাকে।

চলচ্চিত্রের সৌন্দর্য বিচারে এর প্রতিটি উপাদানই সমান গুরুত্বপূর্ণ। চলচ্চিত্র দেখা ও শোনার একটি যুগল মাধ্যম। দেখার জন্য ইমেজের সৌন্দর্যের পাশাপাশি শোনার জন্য শব্দ ও সুরমূর্ছনার সৌন্দর্যও বেশি জরুরি। চলচ্চিত্রের ধ্বনি বা শব্দটি দর্শক-শ্রোতা কীভাবে গ্রহণ করবেন, সেটিও ভাববার বিষয়। শব্দের মধ্যে সংলাপ, স্বাভাবিক স্বর ও সুর-ব্যঞ্জনা কোনোটির গুরুত্বই কম নয়। শ্রুতি যখন শ্রোতা ও দর্শকের কর্ণকুহরে বিরক্তি উৎপাদন না করে বরং আনন্দ জাগায়, শ্রোতা তখনই হয়তো আপনমনে গেয়ে ওঠেন: 'তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী,/আমি অবাক হয়ে শুনি কেবল শুনি'...

অবশ্যই চলচ্চিত্র অবাক হয়ে দেখা এবং শোনার এক আশ্চর্য মাধ্যম। অবাক এই অর্থে যে, দর্শক তার কল্পনাকে সিনেমার পর্দার সঙ্গে মিলিয়ে ভাবনার সুযোগ খুঁজে পান। কারণ সিনেমা তো শুধু নিছক দেখার বিষয় নয়, উপভোগ এবং সেইসাথে ভাবনাচিন্তারও বিষয় বটে।

লেখক: প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা

প্রথম বিএ পাস মুসলমান অভিনেত্রী বনানী চৌধুরী

অনুপম হায়াৎ

ধর্মীয় এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির কঠোর দেয়াল ভেঙে চল্লিশের দশকে কলকাতার যে শিক্ষিত বাঙালি মুসলমান অভিনেত্রী বিভিন্ন ছবিতে অভিনয় করে দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছিলেন, তিনি পূর্ব বাংলার মাগুরার মেয়ে বেগম আনোয়ারা নাহার। বনানী চৌধুরী ছদ্মনামে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন অভিনয় জগতে। পূর্ববঙ্গের বাঙালি মুসলমান মেয়েদের মধ্যে তিনিই প্রথম চলচ্চিত্রাভিনেত্রী। তিনি মঞ্চ নাটকেরও অভিনেত্রী। ঢাকার ছবিতেও তিনি অভিনয় করেছেন।

বেগম আনোয়ারা নাহার ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে পুলিশ অফিসার পিতা আফসার উদ্দীনের কর্মস্থল বনগাঁও-এ জন্মগ্রহণ করেন, তখন বাঙালি মুসলমান মেয়েদের সামাজিক অবস্থা ছিল খুবই রক্ষণশীল। সারা উপমহাদেশে চলছে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম। সচেতন মুসলমান পুরুষেরা এই সংগ্রামে অংশ নিলেও শিক্ষাদীক্ষার অভাবে নারীরা ছিল পিছিয়ে। তখন মুসলমান মেয়েদের হাতের লেখা অন্য পুরুষেরা দেখলে গর্হিত বলে বিবেচনা করা হতো। এমন পরিবেশে আনোয়ারার লেখাপড়া শুরু হয় মুর্শিদাবাদে। স্কুলে থাকতেই তিনি বিভিন্ন নাটকে অভিনয় করে সাহসের পরিচয় দেন এবং প্রশংসা পান। কিন্তু অষ্টম শ্রেণির গণ্ডি না পেরোতেই অল্প বয়সে তাঁর বিয়ে হয়ে যায় আবদুর রাজ্জাকের (পরবর্তীকালের বিশিষ্ট সাংবাদিক ও লেখক, 'কন্যা কুমারী' তাঁর পুরস্কৃত উপন্যাস) সঙ্গে। কিন্তু দারুণ জেদি আনোয়ারা ঘরে বসেই প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে একে একে ম্যাট্রিক, আইএ এবং বিএ পাস করেন। অভিনয়ের নেশা ছিল স্কুলে থাকতেই। শিক্ষার পাশাপাশি তিনি অভিনয় প্রতিভাকে বিকশিত করার চেষ্টা করেছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁকে উৎসাহ দেন সংস্কারমুক্ত মনের অধিকারী স্বামীও। কিন্তু বাঙালি মুসলমান পুরুষরাই যেখানে ধর্মীয় এবং সামাজিক বাধা পেরিয়ে অভিনয়ে জড়িত হতে পারছিলেন না সেখানে তাঁর মতো মেয়ের পক্ষে এ পথে আসা ছিল অকল্পনীয়।

বেগম আনোয়ারার যুগে যেসব মেয়ে মঞ্চ ও চিত্রজগতে অভিনয় করতেন, তাঁরা প্রায় সবাই ছিলেন পেশাদার বাইজি বা নিষিদ্ধ জগতের মেয়ে। নয়ত অতি সাহসী ও বিদ্রোহী। নির্বাক ও সবাক পর্বে ছবিতে যেসব মুসলমান অভিনেত্রী ছিলেন তাঁদের মধ্যে সুলতানা, মেহতাব, ফাতেমা, গওহর, জোবায়দা, শরীফা, সরদার আকতার, বিরবো, কজ্জনবাঈ, খুরশিদা, হুসনা বানু, জদ্দনবাঈ, নাসিম বানু, জেবুন্নেসা, আয়েশা প্রমুখের নাম করা যেতে পারে। এরা ছিলেন অবাঙালি। বাঙালি মুসলমান অভিনেত্রী হিসেবে প্রথম নাম জানা যায় মিস রোকেয়া আহমদের। রোকেয়ার বাবা ছিলেন বাঙালি ব্যারিস্টার, মা ছিলেন বিদেশিনী। রোকেয়া ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে লাহোরের *ওয়ান্ডারিং ড্যান্সার* ছবিতে অভিনয় করেন। সে বছরই বাঙালি মুসলমানদের প্রথম সবাক ছবিতে জড়িত হন কবি কাজী নজরুল ইসলাম কলকাতার ম্যাডান থিয়েটারে সংগীত বিশারদ হিসেবে। পরে তিনি *ধ্রুব* (১৯৩৪) ছবির পরিচালনা (যৌথভাবে), অভিনেতা, সংগীত পরিচালক, গায়ক হিসেবে কাজ করেন। নজরুলের পর আরো কজন বাঙালি মুসলমান পুরুষ চলচ্চিত্রে জড়িত হন। ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতাবাসী মাগুরার মেয়ে সুশিক্ষিত বেগম আনোয়ারা নাহার চলচ্চিত্রে আবির্ভূত হন 'বনানী চৌধুরী' ছদ্মনাম নিয়ে।

বনানী চৌধুরী প্রথম অভিনয় করেন *বিশ বছর আগে* ছবিতে। এ ছবির পরিচালক ছিলেন গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যান্য শিল্পী হলেন– দেবী মুখার্জী, ছায়া দেবী, মিহির ভট্টাচার্য, পদ্মা দেবী, অনুভা গুপ্তা, আরতি মজুমদার, মনোরঞ্জন প্রমুখ। কিন্তু ছবিটির কাজ বিলম্বিত হয়। ফলে এটি মুক্তি পায় ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে এপ্রিলে স্বাধীন ভারতে। অন্যদিকে বনানী চৌধুরী অভিনীত দ্বিতীয় ছবি *তপোভঙ্গ* মুক্তি পায় আগে ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারিতে ব্রিটিশ-ভারতে অবিভক্ত বাংলায়। এ ছবির পরিচালক ও চিত্রগ্রাহক ছিলেন বিভূতি দাস। অন্যান্য শিল্পী ছিলেন সন্ধ্যারানী, প্রমিলা, ত্রিদেবী, সুপ্রভা, মণিকা, মায়া, মংকরী, জহর গাঙ্গুলী প্রমুখ।

দেশ বিভাগের পরেও বনানী চৌধুরী কলকাতার চিত্রজগতের একজন প্রধান অভিনেত্রী হিসেবে কাজ করেছেন। এছাড়া তিনি বেতার এবং মঞ্চ নাটকের সঙ্গেও জড়িত হন। ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের দিকে তিনি জহির রায়হানের আমন্ত্রণে তাঁর *লেট দেয়ার বি লাইট* ছবিতে অভিনয় করেন। পরে তিনি ঢাকার আরো কয়েকটি ছবিতে অভিনয় করেন। বনানী চৌধুরী ঢাকায় ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে মারা যান।

বনানী চৌধুরীর উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রপঞ্জির মধ্যে রয়েছে

তপোভঙ্গ (১৯৪৭), *পূর্বরাগ* (১৯৪৭), *অভিযোগ* (১৯৪৭), *বিশ বছর আগে* (১৯৪৮), *নন্দরানীর সংসার* (১৯৪৮), *চলার পথে*, *পরশ পাথর*, *বিষের ধোঁয়া* (১৯৪৯), *মায়াজাল* (১৯৪৯), *চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন* (১৯৪৯), *মহাসম্পদ* (১৯৫০), *পথহারা*, *নিয়তি* (১৯৫১), *প্রস্তর স্বাক্ষর*, *শাপমোচন* (১৯৫৭), *শেষের কবিতা*, *তাপসী*, *কেরী সাহেবের মুন্সী* প্রভৃতি। ঢাকায় তাঁর অভিনীত ছবির মধ্যে রয়েছে: *লেট দেয়ার বি লাইট (অসমাপ্ত)*, *ধীরে বহে মেঘনা* (১৯৭৩), *সুখ-দুঃখের সাথী*, *আল্লাহ মেহেরবান*, *আকাশ পরী* প্রভৃতি।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে মুক্তিযুদ্ধ

মোহাম্মদ নজরুল হাসান ছোটন

চলচ্চিত্র হচ্ছে বিনোদনের মাধ্যম, যা একটি দেশের অন্যতম শক্তিশালী গণমাধ্যম। এর মাধ্যমে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের প্রতিফলন ঘটিয়ে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কার্যকর ভূমিকা পালন করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছিল দেশীয় চলচ্চিত্রের উন্নয়নের জন্য সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা। তিনি যেমন স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা, তেমনি তিনি বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের ভিত্তিভূমি 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা'রও প্রতিষ্ঠাতা।

বঙ্গবন্ধু ১৯৫৬ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকারের শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম ও দুর্নীতি দমন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। চলচ্চিত্র ছিল তখন শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন। নাজীর আহমেদ ছিলেন চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞ। তিনি বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করে ঢাকায় একটি স্থায়ী আধুনিক ফিল্ম স্টুডিও স্থাপনের দাবি তোলেন। বঙ্গবন্ধু তখন তাঁকে এ সংক্রান্ত কাগজপত্র তৈরির নির্দেশ দেন জরুরিভিত্তিতে। কারণ, তখন প্রাদেশিক আইন পরিষদের অধিবেশনের শেষদিন ছিল। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মোতাবেক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা চলচ্চিত্র সংস্থা গঠন সংক্রান্ত কাগজপত্র দ্রুত তৈরি করে বঙ্গবন্ধুর কাছে জমা দেন। অবশেষে ১৯৫৭ সালের ৩রা এপ্রিল বঙ্গবন্ধু প্রাদেশিক আইন পরিষদে 'পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র সংস্থা' বিল পরিষদের অধিবেশনে উত্থাপন করেন। বিলটি সামান্য সংযোজন-বিয়োজনের পর সর্বসম্মতভাবে আইন পরিষদে পাস হয়। যুগান্তকারী এই বিলের ওপর বঙ্গবন্ধু ছাড়াও আলোচনা ও পর্যালোচনায় অংশ নেন পরিষদের সদস্য আবদুল মতিন, মো. এমদাদ আলী, মুনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ।

এই সংস্থা গঠনের মাধ্যমে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে আধুনিক চলচ্চিত্র শিল্পের যাত্রা শুরু হয়। এর আগে এই অঞ্চলে চলচ্চিত্র নির্মাণের কোনো স্থায়ী স্টুডিও ছিল না। তখন এদেশের সিনেমা হলে প্রদর্শিত হতো আমেরিকার হলিউড, ফ্রান্স, ব্রিটেন, রাশিয়া, মিশর, ইতালি প্রভৃতি দেশ এবং কলকাতা, মুম্বাই, মাদ্রাজ, করাচি ও লাহোরে নির্মিত বিভিন্ন চলচ্চিত্র। অবশ্য এর আগে ১৯৩১ সালে ঢাকার নওয়াব পরিবারের উদ্যোগে নির্বাক কাহিনিচিত্র *দি লাস্ট কিস* এবং ১৯৫৬ সালে আবদুর জব্বার খানের পরিচালনায় প্রথম সবাক বাংলা কাহিনিচিত্র *মুখ ও মুখোশ* ও কয়েকটি প্রামাণ্যচিত্র নির্মিত হয়। এসব ছিল এ শিল্পের বিচ্ছিন্ন ঘটনা।

নাজীর আহমেদ এক সাক্ষাৎকারে বলেন, বঙ্গবন্ধুর উৎসাহ না থাকলে বোধ হয় এদেশে এফডিসি'র জন্ম হতো না। আর জন্ম হলেও হতো অনেক দেরিতে। চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা প্রতিষ্ঠার পর পরই বঙ্গবন্ধু মন্ত্রী থাকাকালে চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়নের সাথে অনেকগুলো গঠনমূলক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এসব সিদ্ধান্তের ফলে দ্রুত চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশ সম্ভব হয়। নির্মিত হতে থাকে একের পর এক চলচ্চিত্র, নতুন প্রযোজক-পরিচালক, শিল্পী-কুশলীরা এগিয়ে আসেন নতুন পেশায়। এফডিসি প্রতিষ্ঠার পর কয়েকটি জীবনধর্মী ও সৃজনশীল ছবির কাজ শুরু হয়। এসবের মধ্যে ছিল গ্রাম্যজীবন নির্ভর ফতেহ লোহানীর *আসিয়া* (১৯৫৭-১৯৬০), জেলে জীবননির্ভর আখতার জং কারদারের *পদ্মা নদীর মাঝি* অবলম্বনে নির্মিত *জাগো হুয়া সাভেরা* (১৯৫৯), আধুনিকতা বনাম কুসংস্কারনির্ভর মহিউদ্দিনের *মাটির পাড়ার* (১৯৫৯), দেশপ্রেমনির্ভর এহতেশামের *এদেশ তোমার আমার* (১৯৫৯), পশ্চিম পাকিস্তানি জনৈক পরিচালকের *হামসফর*। বঙ্গবন্ধু ওই সময় মহান ভাষা আন্দোলন ও একুশে ফেব্রুয়ারি নিয়ে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণেরও ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি ফতেহ লোহানীকে নির্দেশও দিয়েছিলেন বলে কামাল লোহানী সূত্রে জানা যায়। ১৯৫৯ সালে এফডিসি থেকে নিয়মিতভাবে ছবি মুক্তি পেতে থাকে এবং তা বর্তমানেও অব্যাহত আছে।

বঙ্গবন্ধু আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সকল প্রেরণার উৎস। তাঁর আমলে চলচ্চিত্রের ইতিহাসে সংযোজন হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র নির্মাণ। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এই যাত্রা শুরু হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে কয়েকটি প্রামাণ্য চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। এগুলো ছিল জহির রায়হানের *স্টপ জেনোসাইড* ও *এ স্টেট ইজ বর্ন*, আলমগীর কবিরের *লিবারেশন ফাইটার্স* এবং বাবুল চৌধুরীর *ইনোসেন্ট মিলিয়ন্স*। ১৯৭২ সালে দেশ স্বাধীনের পর শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কাহিনিচিত্র নির্মাণ। সর্বপ্রথম চাষী নজরুল ইসলাম নির্মাণ করেন *ওরা ১১ জন* (১৯৭২) এবং *সংগ্রাম* (১৯৭৪)। সুভাষ দত্ত নির্মাণ করেন *অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী* (১৯৭২), মমতাজ আলী নির্মাণ করেন *রক্তাক্ত বাংলা* (১৯৭২), আনন্দ পরিচালনায় *বাঘা বাঙ্গালী* (১৯৭২), আলমগীর কবীরের *ধীরে বহে মেঘনা* (১৯৭৩), খান আতাউর রহমানের *আবার তোরা মানুষ হ* (১৯৭৩), আলমগীর কুমকুমের *আমার জন্মভূমি* (১৮৭৩) এবং মিতার *আলোর মিছিল* (১৯৭৪)। অন্যদিকে মুক্তি পায় *জয় বাংলা* (১৯৭২)। এ সময় চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর থেকে বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও সমাজগঠনমূলক বিষয়ে অনেক প্রামাণ্য ও স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মিত হয়।

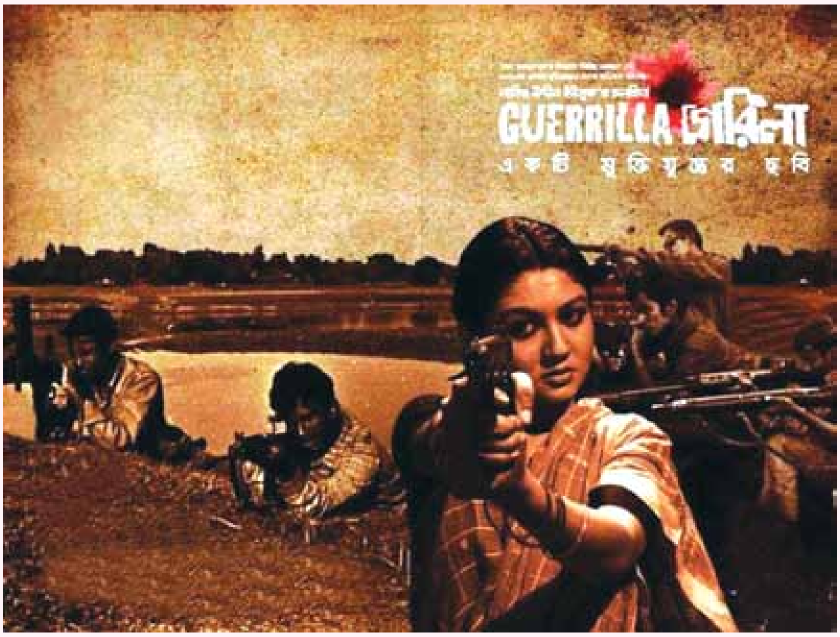

বঙ্গবন্ধুর আমলে ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত বাস্তব জীবনধর্মী, গ্রাম্যসমাজ ও দেশীয় সংস্কৃতিনির্ভর অনেক ছবি নির্মিত হয়, যার সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধেরও কিছুটা মিল আছে। এমন উল্লেখযোগ্য

চলচ্চিত্রগুলো হলো– মিতার *এরাও মানুষ* (১৯৭২), এসএম শফির *ছন্দ হারিয়ে গেলো* (১৯৭২), কামাল আহমেদের *অশ্রু দিয়ে লেখা* (১৯৭২), রুহুল আমিনের *নিজেরে হারিয়ে খুঁজি* (১৯৭২), কাজী জহিরের *অবুঝ মন* (১৯৭২), আব্দুল জব্বার খানের *খেলাঘর* (১৯৭২), মহিউদ্দিনের *দুরন্ত দুর্বার* (১৯৭৩), কামাল আহমেদের *অনির্বাণ* (১৯৭৩), রূপসনাতনের *দয়াল মুর্শিদ* (১৯৭৩), কবির আনোয়ারের *শ্লোগান* (১৯৭৩), এফএ ফিল্মস-এর *শনিবারের চিঠি* (১৯৭৪), রুহুল আমীনের *বেঈমান* (১৯৭৪), ফয়েজ চৌধুরীর *মালকাভানু* (১৯৭৪), বেবী ইসলামের *চরিত্রহীন* (১৯৭৫), ফজলুল হকের *উত্তরণ* (১৯৭৫), মহসিনের *বাদী থেকে বেগমই* (১৯৭৫)। এসময় উপন্যাসভিত্তিক চলচ্চিত্রগুলো ছিল অদ্বৈত মল্লবর্মনের উপন্যাস অবলম্বনে ঋত্বিক ঘটকের *তিতাস একটি নদীর নাম* (১৯৭৩), দিলারা হাসানের *ঘর মন জানালা* উপন্যাস অবলম্বনে সুভাষ দত্তের *বলাকা মন* (১৯৭৩), নীহার রঞ্জন গুপ্তের উপন্যাস অবলম্বনে সি বি জামানের *ঝড়ের পাখি* (১৯৭৩), ইন্দু সাহার *গঙ্গা পাড়ের খেয়া* উপন্যাস অবলম্বনে রূপকারের *পলাতক* (১৯৭৩), কাজী আনোয়ার হোসেনের গোয়েন্দা রহস্যকাহিনি নিয়ে মাসুদ পারভেজের *মাসুদ রানা* (১৯৭৪) প্রভৃতি। ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে নির্মিত হয় সৈয়দ হাসান ইমামের *লালন ফকির* (১৯৭২), এম আলীর *বাংলার ২৪ বছর* (১৯৭৪), মহিউদ্দিনের *ঈশাখাঁ* (১৯৭৪) এবং নিয়াজ ইকবালের *আজও ভুলিনি* (১৯৭৫)।

স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশে চলচ্চিত্র সংস্কৃতি বিকাশ ও চর্চার ক্ষেত্রে নব জোয়ারের সৃষ্টি হয়। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫-এর মধ্যে ১৪ থেকে ১৫টি চলচ্চিত্র সংসদ গঠিত হয়। ১৯৭৩ সালে গঠিত হয় বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদ ফেডারেশন। এসময় বিদেশে বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র মেলা অনুষ্ঠিত হয়, প্রেরিত হয় প্রতিনিধিদল এবং পায় প্রশংসা ও পুরস্কার। ১৯৭২ সালে তাসখন্দ চলচ্চিত্র উৎসবে জহির রায়হানের *স্টপ জেনোসাইড* পুরস্কার পায়। পরে এটি 'সিডালক' পুরস্কারও পায়। ১৯৭৩ সালে সুভাষ দত্তের *অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী* মস্কোতে এবং ১৯৭৪ সালে খান আতাউর রহমানের *আবার তোরা মানুষ হ* ও মিতার *আলোর মিছিল* তাসখন্দ চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়। ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের আগ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু ও চলচ্চিত্র নানা আলোকে উদ্ভাসিত হয়। তাঁর সময় চলচ্চিত্র শিল্প নতুন করে ভিত্তি ও ব্যঞ্জনা পায়। এসময় বাড়তে থাকে নতুন চলচ্চিত্রের সংখ্যা। নির্মিত হতে থাকে নব্যধারা ও মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র, সাহিত্যনির্ভর চলচ্চিত্র, অসাম্প্রদায়িক চেতনার চলচ্চিত্র। অন্যদিকে পুনর্গঠিত হয় এফডিসি, সেন্সর বোর্ড, ডিএফপি, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, বিটিভি, সংযোজিত হয় সেন্সর নীতিমালা, গঠিত হয় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, প্রচেষ্টা চলে ফিল্ম ইনস্টিটিউট ও শিল্প আর্কাইভ প্রতিষ্ঠার, বিদেশে প্রেরিত হয় চলচ্চিত্র প্রতিনিধিদল, বিদেশি মেলায় ও প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় বাংলাদেশের চলচ্চিত্র, দেশে অনুষ্ঠিত হয় বিদেশি চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন নতুন মাত্রা পায়। শিল্পী-কুশলীরা এগিয়ে আসেন এই পেশায়।

দেশ স্বাধীনের পর বঙ্গবন্ধু দেশীয় চলচ্চিত্রের স্বার্থে ভারতীয় ছবির আমদানি ও প্রদর্শন বন্ধ করে দেন। পরিশেষে এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বঙ্গবন্ধু সেই পাকিস্তান আমলে চলচ্চিত্রের গুরুত্ব অনুধাবন করে 'চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা' গঠন করেছিলেন আর ১৯৭৪ সালে তৎকালীন তথ্য ও বেতার প্রতিমন্ত্রীকে ভারতের পুনায় পাঠিয়েছিলেন বাংলাদেশে ফিল্ম ইনস্টিটিউট ও ফিল্ম আর্কাইভ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তথ্য ও জ্ঞান লাভের জন্য। বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের চলচ্চিত্র এক হয়ে আছে। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের প্রতিষ্ঠা, উন্নয়ন ও বিকাশে মাইলফলক স্থাপন করে গেছেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু সপরিবার শহিদ হওয়ার পর বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের পর্দা থেকে মুক্তিযুদ্ধের নিদর্শন ও চেতনা নির্মূল হয়ে যায় পরিবর্তিত রাজনৈতিক কারণে। এভাবে অনেকদিন চলে যায়। বাংলা চলচ্চিত্রের প্রেক্ষাপট থেকে মুক্তিযুদ্ধ হারিয়ে যায়। অনেক বছর পর কিছু কাহিনিকার মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপন্যাস লিখে এবং পরিচালকরা সে গল্প-উপন্যাস নিয়ে চলচ্চিত্র তৈরি করে। এসময় হুমায়ূন আহমেদ ১৯৯৪ সালে *আগুনের পরশমনি* ও *শ্যামল ছায়া* (২০০৪) এবং কাজী হায়াত *দেশ প্রেমিক* নামে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। এরপর তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ নির্মাণ করেন *মুক্তির গান* (১৯৯৫) ও *মুক্তির কথা* (১৯৯৯) এবং *মাটির ময়না* (২০০২), চাষী নজরুল ইসলাম নির্মাণ করেন *হাঙ্গর নদী গ্রেনেড* (১৯৯৭) ও *মেঘের পর মেঘ* (২০০৪), তৌকির আহমেদ নির্মাণ করেন *জয়যাত্রা* (২০০৪), রুবাইয়াত হোসেন নির্মাণ করেন *মেহেরজান* (২০১১), মোরশেদুল ইসলাম নির্মাণ করেন *আমার বন্ধু রাশেদ* (২০১১), নাসিরউদ্দীন ইউসুফ নির্মাণ করেন *গেরিলা* (২০১১), মাসুদ আখন্দ নির্মাণ করেন *পিতা* (২০১২), মাসুদ পথিক নির্মাণ করেন *নিকাব্বরের মহাপ্রয়াণ* (২০১৪), মৃত্যুঞ্জয় দেবব্রত নির্মাণ করেন *চিলড্রেন অফ ওয়ার* (২০১৪), সোহেল আরমান নির্মাণ করেন *এইতো প্রেম* (২০১৫), মোরশেদুল ইসলাম নির্মাণ করেন *অনিল বাগচীর একদিন* (২০১৫) এবং ২০১৭ সালে ফকরুল আরেফিন খান নির্মাণ করেন *ভুবন মাঝি*।

চলচ্চিত্রের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের একটি গভীর সম্পর্ক আছে। কারণ চলচ্চিত্র হচ্ছে এক শিল্প মাধ্যম। এই শিল্পের মাধ্যমে সমাজের ভালো-মন্দ দিকগুলো উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে জনগণের কাছে। তেমনি মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক-হানাদাররা যে বর্বরোচিত জঘন্য হামলা চালিয়েছিল নিরীহ-নিরস্ত্র-নিপীড়িত বাঙালিদের ওপর, মূলত সেই দৃশ্যগুলোই মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রগুলোর মাধ্যমে তুলে ধরেছেন এদেশের পরিচালকরা। সে হিসেবে বলা যায়, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলা চলচ্চিত্র একে অন্যের পরিপূরক। কারণ একটির মাধ্যমে অন্যটিকে ধারণ করে জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়, তাদেরকে সেই অবিস্মরণীয় '৭১-এর দিনগুলো মনে করিয়ে দেয় মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বাংলা চলচ্চিত্র।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে মুক্তিযুদ্ধকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। অনেক পরিচালক মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ৯ মাস পাক-হানাদারবাহিনী যেসব ঘৃণিত অত্যাচার-অনাচার করেছে সাড়ে সাত কোটি নিরীহ বাঙালির ওপর, বাঙালি মা-বোনদের তারা যেভাবে লাঞ্ছিত করেছে, সম্ভ্রম হানি করেছে, নিরীহ বাঙালিদের ওপর অস্ত্র চালিয়েছে অযৌক্তিকভাবে– এ ধরনের বাস্তব দৃশ্যই কার্যত চলচ্চিত্রে ফুটিয়ে তুলেছে বাঙালি পরিচালকরা। এই মুক্তিযুদ্ধ যারা দেখেছে, তারা আজও সেসব কথা মনে করে আঁতকে ওঠে; যারা মুক্তিযুদ্ধ দেখেনি, শুধু নাম শুনেছে তারাও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র দেখে আঁতকে ওঠে, ভাবে কী ভয়ংকর এক যুদ্ধ হয়েছিল '৭১ সালে! পাকহানাদাররা কী নির্মম অত্যাচার করেছে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর!

পরিশেষে বলা যায়– মুক্তিযুদ্ধকে জানা, দেখা ও বোঝার জন্য বাংলা চলচ্চিত্রের অনেক অবদান আছে। কারণ পরিচালকরা চলচ্চিত্রের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধকে তুলে ধরেছেন বিভিন্নভাবে, যা দেখে নতুন প্রজন্মও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারে, শিখতে পারে, নিজ দেশকে স্বাধীন করা সম্পর্কে সচেতন হতে পারে।

লেখক: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

অস্কারজয়ী বাঙালি চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি

আপন চৌধুরী

সত্যজিৎ রায় বিশ্ববিখ্যাত বাঙালি চলচ্চিত্রকার। অস্কার জয়ী প্রথম ও একমাত্র বাঙালি পরিচালক। সত্যজিৎ রায় ১৯২১ সালের ২রা মে জন্মগ্রহণ করেন। অস্কার প্রাপ্তির কিছুদিন পরেই ১৯৯২ সালের ২৩শে এপ্রিল এই খ্যাতিমান পরিচালক মৃত্যুবরণ করেন। প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে পাঠকদের জন্য তাঁর ব্যক্তিগত জীবন, পুরস্কার ও সম্মাননার বিবরণ সংক্ষেপে দেওয়া হলো:

সত্যজিৎ রায় একজন কিংবদন্তি লেখক, চলচ্চিত্র পরিচালক, চিত্রকর। তাঁর চলচ্চিত্রে প্রাধান্য পেয়েছে একধরনের স্থিরতা, সূক্ষ্মতা ও কাব্যিকতা। সত্যজিতের কাজে প্রাধান্য পেয়েছে পশ্চিমা ছবির পরিমিতিবোধ। তাঁর প্রায় সব ছবিতেই ইতালিয়ান নিউরিয়ালিজম ধারা প্রকাশ পায়। এই ধারার পরিচালকরা কোনো লেখকের রচনা হুবহু অনুকরণে আগ্রহী নন। চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে সাহিত্যভিত্তিক কাহিনিকে পরিবর্তন বা সংযোজন করেন। যাতে স্পষ্ট দৃশ্যমান হয় পরিচালকের স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি ও সৃজনশীলতা। তাঁর ছবি ছিল উদার মানবতাবাদী আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত। তিনি প্রায় ছবি শেষ করেছেন আশা দেখানোর মাধ্যমে। বাংলা ভাষার চলচ্চিত্রের উজ্জ্বল নক্ষত্র সত্যজিৎ রায় তাঁর প্রথম চলচ্চিত্র 'পথের পাঁচালী'র (১৯৫৫) মাধ্যমে বাংলা ভাষার চলচ্চিত্রকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। তিনি অর্জন করেছেন বহু পুরস্কার ও সম্মাননা এবং পেয়েছেন খ্যাতিমান চলচ্চিত্র পরিচালকের মর্যাদা।

বিশ্ববিখ্যাত এই পরিচালকের জন্ম ১৯২১ সালের ২রা মে উত্তর কলকাতার গড়পার রোডে। সুকুমার রায় ও সুপ্রভা রায়ের একমাত্র সন্তান সত্যজিৎ রায়। সত্যজিৎ রায়ের দাদা উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (১৮৬৩-১৯১৫) ও বাবা সুকুমার রায় (১৮৮৭-১৯২৩) উভয়ের জন্ম বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জ জেলার মসূয়া গ্রামে। ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে রায় চৌধুরী পরিবারটি কলকাতায় চলে যায়। উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী ছিলেন একজন প্রখ্যাত লেখক, শিশু সাহিত্যিক, চিত্রকর এবং শিশুতোষ পত্রিকা 'সন্দেশ' (১৯১৩)-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। সত্যজিৎ রায়ের পিতা সুকুমার রায়ও ছিলেন ছড়াকার ও শিশু সাহিত্যিক। পারিবারিক, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বেড়ে উঠা সত্যজিতের লেখায় ও চলচ্চিত্রে যথেষ্ট মেধা ও মননের পরিচয় পাওয়া যায়। জন্মের মাত্র দুই বছরের মাথায় পিতার মৃত্যুর পর ১৯২৬ সালে সত্যজিৎ ও তাঁর মা আশ্রয় নেন মামার বাড়ি। ওখানেই শুরু হয় সত্যজিতের লেখাপড়া। ১৯৩০ সালে সত্যজিতকে ভর্তি করা হয় বালিগঞ্জ গর্ভনমেন্ট হাইস্কুলে। সত্যজিৎ রায়ের জীবনে তাঁর মা সুপ্রভা রায়ের প্রভাব অপরিসীম। মায়ের প্রসঙ্গে সত্যজিৎ লিখেছেন–

> মায়ের জীবনটা স্ট্রাগলে ভরা। আমাদের ব্যবসা উঠে গেল। পৈতৃক বাড়ি ছাড়তে হলো, কিছুই নেই। ছোটো মামা দয়া করে একটু আশ্রয় দিলেন। লেডি অবলা বসুকে ধরে মা চাকরি নিলেন বিদ্যাসাগর বাণী ভবনে। সেলাইটা জানতেন তাই রক্ষে। এমব্রয়ডারি করে আমাকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করার জন্য মা ভোর থেকে রাত পর্যন্ত পরিশ্রম করতেন। আমার মায়ের গুণের শেষ নেই। মডেলিং শিখেছিলেন নিতাই মল্লিকের কাছে। পেন্টিং শিখেছিলেন। চবিশ ঘণ্টার মধ্যে আঠারো ঘণ্টা কাজ করার আদর্শ আমি মার কাছ থেকে পেয়েছি। চৌদ্দ বৎসরে যে ম্যাট্রিক পাস করি সেও মায়ের জন্যে।

সত্যজিৎ রায়ের প্রতিকৃতি

সত্যজিতের মামাবাড়িতে ছিল সাংস্কৃতিক পরিবেশ। গান বাজনা, ছবি আঁকার পাশাপাশি ক্যামেরার কাজও শিখে ফেলেন। ১৯৩৬ সালে ক্যামেরায় ছবি তুলে পুরস্কার পান। ম্যাট্রিক পাসের পর ভর্তি হন প্রেসিডেন্সি কলেজে অর্থনীতি বিষয়ে। ১৯৪০ সালে চিত্রকলা শিক্ষার জন্য ভর্তি হন শান্তিনিকেতনে। ১৯৪৩ সালে কমার্শিয়াল আর্টিস্ট হিসেবে যোগ দেন একটি বিজ্ঞাপনী সংস্থায়। ওখানে বিজ্ঞাপনের ভাষা ও ডিজাইনে প্রচ্ছদ প্রকাশনায় যোগ করেন নতুন মাত্রা। ১৯৪৮ সালে সত্যজিৎ রায় কলকাতায় গঠন করেন 'ফিল্ম সোসাইটি'। এই সোসাইটির মাধ্যমে ধ্রুপদী চলচ্চিত্র দেখা ও আলাপ- আলোচনার মাধ্যমে চলচ্চিত্র নির্মাণে আগ্রহী হন। ১৯৫০ সালে সত্যজিৎ রায় বিজ্ঞাপন এজেন্সির চাকরিসূত্রে লন্ডনে বদলি হন। ওখানে অবস্থানকালে ইতালিয়ান পরিচালক ভিত্তোরিও ডিসিকার 'দ্য বাইসাইকেল থিভস্' (১৯৪৭) দেখে মুগ্ধ হন এবং বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাস অবলম্বনে চলচ্চিত্র বানানোর সিদ্ধান্ত নেন। অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে 'পথের পাঁচালী' (১৯৫৫) মুক্তি লাভ করে। এরপর বিশ্বজোড়া খ্যাতি লাভ করেন তিনি।

সত্যজিৎ রায়ের প্রবন্ধ সংগ্রহ থেকে জানা যায়, ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এই মহান চলচ্চিত্র শিল্পী বাংলাদেশে আসেন। বক্তৃতা করেছিলেন পল্টন ময়দানে। তিনি বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষা সম্পর্কে বলেন:

> বহুদিন থেকে শহীদ দিবসের কথা শুনে আসছি। একুশে ফেব্রুয়ারীর কথা শুনে আসছি। কিন্তু এখানে এসে নিজের চোখে না দেখলে আমি বিশ্বাস করতে পারতাম না। আপনারা বাংলা ভাষাকে কতখানি ভালোবাসেন। বাংলা ভাষা যখন বিপন্ন, তাকে বাঁচানোর জন্য যে সংগ্রাম হয়েছিল, তাতে তাঁরা আত্মোৎসর্গ করেছেন তাঁদের যে কতখানি শ্রদ্ধা করেন আপনারা, তাঁদের স্মৃতিকে সেটা আমি আজকে এখানে এসে বুঝতে পারছি। আমারা যারা পশ্চিমবঙ্গে থাকি, আমরাও বাংলা ভাষাকে ভালোবাসি। এটা ঠিক যে, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির মধ্যে আর পাঁচ রকম সংস্কৃতির প্রভাব এসে পড়ে সেটাকে একটা পাঁচমিশালি ভাব এনে দিয়েছে। ইংরেজীর প্রভাব আমরা এখনো পশ্চিমবঙ্গে সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে

পারিনি। তার একটা কারণ এই বোধ হয় যে, পশ্চিমবঙ্গ হলো ভারতবর্ষের একটা প্রাদেশিক অংশমাত্র। কিন্তু তাই বলে এই নয় যে, আমরা বাংলা ভাষাকে ভালোবাসি না। বাংলা সাহিত্য, বাংলা গান, বাংলা চলচ্চিত্র, বাংলা থিয়েটার এসবই পশ্চিমবঙ্গে এখনো বেঁচে আছে, টিকে আছে। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র এঁদের আমরা এখনো ভালোবাসি।

আমি ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি যে, আমি আজ ২০ বছর ধরে বাংলা ছবি করছি। এর মধ্যে বহুবার বহু জায়গা থেকে অনুরোধ এসেছে যে আমি বাংলাদেশ, বাংলা ভাষা পরিত্যাগ করে অন্য দেশে, অন্য ভাষায় চিত্র রচনা করি। কিন্তু আমি সেই অনুরোধ বারবার প্রত্যাখ্যান করেছি। কারণ আমি জানি, আমার রক্তে যে ভাষা বইছে, সে ভাষা হলো বাংলা ভাষা, আমি জানি যে সেই ভাষাকে বাদ দিয়ে অন্য ভাষায় কিছু করতে গেলে আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাবে, আমি কূলকিনারা পাব না, শিল্পী হিসেবে আমি মনের জোর হারাব।

সত্যজিৎ রায় সর্বমোট ৩৬টি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। তার অধিকাংশ চলচ্চিত্র ছিল শিল্প-সাহিত্যনির্ভর। তিনি বাংলা চলচ্চিত্রকে নতুনভাবে বিশ্বের কাছে উপস্থাপন করেন।

কলকাতার ব্যস্ত রাস্তায় 'আগন্তুক' ছবির শুটিং-এর এক মুহূর্তে সত্যজিৎ রায়

চলচ্চিত্র ও কাহিনিচিত্রের জন্য তাঁর পুরস্কার–

পথের পাঁচালী (১৯৫৫): রাষ্ট্রপতির স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক, ভারত, ১৯৫৬। শ্রেষ্ঠ মানবিক দলিল, কান, ১৯৫৬। ডিপ্লোমা অফ মেরিট, এডিনবার্গ, ১৯৫৬। গোল্ডেন কারবাও, ম্যানিলা, ১৯৫৬। ভ্যাটিকান পুরস্কার, রোম, ১৯৫৭। শ্রেষ্ঠ ছবি ও শ্রেষ্ঠ পরিচালনা, সানফ্রান্সিসকো, ১৯৫৭। সেলজনিক গোল্ডেন লরেল, বার্লিন, ১৯৫৭। শ্রেষ্ঠ ছবি, ভ্যাঙ্কুবার, কানাডা, ১৯৫৮। সমালোচকদের বিচারে শ্রেষ্ঠ ছবি, স্টাটফোর্ড, কানাডা, ১৯৫৮। শ্রেষ্ঠ বিদেশি ছবি, আফ্রো আর্টস থিয়েটার, নিউইর্য়ক, ১৯৫৯। শ্রেষ্ঠ অ-ইউরোপীয় ছবি হিসেবে বদিল পুরস্কার, ডেনমার্ক, ১৯৬৬। শ্রেষ্ঠ বিদেশি ছবি, কিনিমা জামপো পুরস্কার, টোকিও, ১৯৬৬। অপু-ত্রয়ীর প্রতিটির জন্য উইংটন পুরস্কার, লন্ডন, ১৯৬০।

অপরাজিত (১৯৫৬): গোল্ডেন লায়ন অফ সেন্ট মার্ক, ভেনিস ফিল্মোৎসব, ১৯৫৭। সিনেমা ন্যুভো, ভেনিস, ১৯৫৭। সমালোচকদের পুরস্কার, ভেনিস, ১৯৫৭। সমালোচকদের বিচারে শ্রেষ্ঠ ছবি ও শ্রেষ্ঠ পরিচালনা, সানফ্রান্সিসকো, ১৯৫৮। শ্রেষ্ঠ বিদেশি ছবির জন্য গোল্ডেন লরেন, আমেরিকা, ১৯৫৮। সেলজনিক গোল্ডেন লরেল, বার্লিন, ১৯৬০। শ্রেষ্ঠ অ-ইউরোপীয় ছবি হিসেবে বদিল পুরস্কার, ডেনমার্ক, ১৯৬৭। অপু-ত্রয়ীর প্রতিটির জন্য উইংটন পুরস্কার, লন্ডন, ১৯৬০।

জলসাঘর (১৯৫৮): রাষ্ট্রপতির রৌপ্যপদক, ভারত, ১৯৫৮। সংগীতের জন্য রৌপ্যপদক, মস্কো, ১৯৫৯।

অপুর সংসার (১৯৫৯): রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক, ভারত, ১৯৫৯। শ্রেষ্ঠ মৌলিক ও আবেগপ্রবণ ছবি হিসেবে সাদারল্যান্ড পুরস্কার, লন্ডন, ১৯৬০। ডিপ্লোমা অফ মেরিট, এডিনবার্গ, ১৯৬০। শ্রেষ্ঠ বিদেশি ছবি, ন্যাশনাল বোর্ড অফ রিভিউ অফ মোশন পিকচারস, আমেরিকা, ১৯৬০। অপু-ত্রয়ীর প্রতিটির জন্য উইংটন পুরস্কার, লন্ডন, ১৯৬০।

দেবী (১৯৬০): রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক, ভারত, ১৯৬০।

তিনকন্যা (১৯৬১): সমাপ্তি'র জন্য রাষ্ট্রপতির রৌপ্যপদক, ভারত, ১৯৬১। সমাপ্তি ও পোস্ট মাস্টারের জন্য মেলবোর্ন ট্রফি: গোল্ডেন বুমেরাং (গ্রাঁ পি), মেলবোর্ন, ১৯৬২। সেলজনিক গোল্ডেন লরেল, বার্লিন, ১৯৬৩।

অভিযান (১৯৬২): রাষ্ট্রপতির রৌপ্যপদক, ভারত, ১৯৬২।

মহানগর (১৯৬৩): সার্টিফিকেট অফ মেরিট, ভারত, ১৯৬৩। শ্রেষ্ঠ পরিচালক হিসেবে রৌপ্য ভালুক, বার্লিন, ১৯৬৪।

চারুলতা (১৯৬৪): রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক, ভারত, ১৯৬৪। শ্রেষ্ঠ পরিচালক হিসেবে রৌপ্য ভালুক, বার্লিন, ১৯৬৫। ক্যাথলিক পুরস্কার, বার্লিন, ১৯৬৫। শ্রেষ্ঠ ছবি, আকাপুলকো, মেক্সিকো, ১৯৬৫।

নায়ক (১৯৬৬): রাষ্ট্রপতির রৌপ্যপদক, ভারত, ১৯৬৬। রাষ্ট্রপতির পুরস্কার, শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্য ও কাহিনি, ভারত, ১৯৬৬। বিশেষ জুরি পুরস্কার, বার্লিন, ১৯৬৬। ইউনিক্রিট সমালোচকদের প্রদত্ত পুরস্কার, বার্লিন, ১৯৬৬।

চিড়িয়াখানা (১৯৬৭): শ্রেষ্ঠ পরিচালক, ভারত, ১৯৬৭। গুপী গাইন বাঘা বাইন (১৯৬৯) রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক, ভারত, ১৯৬৯। রাষ্ট্রপতির রৌপ্যপদক, শ্রেষ্ঠ পরিচালক, ভারত, ১৯৬৯। শ্রেষ্ঠ পরিচালক, সিলভার ক্রস পুরস্কার, অ্যাডিলেড, ১৯৬৯। শ্রেষ্ঠ মৌলিক ছবির জন্য শ্রেষ্ঠ পরিচালক, অকল্যান্ড, ১৯৬৯। মেরিট অ্যাওয়ার্ড, টোকিও, ১৯৭০। শ্রেষ্ঠ ছবি, মেলবোর্ন, ১৯৭০।

প্রতিদ্বন্দ্বী (১৯৭০): রাষ্ট্রপতির রৌপ্যপদক, ভারত, ১৯৭০। দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ছবি, ভারত, ১৯৭০। বিশেষ পুরস্কার, ভারত, ১৯৭০।

সীমাবদ্ধ (১৯৭১): রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক, ভারত, ১৯৭২। এফআইপি আরইএসসিআই (চলচ্চিত্র সমালোচকদের) পুরস্কার, ভেনিস, ১৯৭২।

অশনি সংকেত (১৯৭৩): রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক, ভারত, ১৯৭৩। শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক, ভারত, ১৯৭৩। গোল্ডেন হুগো, শিকাগো, ১৯৭৩। শ্রেষ্ঠ ছবির জন্য স্বর্ণ ভালুক, বার্লিন, ১৯৭৪।

সোনার কেল্লা (১৯৭৪): রাষ্ট্রপতির রৌপ্যপদক, ভারত, ১৯৭৪। শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্য, ভারত, ১৯৭৪। শ্রেষ্ঠ ছবি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৭৪। শ্রেষ্ঠ পরিচালক, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৭৪। শিশু ও কিশোরদের জন্য শ্রেষ্ঠ কাহিনিচিত্র, গোল্ডেন স্ট্যাচু পুরস্কার, তেহরান, ১৯৭৫।

জন অরণ্য (১৯৭৫): শ্রেষ্ঠ পরিচালক, ভারত, ১৯৭৫। শ্রেষ্ঠ ছবি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৭৫। শ্রেষ্ঠ পরিচালক, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৭৫। কালোভি ভ্যারি পুরস্কার, ১৯৭৬।

শতরঞ্জ কে খিলাড়ি (১৯৭৭): শ্রেষ্ঠ হিন্দি ছবি, ভারত, ১৯৭৭।

জয় বাবা ফেলুনাথ (১৯৭৮): শ্রেষ্ঠ শিশু চলচ্চিত্র, ভারত, ১৯৭৮। গোল্ডেন হুগো, শিকাগো, ১৯৭৯। বিশেষ পুরস্কার, সাইপ্রাস ফিল্মোৎসব, ১৯৮০।

হীরক রাজার দেশে (১৯৮০): রাষ্ট্রপতির পুরস্কার, শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক, ভারত, ১৯৮০। এছাড়া ছবিটি অন্য একটি দেশের পুরস্কার পায়।

গণশত্রু (১৯৮৯): শ্রেষ্ঠ বাংলা ছবি, ভারত, ১৯৮৯।

রবীন্দ্রনাথ (১৯৬১): রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক, ভারত, ১৯৬১। শ্রেষ্ঠ তথ্যচিত্র হিসেবে গোল্ডেন শীল, লোকার্নো, ১৯৬১।

দ্য ইনার আই (১৯৭২): রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক, ভারত, ১৯৭২।

সত্যজিৎ রায়: ব্যক্তিগত পুরস্কার ও সম্মাননা

রঞ্জি স্টেডিয়ামে নাগরিক সংবর্ধনা, ১৯৫৭। পদ্মশ্রী, ভারত, ১৯৫৮। সংগীত অ্যাকাডেমি পুরস্কার, ১৯৫৯। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আমেরিকার শ্রদ্ধা প্রদর্শন, ১৯৬০। বার্লিন ফিল্মোৎসবের বিচারকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান, ১৯৬১। টাইমস পত্রিকার মতে বিশ্বের সেরা ১১ জন পরিচালকের অন্যতম, ১৯৬৩। পদ্মভূষণ, ১৯৬৫। স্পেশাল অ্যাওয়ার্ড অফ অনার, বার্লিন ফিল্মোৎসব, ১৯৬৬। ম্যাগাসাইসাই পুরস্কার, ম্যানিলা, ১৯৬৭। স্টার অফ যুগোস্লাভিয়া, ১৯৭১। আনন্দ সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৭৩। ডি. লিট, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৩। ডি. লিট, রয়াল কলেজ অফ আর্টস, লন্ডন, ১৯৭৪। পদ্মবিভুষণ, ভারত, ১৯৭৬। ডি. লিট, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৮। বিশেষ পুরস্কার, বার্লিন ফিল্মোৎসব, ১৯৭৮। বিশেষ পুরস্কার, মস্কো ফিল্মোৎসব, ১৯৭৯। ডি. লিট, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮০। শিশির কুমার (শিশু সাহিত্য) পুরস্কার, ১৯৮১। হোমেজ অফ সত্যজিৎ রে, কান ফিল্মোৎসব, ১৯৮২। স্পেশাল গোল্ডেন লায়ন অফ সেন্ট মার্ক, ভেনিস ফিল্মোৎসব, ১৯৮২। বিদ্যাসাগর পুরস্কার (শিশু সাহিত্য), ১৯৮২। ফেলোশিপ অফ ব্রিটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট, ১৯৮৩। দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার, ভারত, ১৯৮৫। ডি. লিট, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৫। সোভিয়েত ল্যান্ড নেহরু পুরস্কার, ১৯৮৬। সংগীত নাটক অ্যাকাডেমির ফেলোশিপ, ১৯৮৬। কলকাতা পৌরসভা কর্তৃক নাগরিক সংবর্ধনা, ১৯৮৬। ওজিয়ঁ দ'নর ফ্রান্স, ১৯৮৭। দাদাভাই নওরজি মেমোরিয়াল পুরস্কার, ১৯৮৭। 'টিনটোরেটোর যীশু' গ্রন্থটির জন্য শিশু সাহিত্য পুরস্কার, ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ ট্রেনিং, ভারত, ১৯৮৭। সেরা বিদেশি ছোটো গল্পের জন্য পুরস্কার, এফএনএসিএস, ফ্রান্স, ১৯৮৯। শ্রীমন্ত শঙ্করদেব পুরস্কার, অসম সরকার, ১৯৮৯। শিরোমণি পুরস্কার, এশিয়ান পেইন্টস, ১৯৯০। ৭০তম জন্মবার্ষিকীতে নিউইয়র্কের মিউজিয়াম অফ মডার্ন আর্ট-এর চলচ্চিত্র বিভাগ একটি ফলক উপহার দেয়, ১৯৯১। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে বিখ্যাত পরিচালক হিসেবে ৩০শে মার্চ অর্জন করেন বিশেষ অস্কার পুরস্কার, ১৯৯২।

লেখক: সাংবাদিক ও চলচ্চিত্র নির্মাতা

পাট থেকে পলিথিন ব্যাগ

প্লাস্টিকের কোনো উপকরণ ছাড়াই দেশে তৈরি হচ্ছে পরিবেশবান্ধব পলিথিন ব্যাগ। দেখতে বাজারে প্রচলিত ক্ষতিকর পলি ব্যাগের মতো হলেও এর বড়ো গুণ এটি পচনশীল এবং পরিবেশের জন্যও ক্ষতিকর নয়। বাংলাদেশের সোনালি আঁশ খ্যাত পাট থেকে এ পরিবেশবান্ধব পলিথিন ব্যাগ উদ্ভাবন করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ড. মোবারক আহমদ খান। তিনি পরমাণু শক্তি কমিশনের সাবেক মহাপরিচালক ও বাংলাদেশ জুট মিল করপোরেশনের বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা। তিনি এ পলিথিন ব্যাগের নাম দিয়েছেন 'সোনালি ব্যাগ'।

কীভাবে তৈরি হয় এ সোনালি ব্যাগ: পাটকলে ফেলে দেওয়া পাটের আঁশ থেকে প্রথমে সূক্ষ্ম সেলুলোজ আহরণ (এক্সট্রাকশন) করে আলাদা করে নেওয়া হয়। পানিতে অদ্রবণীয় এই সেলুলোজকে পরে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে পরিবর্তন (মডিফিকেশন) করা হয়। দ্রবণীয় সেলুলোজের সঙ্গে ক্রসলিঙ্কার মেশানো হয়। বিশেষ তাপমাত্রায় রাসায়নিক বিক্রিয়ায় দ্রবণটি ড্রায়ার মেশিনের ভেতরে পরিচালিত হয়। তাতে এটি শুকিয়ে প্লাস্টিকের শিটের আকারে মেশিন থেকে বেরিয়ে আসে। পরে শিট কেটে চাহিদা মতো পলি ব্যাগের আকার দেওয়া হয়।

পরিবেশ আন্দোলনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, শুধু ঢাকা শহরেই প্রতিদিন ১ কোটি ৪০ লাখ পলিথিন ব্যাগ ব্যবহৃত হয়। এ শহরের জলাবদ্ধতার জন্য ৮০ শতাংশ দায়ী এই পলিথিন ব্যাগ। এমতাবস্থায়, সোনালি ব্যাগ সবচেয়ে উপযুক্ত বিকল্প হতে পারে। প্রচলিত পলিথিনের তৈরি ব্যাগের চেয়ে অধিক কার্যকর এ পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার করার পর ফেলে দিলে সহজেই মাটির সঙ্গে মিশে যায়। উপরন্তু, তা মাটিতে সারের কাজ করে। পাটের তৈরি এ ব্যাগ সাধারণ পলি ব্যাগের চেয়ে দেড়গুণ টেকসই ও মজবুত। পানি নিরোধক এ পলি ব্যাগের দামও খুব একটা বেশি নয়। প্রতি ব্যাগের দাম ৩ থেকে ৪ টাকা। অধিক পরিমাণে উৎপাদিত হলে প্রতি ব্যাগের দাম ৫০ পয়সায় নামিয়ে আনা সম্ভব হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

সহজলভ্য উপাদান এবং সাধারণ প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি এ পলিথিন ব্যাগ বিদেশে রফতানির ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। ইতোমধ্যে অস্ট্রেলিয়া, জাপান, আরব আমিরাতসহ কয়েকটি দেশ সোনালি ব্যাগ আমদানির আগ্রহ প্রকাশ করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে সোনালি ব্যাগ বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনের লক্ষ্যে যুক্তরাজ্যের ফুটামুরা কেমিক্যালের সঙ্গে একটি সমঝোতা চুক্তি (এমওইউ) করেছে বাংলাদেশ সরকার। কাঁচা পাট ও বহুমুখী পাটজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা, পাটজাত পণ্য রফতানি, অভ্যন্তরীণ ব্যবহার বাড়ানো ও পরিবেশ রক্ষায় পলিথিন বর্জনের ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার। এরই অংশ হিসেবে পলিথিনের মতো পাটের তৈরি সোনালি ব্যাগ বাজারে আনা হচ্ছে। এমওইউ অনুযায়ী ফুটামুরা কেমিক্যাল কোম্পানি সোনালি ব্যাগ উৎপাদনে সব ধরনের কারিগরি সহায়তা দেবে। তবে পাঠ থেকে সেলুলোজ উৎপাদনের মাধ্যমে সোনালি ব্যাগ প্রস্তুত ও বাজারজাতের কাজটি করবে বিজেএমসি।

সরকারিভাবে এ ব্যাগ উৎপাদন হলেও বাণিজ্যিকভাবে এর উৎপাদনের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। পাট কলগুলোতেই এর উৎপাদন হতে পারে। তাছাড়া যে কেউ ক্ষুদ্র পরিসরে এর কারখানা স্থাপন করতে পারে।

প্রতিবেদন: জে আর লিপি

ঘুরে এলাম ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত

রফিকুর রশীদ

অবশেষে আমরা এলাম পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম প্রধান সৌন্দর্যের লীলাভূমি ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত দেখতে। 'অবশেষে' বলছি ইচ্ছা করেই। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নিসর্গপ্রিয় সৌন্দর্যপিপাসু পর্যটকেরা আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলীয় দেশ জাম্বিয়ায় আসে প্রধানত এই ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের অতুলনীয় সৌন্দর্যসুধা উপভোগ করতে। জাম্বিয়া এবং জিম্বাবুয়ে–এই দু'দেশের মাঝখানে জাম্বেজি নদী এসে শত সহস্র পাথরের বাধা ডিঙিয়ে বিপুল শক্তি ও গর্জনের সঙ্গে গিরি খাতে আছড়ে পড়ে সৃষ্টি করেছে জলপ্রপাত। নায়েগ্রাসহ পৃথিবীর অন্যান্য জলপ্রপাত থেকে এই ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত নানাবিধ কারণে ভিন্ন মাপের মর্যাদা দাবি করে বলেই তা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের স্বীকৃতিও লাভ করে। এমন পর্যটকও আছে যারা

ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত

শুধু এই ভিক্টোরিয়ার টানেই লিভিংস্টোনে আসে, আবার এখান থেকেই ফিরে যায় দেশে। ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের নৈসর্গিক সৌন্দর্য পার্শ্ববর্তী দেশ জিম্বাবুয়ে থেকেও উপভোগ করা যায়। কিন্তু নানাবিধ কারণে সাম্প্রতিক সময়ে পর্যটকেরা জিম্বাবুয়ের দিক থেকে মুখ ফিরিয়েছে। এখন পর্যটকদের চাপ বেড়েছে জাম্বিয়ায়। কেউবা রাজধানী শহর লুসাকায় এসে তারপরে যান লিভিংস্টোনে, কেউবা সোজাসুজি আকাশপথেই হাজির হন লিভিংস্টোন বিমানবন্দরে। আমরা তিন মাস ধরে জাম্বিয়া নামের এই দেশটির বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য জায়গা ঘুরে লিভিংস্টোনে কেন 'অবশেষে' এলাম, তার একটা ব্যাখ্যা তো আছেই। জাম্বিয়ার সবচেয়ে বড়ো প্রতিনিধিত্বশীল দর্শনীয় স্থানে সবশেষে আসবার কারণ হচ্ছে জলপ্রপাতে জলপ্রবাহের স্বল্পতা। সাধারণত এপ্রিল থেকে আগস্ট-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জাম্বেজি নদীতে থাকে বিপুল জলরাশি, ফলে ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের সৌন্দর্যও পরিপূর্ণ বিকশিত রূপ লাভ করে ওই সময়ে। কোনো কোনো বছরে মার্চেও পাওয়া যায় সেই অনিন্দ্য সৌন্দর্যের নাগাল। কিন্তু আমরা তো মার্চ পর্যন্ত থাকছি না এদেশে। ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই গুটাতে হবে সবকিছু। তাই ইচ্ছে করেই সবশেষে রেখেছিলাম এই ভিক্টোরিয়া দর্শন।

লুসাকা শহর থেকে প্রায় সাড়ে ছয়শ কিমি. দূরে ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত। নিকটস্থ শহরের নাম লিভিংস্টোন। মানুষের নামে হয়েছে স্থানের নাম। ডেভিড লিভিংস্টোন স্কটিশ ডাক্তার। ছিলেন পরিব্রাজক এবং ধর্মপ্রচারক মিশনারি। মূলত খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যেই তিনি আফ্রিকার পাহাড়-পর্বত-অরণ্যজুড়ে পদচারণা করেন। নির্ভীকচিত্তে পাড়ি দেন দুর্গম পথ। ১৮৫১ সালে তিনি এই জলপ্রপাত সম্পর্কে প্রাথমিকভাবে জানতে পারেন। সে জানা ছিল অসম্ভব অস্পষ্টতা এবং রহস্যময়তায় ভরা। আফ্রিকার মানুষ অপশক্তিতে বিশ্বাসী। জলপ্রপাতের প্রবল শব্দকে তারা মনে করত অপদেবতার গর্জন। ধূম্ররাশিকেও মনে করত দৈত্যদানোর কারসাজি। কাজেই সেই দৈত্যদানোর দিকে যাওয়া মানেই নিজের অমঙ্গল ডেকে আনা। এই তাদের বদ্ধমূল বিশ্বাস। পরিব্রাজক লিভিংস্টোন এতসব কেচ্ছা-কাহিনি শোনার পরও এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সামনে পাহাড়ি এলাকা ভয়াবহ জঙ্গলাকীর্ণ। এই অঞ্চলে শতাব্দীব্যাপী ছিল কোলোলো উপজাতির বাস। আকাশে ধোঁয়ার রহস্য সম্পর্কে তারা কিছুই জানত না, তাদের ভাষায় এটাকে বলত, 'মসিও টুনিয়া'। সেই থেকে জঙ্গলাকীর্ণ বিশাল বিস্তৃত এলাকারই ঐ নামকরণ হয়ে যায়। আর বর্তমানে তো বলা হচ্ছে মসিও টুনিয়া ন্যাশনাল (সাফারি) পার্ক। এদেশে অনেকগুলো ন্যাশনাল পার্ক আছে। তারমধ্যে এটিও অন্যতম। এখানে এখনো নানান জাতের বন্যপ্রাণীর বাস আছে। এই মসিও টুনিয়া ন্যাশনাল পার্কের মধ্যেই আছে ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত।

১৮৫৫ সালে ডেভিড লিভিংস্টোন জলপ্রপাতের বেশ কাছাকাছি কালাই নামের আইল্যান্ডে আসেন। নানা জনের মুখে নানান কেচ্ছা শোনেন। নিজে প্রবল গর্জন শোনেন। আকাশে ধোঁয়া উড়তেও দেখেন। অতঃপর ১৬ই নভেম্বর সেই ধূম্ররাশির উৎস অভিমুখে যাত্রা করেন এবং সত্যি সত্যি অনুদ্ঘাটিত এক অপরূপ সৌন্দর্য আবিষ্কার করেন। তিনি দেখতে পান পাহাড় থেকে নেমে আসা জাম্বেজি নদী পাথুরে পথ অতিক্রমের সময় যে প্রধান স্রোতের এবং শব্দের সৃষ্টি হয় তাই আবার ১১০ মিটার গিরিখাতে আছড়ে পড়ে। সেই স্রোতরাশি পতনের সময় বিকট গর্জনের মতো ভয়াবহ শব্দ সৃষ্টি করে। তা বহুদূর থেকেও শোনা যায়। কত দূর থেকে? তা দু'তিন কিমি তো বটেই, কেউ কেউ বলে রাতের বেলা আরো অনেক দূর থেকেও শোনা যায় এই গর্জনের ভয়ঙ্কর শব্দ। তা হবে না কেন? গিরিখাতে পতনের ঠিক পূর্বে জাম্বেজি নদী বুক চিতিয়ে প্রশস্ত হয় ১৬৮৮ মিটার। সেটা যদি ১১০ মিটার উঁচু থেকে একযোগে পড়তেই থাকে বাঁধভাঙা স্রোত হয়ে, তাহলে সেই শব্দ কেমন হতে পারে তা অনুমান করাও দুঃসাধ্য। শুধু শব্দ নয়, এই জলপ্রপাতের আরেক চমক হলো আকাশমুখী ধূম্ররাশি। ঠিক ধোঁয়া নয়। উঁচু থেকে জলরাশির পতনের ফলে একেবারে নিচ থেকে বাষ্প হয়ে তা আবার উপরে উঠতে থাকে, তাকেই মনে হয় ধোঁয়া। অনেক দূর থেকে আকাশের গায়ে এই ধোঁয়া উড়তেও দেখা যায়। এই ধোঁয়া বা বাষ্প যখন ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হয়ে নেমে আসে, তখন পর্যটকদের কাকভেজা না হয়ে কোনো উপায় থাকে না। ঐ বৃষ্টিরেণুর সঙ্গে প্রায়শ রংধনুরও দেখা মেলে। আহা, সে কী অপরূপ সৌন্দর্য!

ডেভিড লিভিংস্টোন এই জলপ্রপাত আবিষ্কারের পর বিস্ময়কর এই আবিষ্কারটি উৎসর্গ করেন ব্রিটেনের মহারানি ভিক্টোরিয়ার উদ্দেশ্যে এবং তাঁরই নামে জলপ্রপাতটির নামকরণ করেন ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত। এই নামকরণ এবং আবিষ্কারেরও বহু বছর পূর্বে ১৭১৫ সালে ফরাসি ভূতাত্ত্বিক নিকোলাস ডি ফার কর্তৃক অঙ্কিত মানচিত্রে ডট চিহ্নিত অবস্থায় এই জলপ্রপাতটির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়।

অনুমান করা হয় ১৪০ বছর পর লিভিংস্টোন সেই মানচিত্র ধরেই দুর্গম পথে অগ্রসর হয়ে আবিষ্কার করেন এই ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত। অসংখ্য পাহাড়বেষ্টিত এই দেশে আরো অনেক পাহাড়ি নদী চলার পথে বাধাগ্রস্ত হয়ে ছোটোখাটো গিরিখাতে পতিত হয়েছে এবং জলপ্রপাত সৃষ্টি করেছে। যেমন–চিপেম্বে ফল্স, চিপোমা ফল্স, চিসিম্বা ফল্স, নিয়াম্বয়েজি ফল্স প্রভৃতি। প্রতিটি জলপ্রপাতই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপরূপ নিদর্শন। কিন্তু প্রশস্ততা, গভীরতা এমনকি প্রতি সেকেন্ডে জলপ্রবাহের পরিমাণ– সকল বিবেচনাতেই ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত শ্রেষ্ঠ। এটি নায়াগ্রা জলপ্রপাত থেকে দ্বিগুণ প্রশস্ত ও গভীর।

ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের বিভিন্ন রকমের পরিমাপের একককে ফুটে পরিণত করলে বলা যায়–জাম্বেজি নদীর সবচেয়ে প্রশস্ত অংশ প্রায় ৫৫০০ ফুট চওড়া। নদীর জল যেখানে পড়ে তার গভীরতা প্রায় ৩৫৫ ফুট। এখানে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৩৩০০০ ঘনফুট জল ভেঙে পড়ে যে গিরিখাতের ভেতরে, সেই গিরিখাতের দুদিকের পাথুরে দেয়ালের মাঝখানের চওড়া বিভিন্ন জায়গায় ৮০ ফুট থেকে ২৮০ ফুট পর্যন্ত। এই গিরিখাতের উপর দিয়ে নির্মিত লোহার ব্রিজ ধরেই রেল, অন্যান্য যানবাহন ও মানুষজন জিম্বাবুয়ে এবং জাম্বিয়ার মধ্যে নিয়মিত যাতায়াত করে। আমাদেরও সুযোগ হয়েছিল সীমানা পেরিয়ে জিম্বাবুয়ের ইমিগ্রেশন পর্যন্ত যাবার। আবার আমাদেরই মতো অনেককে দেখেছি জিম্বাবুয়ে থেকে জাম্বিয়ার সীমানায় এসে ব্রিজের উপরে দাঁড়িয়ে গিরিখাতের সৌন্দর্য উপভোগ করতে।

সাউদার্ন প্রভিন্সের রাজধানী এবং জেলা শহর লিভিংস্টোন থেকে সামান্য কিছু দূরেই ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত। পরম আশ্চর্য এই জলপ্রপাতের আবিষ্কারক ডেভিড লিভিংস্টোনের নামেই পরবর্তীকালে গড়ে ওঠে পরিচ্ছন্ন এই পাহাড়ি শহর। একদা এই শহরই ছিল গোটা দেশের রাজধানী। সেই সে আমল থেকে এখন পর্যন্ত বহু জাতি ও ধর্মের মানুষের বাস এখানে। 'জাম্বিয়া নয়, দেশের নাম ছিল তখন উত্তর রোডেশিয়া। পরবর্তীতে নানাবিধ কারণে দেশের রাজধানী স্থানান্তরিত হয়েছে লুসাকায়।

কিন্তু সত্যিকারের কথায় দেশের পর্যটন-নগরী হিসেবে লিভিংস্টোনের গুরুত্ব অনেক বেশি। বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণ করার জন্য অত্যাধুনিক ফাইভ-স্টার বা ফোর-স্টার হোটেলের সুযোগ-সুবিধা সংবলিত অসংখ্য হোটেল-রেস্টুরেন্ট-লজ গড়ে উঠেছে। বহুতল বিশিষ্ট ভবন এখানে নেই। বড়জোর দ্বিতল বিশিষ্ট ঘরের মাথায় এদেশের ঐতিহ্যবাহী খড়ের চাল, কিন্তু ভেতরে ফ্রিজ-টিভি-এসি সবই আছে সাজানো। প্রশস্ত সুইমিং পুল, ডাইনিং হল, ব্যাডমিন্টন-কোর্ট, ফুলের বাগান-কী নেই! শহরজুড়ে এন্তার আয়োজন। আবার শহরের গা ঘেঁষেই আছে মসিও টুনিয়া ন্যাশনাল পার্ক। সেই পার্কের জঙ্গলে অবাধে ঘুরে বেড়ায় হাতির পাল, চিতাবাঘ, সিংহ, জিরাফ, জেব্রা, হরিণ, বানর প্রভৃতি বন্য জীবজন্তু। সেই আরণ্যক পরিবেশেও আছে বুশ-হাউজ, লজ প্রভৃতি। দেশের রাজধানীর মর্যাদা হারালেও লিভিংস্টোন শহর এখনো আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও পরিচিতি নিয়ে আপন মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

নয়টি প্রদেশে বিভক্ত বিশাল এই দেশটি পুরোপুরি দেখা হয়নি সত্যি, তবু এই লুসাকাকে যেমন আমার পার্বত্য শহর মনে হয় তেমনি লুসাকার বাইরে পা বাড়ালে পুরো দেশটাকেই মনে হয় পার্বত্য দেশ। আবার এখানে সেখানে একাধিক ন্যাশনাল সাফারি পার্ক দেখার পর এখন রাস্তার পাশে বনজঙ্গল দেখলেই মনে হয় গোটা দেশটাই বুঝি বিশাল এক সাফারি পার্ক, আমরা সেই সাফারি পার্কের মধ্যেই ঘোরাফেরা করছি। এদিন আমরা লুসাকা থেকে রওনা হয়েছি সকাল দশটায়। পাহাড়ি পথ, তবে যেমন মসৃণ তেমনি প্রশস্ত। সত্যিই মেয়েদের মাথার সিঁথির মতোই সোজা-সরল। এক-দুই কিলোমিটার কেবল উঁচুতেই উঠছি, কান শোঁ শোঁ করছে, বুক ভারি হয়ে আসছে, তাকিয়ে দেখি প্রশস্ত পথ সরু হয়ে মিলিয়ে গেছে দিগন্তে, আকাশের গায়ে। উঁচুতে ওঠা শেষ হলে আকাশ আবার দূরে সরে যায়, শুরু হয় নামার পালা। দশ-পনের-বিশ কিলোমিটার পথের মধ্যে বাড়িঘর নেই, গ্রাম-শহর নেই, মানুষজন নেই, অথচ আমরা পাড়ি দিচ্ছি দীর্ঘ দীর্ঘ পথ। অনেক দূরে দূরে মিলছে দু'চার ঘর জনবসতির দেখা, আরো দূরে একটুখানি শহর মতো জায়গা, তারই নাম জেলা শহর চিলাঙ্গা, কাফুয়ে, মাজাবুকা, কালোমা, প্রেম্বা, জিম্বা, চোমা, লিভিংস্টোন। এভাবেই বহুপথ পাড়ি দিয়ে আমরা যখন লিভিংস্টোনে পৌঁছাই তখন বিকেল সাড়ে চারটে। পূর্ব-নির্দিষ্ট লজে আমাদের ব্যাগেজ-লাগেজ নামিয়ে রেখেই আমরা বেরিয়ে পড়ি ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের বেলাশেষের সৌন্দর্য উপভোগ করতে।

সূর্য পড়েছে ঢলে। মেঘমুক্ত আকাশ আলোয় ঝলমলে। প্রবেশমূল্য দিয়ে টিকেট কেটে আমরা প্রবেশ করি মসিও টুনিয়া ন্যাশনাল পার্কের ছায়াঘন পরিবেশে। কানে আসছে জলপ্রপাতের প্রবল গর্জন। কিন্তু সে ঘটনাস্থল কোথায় কত দূরে তখনো কিছুই জানি না। পাথর বিছানো পথ ধরে এগিয়ে চলেছি। উঁচু-নীচু পথ। হনুমান এসে আমাদের স্বাগত জানায়। জয় হনুমান বলে সামান্য একটু এগিয়ে যেতেই দেখি পথের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন মহামতি লিভিংস্টোন (১৮১৩-১৮৭৪)। হাতে বাইবেল। গায়ে ওভারকোট। মাথায় হ্যাট। না, জীবিত সেই মানুষটি নন। তাঁর প্রস্তর নির্মিত ভাস্কর্য। বিশাল আকৃতির পাথরখণ্ডের উপরে সুউচ্চ সেই ভাস্কর্য স্থাপন করায় লিভিংস্টোনের মুখের দিকে তাকাতে হলে পরিব্রাজককে আকাশের দিকে মাথা তুলতেই হবে।

ভাস্কর্যের খুব কাছে তীর চিহ্নিত দিকনির্দেশনা দেওয়া আছে–কোনদিকে গেলে কী দেখা যাবে। যেদিকে গেলে জলপ্রপাতের স্রোতরাশি দেখা যাবে আমরা সেইদিকে পা বাড়ালাম। খুব সহজেই পেয়ে গেলাম জলপ্রপাতের নাগাল। পাথুরে গিরিখাত। ১১০ মিটার গভীর। এক পারে দর্শকেরা হেঁটে চলেছে নিরাপত্তা বেষ্টনী গা ছুঁয়ে। অন্য পারে জলপ্রপাত। জাম্বেজি নদী ১৬৮৮ মিটার বুক চিতিয়ে অনিঃশেষ জলরাশি তীব্র বেগে ঐ গভীর খাদে নিক্ষেপ করে চলেছে ক্লান্তিহীন বিরামহীন। এটা নাকি উপযুক্ত সময় নয় জলপ্রপাত দর্শনের। ভরা মৌসুম মার্চ-এপ্রিল থেকে। জাম্বেজি তখন প্রশস্ত বুক ভরে জল নিয়ে আছড়ে ফেলে গিরিখাতে। আর এই জলের পতনের সে কী প্রবল শব্দ! মনে হয় যেন প্রাগৈতিহাসিক কোনো দৈত্য ফুঁসে উঠছে এবং প্রচণ্ড গর্জন করছে। সে গর্জনের শব্দে কান পাতা দায়। গিরিখাতে জলরাশির পতনের সময় শ্বেতশুভ্র স্রোতরাশি যে নির্মল সৌন্দর্য সৃষ্টি করে তার কোনো তুলনাই হয় না। বিমুগ্ধ বিস্ময়ে আমরা এগিয়ে চলেছি সম্মুখে, কিন্তু এ কী সারা শরীর যে ভিজে যাচ্ছে বৃষ্টিতে। আকাশে মেঘ নেই, বৃষ্টি এল কোত্থেকে! আরেক বিস্ময় তখন সামনে। ওই যে জাম্বেজির বুকভরা জলরাশি বিরামহীন আছড়ে পড়ছে ১১০ মিটার নিচে, পড়ামাত্রই সেখান থেকে বিপরীত দিকে অর্থাৎ উপরের দিকে অসংখ্য জলকণা উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে এবং নির্দিষ্ট একটা উচ্চতায় আসার পর তা বাষ্পীভূত হয়ে বৃষ্টিকণার আকারে ঝাপটা দিচ্ছে। সেই বৃষ্টির ঝাপটা থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য অনেকে রেইনকোট পরেও আসে। না, নিজের না থাকলেও অসুবিধা নেই, রেইনকোট এবং ছাতা ওখানে ভাড়াও পাওয়া যায়। যখন খুশি ব্যবহার করাও যায়। ভাড়াটে ফটোগ্রাফারেরও কোনো অভাব নেই। দুটো পয়সা উপার্জনের ধান্দায় তারা ঘুরছে পিছে পিছে। যাহোক গিরিখাতের গভীর থেকে উৎক্ষিপ্ত জলকণা যখন উপরে উঠে বাষ্পীভবন প্রক্রিয়া ঘটে, তখন বহুদূর থেকে তাকে ধোঁয়ার কুণ্ডলির মতো দেখা যায়। এদিকে বৃষ্টিকণার গায়ে রোদ পড়ে সৃষ্টি হয় রংধনুর সৌন্দর্য।

একদিকে জলপ্রপাতের সৌন্দর্য অন্যদিকে রংধনুর সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে আমরা গিরিখাতের পাশ দিয়ে হাঁটতে থাকি। প্রায় এক কিলোমিটার পর থমকে দাঁড়াতে হয়। নিরাপত্তা বেষ্টনী শেষ। গিরিখাতও ভাগ হয়ে গেছে। এরপর থেকে জিম্বাবুয়ের অংশ। ওই

দিকে পর্যটকের সংখ্যা কম, কিন্তু জলপ্রপাত ঠিকই আছে আরো বহুদূর। ওদের অংশের জলপ্রপাত যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে প্রদর্শনযোগ্য হিসেবে উপস্থাপন করতে পারেনি। আমরা জাম্বিয়া অংশ থেকে দেখতে পাই অল্প কয়েকজন জিম্বাবুয়ে অংশে জলপ্রপাত দেখছে। বেলা পড়ে আসছে বলে আমাদের তখন ফিরে আসতেই হয়। সিদ্ধান্ত হয় এরপর আমরা সকালবেলার জলপ্রপাতের সৌন্দর্য দেখতে আসব। আজ তবে এইটুকু থাক। ধীরে ধীরে নিভে আসে দিনের আলো। আমরাও ফিরে আসি আমাদের নির্ধারিত লজে।

সকালে উঠে আমাদের সিদ্ধান্ত একটু বদলে গেল। ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের প্রতি প্রাথমিক আবেগ-আগ্রহ-উচ্ছ্বাস খানিকটা হলেও পূরণ হয়েছে বলেই ভাবলাম আজ সারাদিন এই পুরনো শহরটাই ঘুরে দেখি। বিকেলে রাখা হলো রিভার ক্রুজে যাবার প্রোগ্রাম। এটিও সেই ভিক্টোরিয়া-দর্শনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। জলপ্রপাত দেখতে যারা আসে তাদের অনেকেই এখানেও বেড়িয়ে যায়। আমরাও বিকেলে যাব। সকালে লজ থেকে বেরিয়ে প্রথমেই আমরা গেলাম লিভিংস্টোন মিউজিয়াম দেখতে। লিভিংস্টোন শহরে অবস্থিত বলেই এ প্রতিষ্ঠানের এমন নামকরণ তা কিন্তু নয়, মূলত এ মিউজিয়ামও গড়ে তোলা হয়েছে সেই মহান মানুষটির নামেই। মিউজিয়ামের প্রবেশমুখেই দাঁড়িয়ে আছেন ডেভিড লিভিংস্টোন। জলপ্রপাতের কাছে তাঁর যে ভাস্কর্যটি আছে, এটি তার চেয়ে সামান্য একটু ভিন্ন মাপের। তবে দুটোতেই পায়ের জুতো থেকে মাথার ক্যাপ পর্যন্ত পূর্ণ অবয়ব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সুউচ্চ এই ভাস্কর্যটির পেছনে আছে জাম্বিয়ার জাতির জনক ড. কেনেথ কাউন্ডার আবক্ষ ভাস্কর্য। তাঁর এমন হাস্যোজ্জ্বল চেহারার ভাস্কর্য আর কোথাও দেখিনি। এরপরই সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে কাউন্টার থেকে টিকেট সংগ্রহ করে মিউজিয়ামে প্রবেশ। ঘুরে ঘুরে দেখলাম মিউজিয়াম। ফেলে আসা অতি দূর প্রস্তর যুগ লৌহ যুগেরও অনেক নিদর্শন থরে থরে সাজানো। আছে জাম্বিয়ার চিরায়ত গ্রামীণ ছবি, সেখান থেকে আধুনিক শহুরে জীবনে ক্রম উত্তরণের ছবি প্রদর্শিত হচ্ছে। আছে কৃষি উপকরণ এবং বিভিন্ন প্রকার হাতিয়ারের নমুনা। ডেভিড লিভিংস্টোনের বংশলতিকা এবং বিভিন্ন পর্যায়ের ছবি, এমনকি মৃত্যুশয্যার এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দৃশ্য পর্যন্ত ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মোট কথা লুসাকার মিউজিয়ামের চেয়ে এই মিউজিয়ামটিকে অনেকটা সমৃদ্ধ এবং সুবিন্যস্ত মনে হয়েছে।

মিউজিয়াম থেকে বেরোতেই বেলা বারোটা। তারপর শহরের মধ্যে আরো একটু ঘোরাঘুরি শেষে আমরা শহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি। অদূরেই মসিও টুনিয়া ন্যাশনাল পার্কের বিস্তীর্ণ জঙ্গল এবং সেই জঙ্গলের ভেতরে একাধিক বুশ-লজ। একাধিক হোটেল রেস্টুরেন্টও আছে। বাইরে থেকে দেখা যাবে খড়ে ছাওয়া সাধারণ ঘরবাড়ি। কিন্তু ভেতরে আধুনিক আহার ও আবাসনের সব ব্যবস্থা আছে। আমরা দুপুরের আহারের জন্য ঢুকলাম ক্রিসমার হোটেলে। এদের লজও আছে জঙ্গলের ভেতরে ছড়ানো। তার মধ্যে দু'একটা ঘুরেও দেখলাম। সুইমিং পুলের পাশেই ডাইনিং হল অ্যান্ড বার। চারদিক খোলা খড়ের সুপ্রশস্ত ঘর। চেয়ার-টেবিল সুবিন্যস্ত। সাদা চামড়ার বিদেশি মালিকের প্রতিষ্ঠান, কাজ করছে অতি সাধারণ কালো মানুষেরা। তাদের পরিবেশনায় আহার পর্ব শেষ করে আমরা চললাম রিভার ক্রুজের উদ্দেশে।

রিভার ক্রুজ হচ্ছে নৌযানে নদী-ভ্রমণ। জাম্বেজি নদী বিভিন্ন জায়গায় এসে বিভিন্ন চেহারা ধারণ করেছে। কোথাও খরস্রোতা, কোথাও সে গভীর প্রশান্ত। কোথাও প্রশস্ত, কোথাও বা সরু অপ্রশস্ত। জাম্বেজি যেখানে গভীর এবং প্রশস্ত হয়েছে, তেমনই এক প্রান্তে বসেছে রিভার ক্রুজের মেলা। বিভিন্ন কোম্পানি নদীর পাড়ে বসিয়েছে পানাহারের খোলা আসর, লাউড স্পিকারে ড্রামের বাজনার সঙ্গে উচ্চস্বরের মিউজিক চলছে, দেশি-বিদেশি, সাদা-কালো নারী-পুরুষের সে কী আনন্দ উচ্ছ্বাস! এরই মাঝে অনতিদূরে নোঙর করা নৌযান ভরে উঠছে যাত্রীতে। নদীতে ঘন্টা দুয়েক ঘুরিয়ে জিম্বাবুয়ের সীমান্ত দেখিয়ে নিয়ে আসবে তীরে। এই হচ্ছে রিভার ক্রুজ। ভিক্টোরিয়া জপ্রপাতের সঙ্গে সেই অর্থে গভীর কোনো সম্পর্ক নেই রিভারক্রুজের, তবু পর্যটকেরা বিপুল অর্থ ব্যয় করে আনন্দ ফুর্তি করার জন্য অনেকেই এই রিভারক্রুজে আসে। আমাদের দুর্ভাগ্য অথবা সৌভাগ্য যা-ই হোক, আমরা সেই ক্রুজ ধরতে পারিনি। আশপাশে খোঁজ নিয়ে জানা গেল– বিকেল সাড়ে চারটেয় সব কোম্পানিরই লাস্ট ট্রিপ ছেড়ে গেছে। ফলে আর নয়। শুনে আমি খুশি হই। বাংলাদেশের মানুষ পদ্মা-মেঘনা-যমুনা পাড়ি দেওয়া মানুষ, কী ক্ষতি জাম্বেজিতে এক বেলা না ভাসলে!

ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের প্রভাতী সৌন্দর্য উপভোগের জন্য আমরা তৃতীয় দিন সকালে উঠেই লজ ছেড়ে চলে আসি মসিও টুনিয়া ন্যাশনাল পার্কের গেটে। পার্ক করা গাড়ির মাথার উপর থেকে বিশাল এক হুনুমান আমাদের অভ্যর্থনা জানায়। আমরা তার সঙ্গে মুচকি হাসি বিনিময়ের পর দ্রুত পায়ে চলে যাই জলপ্রপাতের সৌন্দর্যরাশির কাছে। লিভিংস্টোনের বিশালাকৃতির ভাস্কর্য পেছনে ফেলে গিরিখাতের এক প্রান্তে পৌঁছতেই অপর প্রান্তের ভেঙে পড়া শুভ্র ফেনিল জলরাশির অসামান্য সৌন্দর্যে আমাদের মনপ্রাণ জুড়িয়ে যায়। প্রকৃতি এখানে এমন অকৃপণভাবে এত সৌন্দর্যসুধা ঢেলে দিয়েছে নিজে উপভোগ না করলে তা অনুমান করাও দুঃসাধ্য। ভরা মৌসুম আসার আগেই এই দশা, জানি না জাম্বেজির পূর্ণ যৌবনে জলপ্রপাত আরো যে কত সুন্দর হয়ে ওঠে। এই ভয়ংকর গর্জন আর আকাশমুখী ধুম্রকুণ্ডলি। অন্যরকম বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে আমরা চলে আসি জাম্বেজির আপার স্ট্রিমে। প্রকাণ্ড সব পাথর ছড়িয়ে আছে নদীর বুকে। কবেকার কোন প্রস্তর যুগের এ পাথর, আমরা তার কিছুই জানি না। কেবল চেয়ে চেয়ে দেখি বড়ো বড়ো পাথরের পাশ দিয়ে, কখনো বা উপর দিয়ে সগর্জনে এগিয়ে চলেছে নদীর স্রোত, আছড়ে আছড়ে পড়ছে এবং গিরিখাতের কাছে গিয়ে কেশর-ফোলানো সিংহের মতো লাফিয়ে উঠছে এবং ঝাঁপ দিচ্ছে ১১০ মিটার নীচু খাদে। না সেখানে জমা হতে পারছে না জলরাশি, খাদের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দূরে গিয়ে আবারও জাম্বেজির শাখা পরিচয়ে প্রবাহিত হচ্ছে কোনো জনপদে। পাথরের মধ্যে এই স্রোতের খেলা-সত্যি এক অপার সৌন্দর্য। মূলত পাথরের এই প্রতিবন্ধকতার কারণেই ফুঁসে উঠেছে নদী, এ কারণেই এমন প্রবল আক্রোশে বিপুল জলরাশির এভাবে আছড়ে পড়া এবং কার্যত জলপ্রপাতের সৃষ্টি হওয়া।

আপার স্ট্রিমের আইল্যান্ড থেকে বেরিয়ে এবার আমরা যাই বাঞ্জি জাম্পিং দেখতে। গিরিখাতের উপরে লোহার ব্রিজ। নানান রকম যানবাহন মানুষজন অবিরাম যাতায়াত করছে। ব্রিজের একদিকে জাম্বিয়া, অন্যদিকে জিম্বাবুয়ে। আমরা পায়ে পায়ে চলে যাই জিম্বাবুয়ের ইমিগ্রেশন অফিস পর্যন্ত। দু'দশ মিনিট পর আবার ফিরে আসি। ব্রিজের মাঝামাঝি জায়গায় ততক্ষণে ভিড় জমে গেছে। একটি ফরসা ধবধবে ইউরোপীয় মেয়ে বাঞ্জি জাম্পিংয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ভিড় হয়েছে তাকে ঘিরেই।

কতই বা বয়স হবে মেয়েটির! সর্বোচ্চ বিশ-বাইশ। বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে চলে এসেছে এতদূর। এখন ব্রিজের উপরে থেকে লাফ দিয়ে পড়বে ১১০ মিটার গভীর খাদে। ভয়াবহ এই খেলার নাম বাঞ্জি জাম্পিং। এ খেলায় নাম লেখাতে হলে শুধু নির্দিষ্ট পরিমাণে এন্ট্রি ফি জমা দিতে হয় তাই নয়, শারীরিক সুস্থতার ডাক্তারি সনদ লাগবে। তারপরও ব্লাডপ্রেসার হার্টবিট মাপা হবে। এ ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ গেমের ভিডিও ছবি দেখেছেন মর্মে ঘোষণা দিতে হবে। এমনকি এই গেমে অংশগ্রহণের সময় কোনো প্রকার দুর্ঘটনা ঘটলে তাকে নিছক দুর্ঘটনা বলেই মেনে নেবেন এবং এ জন্যে কাউকে দায়ী করবেন না, লিখিতভাবে এই ঘোষণাও দিতে হবে। তারপর প্রস্তুতি। ব্রিজের মাঝখানে এক টুকরো রেলিং ঘেরা সম্প্রসারিত পাটাতন আছে। সেইখানে খেলোয়াড়কে নিয়ে গিয়ে তার কোমরে

এবং দুই পায়ে বাঁধা হবে বিশেষ কৌশলে। আমরা দেখলাম মেয়েটি অনুরোধ জানিয়ে তার প্রেমিককেও ডেকে নিল ওই বর্ধিত পাটাতনের মধ্যে। দু'জন পরস্পরকে আলিঙ্গন এবং চুম্বনের মধ্য দিয়ে বিদায় জানাতেই সামনের রেলিং খুলে আলাদা করে দেওয়া হলো। এবার শূন্যে লাফ দেবার পালা। নাহ্, শেষ মুহূর্তে মেয়েটির আরো একবার চুম্বনের বাসনা হলো। প্রেমিকের মুখ নামিয়ে এনে গভীরভাবে চুম্বন এঁকে দেয় সে। বাইরে দর্শকদের মধ্যে টানটান উত্তেজনা–শেষ পর্যন্ত লাফ দেবে তো! অভিজ্ঞজনেরা বলাবলি করে, ওসব বাঁধাছাঁদা হয়ে যাবার পরও ভয়ে পিছিয়ে আসতে দেখা গেছে দু'একজনকে। কিন্তু না, হাসিখুশি এই মেয়েটি দর্শকদের প্রত্যাশার সাথে মোটেই প্রতারণা করে না। শেষবেলায় তার মুখের হাসি হয়ত একটু ম্লান হয়। সকালের সোনা রোদ সে মলিনতা ঢেকে দেয়। তাকে দেখে তখন ফুলপরি মনে হয়। আমাদের চোখের সামনেই ফুলপরিটি সত্যি লাফ দিল শূন্যে। কী সাংঘাতিক দৃশ্য। মেয়েটি পড়ে যাচ্ছে। মেয়েটি উলটে যাচ্ছে। পায়ে দড়ি বাঁধা প্রজাপতি যেনবা। ১১০ মিটার নিচে মাথা উলটানো মেয়েটিকে দেখে আমাদের পায়ে শিরশিরানি অনুভূতি হয়, চোখ ভিজে আসে আবেগে। কিন্তু ততক্ষণে কপিকলের চাকায় দড়ি ঘুরিয়ে মেয়েটিকে উপরে তুলে আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আমরা ঘাড় নামিয়ে দেখতে পাই-প্রজাপতির মুখে হাসি ফুটেছে। প্রেমিকপ্রবর দু'হাত নেড়ে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

বাঞ্জি জাম্পিংয়ের পর আমরা দেখতে যাই গর্জ সুয়িং। গভীর গিরিখাতের উপরে লোহার মোটা তার টাঙ্গিয়ে আয়োজন করা হয়েছে আর এক গেমের। এই গেম যেখানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেটা ওই লোহার ব্রিজ থেকে বেশ খানিক দূরে, ভিন্ন এক পাহাড়ি উপত্যকায়। দুই প্রান্তে বাঁধা আছে মজবুত তার। সেই তার ধরে ঝুলে পড়তে হবে। নিচে বিশাল গিরিখাত। তারে ঝুল দিয়েই এপার-ওপার করার খেলা। তারই নাম গর্জ সুয়িং। এটাও গাঁটের পয়সা খরচ করে খেলতে হয়।

ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত দেখতে আসা দর্শকদের জন্য আরো একটি দ্রষ্টব্য জায়গা হচ্ছে বাটোকা হেলিপ্যাড। জলপ্রপাত থেকে সামান্য একটু দূরে, আইল্যান্ডের উপরে অবস্থিত এই হেলিপ্যাড। এখান থেকে হেলিকপ্টার ছাড়ে। মাত্র দু'জন রাজি হলেই হলো। ওই বিশেষ আকৃতির হেলিকপ্টারে পাইলটের পেছনে মাত্র দুজন যাত্রীরই বসার ব্যবস্থা আছে। অন্যান্য উড়োজাহাজের মতো অনেক উপর দিয়ে যাবে না, শুধু দুজন যাত্রীকে আকাশ পথে কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘুরিয়ে দেখাবে এই জলপ্রপাত এলাকাটি। মসিও টুনিয়া ন্যাশনাল পার্কের যে অংশটুকু জুড়ে ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম রয়েছে, তার সবই দেখা যাবে অল্প সময়ের মধ্যে আকাশ পথে উড়ে উড়ে।

পৃথিবীর সপ্তমাশ্চর্যের অন্যতম এই ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের সৌন্দর্যসুধায় প্রাণ-মন ভরে নিয়ে মসিও টুনিয়া ন্যাশনাল পার্কের গেট দিয়ে বেরিয়ে আসতেই দৃষ্টি আটকে যায় কারুপল্লিতে। বাঁশ, বেত, কাঠের তৈরি নানা রকমের পণ্য। সব কিছুতেই আফ্রিকান ঐতিহ্যের স্বাক্ষর। বাংলাদেশের কারু প্রদর্শনীতেও সচরাচর এ ধরনের পণ্য দেখা যায়। এশিয়া থেকে আফ্রিকা, নাকি আফ্রিকা থেকে এশিয়ায় এই গ্রামীণ সংস্কৃতি সঞ্চারিত হয়েছে, সে কথা আমার জানা নেই। তবে আমি সবচেয়ে মুগ্ধ হয়েছি গাছের শুকনো ডালে বা শেকড়ে খোদাই করে মানব আদল ফুটিয়ে তোলার অপূর্ব শিল্পকর্ম দেখে। সত্যিই এই কারুশিল্পের কোনো তুলনাই হয় না।

এরপর ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের উজ্জ্বল স্মৃতি বুকে নিয়ে আমরা লিভিংস্টোন ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি রাজধানী শহর লুসাকার উদ্দেশে।

লেখক: কবি, প্রাবন্ধিক ও অধ্যাপক, গাংনী কলেজ, মেহেরপুর

গিনেস বুকে বাংলাদেশের কিশোর কনক

পারভেজ ইমতিয়াজ

ইচ্ছা আর অনুশীলন থাকলে কী-না হয়। এ দুয়ে মিলে হয় এক অমিত শক্তি। অসম্ভবকে সম্ভব করার শক্তি। নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার গনিপুর গ্রামের কিশোর কনক কর্মকার এমনি অদম্য ইচ্ছা আর অনুশীলনে সফল হয়ে নাম লিখিয়েছে গিনেস বুকে। সে কপালে সারিবদ্ধ ৬০০ গ্লাস ও তার ওপর একটি ফুটবল রেখে এ রেকর্ড গড়ে। আর এ রেকর্ড গড়ার পেছনের ইতিহাসটা আরো চমৎকার। কিশোর কনক এ রেকর্ড গড়ার সম্পূর্ণ কাজটি করেছে নিজেই। বাবা প্রবাসে থাকায় মায়ের আদর-শাসনেই বেড়ে ওঠা তার। এক ভাই এক বোনের মধ্যে কনক বড়ো। মা-বাবার চাওয়া পড়াশোনা করে সে যেন নিজেকে যোগ্য করে গড়ে তোলে। দুরন্ত কনক পড়ালেখার পাশাপাশি খেলাধুলায় মগ্ন থাকত। এক সময় সে নিজের মধ্যে খুঁজে পায় এক অসাধারণ ব্যালেন্সিং দক্ষতা। এই দক্ষতার বিকাশ ঘটিয়ে সে নিজের পরিচয় গড়তে চাইল। সে ফুটবল নিয়ে অনুশীলন করতে শুরু করল। কিছুদিনের মধ্যেই সে মাথায়, কপালে ও মুখে নিয়ে সেই কলমের ডগায় অনেক সময় ফুটবল ধরে রাখা আয়ত্ত করল। কিন্তু তার এই প্রতিভাকে প্রথমদিকে পরিবারের কেউ গুরুত্ব দিল না। বরং লেখাপড়ায় ব্যাঘাত হচ্ছে বলে তাকে বকুনিও খেতে হতো। অদম্য কনক তাতে থেমে থাকেনি। চর্চার সাথে সাথে সে ইউটিউবে গিনেস বুক-এর চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে তা দেখতে শুরু করল। গিনেস বুকে ফুটবলে রেকর্ড গড়ার সুযোগ সে খুঁজে পেল না। তাই বলে সে থেমে থাকেনি। আর কোন বিষয়ে রেকর্ড করার সুযোগ আছে তা জানতে লেগে থাকল। ফেসবুকে নিজের দক্ষতা ও গিনেস বুকে রেকর্ড করার ইচ্ছার কথা জানিয়ে স্ট্যাটাস দিল কনক। অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী তখন বেশ কিছু তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করল। কনক পেয়ে গেল গিনেস বুক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের অ্যাড্রেস।

তখন ইতালির রোকো মারকিওর ৩২০ গ্লাসের একটি রেকর্ড ছিল গিনেস বুকে। নতুন রেকর্ড গড়তে এ রেকর্ড ভাঙতে হবে। এলক্ষ্য সামনে নিয়ে কনক নিয়মিত অনুশীলন শুরু করে। ২০১৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর কনক তার দক্ষতা ও আগ্রহের কথা জানিয়ে গিনেস বুক কর্তৃপক্ষের কাছে একটি ইমেইল করে। তারা জানায় তিন মাসের মধ্যে তারা সকল নিয়ম জানাবে। কিন্তু ততদিনে ৩২০ গ্লাসের রেকর্ড ভেঙে ৫০০ গ্লাসের নতুন রেকর্ড হয়েছে। তখন কনক ৫০০ ওপরে গ্লাসে নিয়ে প্র্যাকটিস শুরু করে। নভেম্বর মাসে গিনেস বুক কর্তৃপক্ষ ইমেইল নির্দেশিকা জানায়। তাদের বেঁধে দেওয়া নিয়ম অনুযায়ী কমপক্ষে ১০ সেকেন্ড এর শর্ত থাকলেও সে এক মিনিট ৬ সেকেন্ড কপালে সারিবদ্ধ ৬০০ গ্লাস ও তার ওপর একটি ফুটবল রেখে সাক্ষিসহ সেই ভিডিওটি ধারণ করে গিনেস কর্তৃপক্ষকে পাঠায়। এর প্রায় দুই মাস পর তারা কনকের এই রেকর্ডের কথা জানায়। ইংল্যান্ডের লন্ডন থেকে কুরিয়ারের মাধ্যমে সার্টিফিকেট আসে এ বছরের ৫ই জানুয়ারি। কনকের স্বপ্ন আরো বহুদূর বিস্তৃত।

লেখক: প্রাবন্ধিক

হরিণাকুণ্ডে যাদের ঘর নাই তাদের জন্য ঘর: প্রকল্পের সাফল্য

ম. জাভেদ ইকবাল

আয়েশা খাতুনের বয়স পঞ্চাশের উর্ধ্বে। বাস করেন ঝিনাইদহের মান্দারতলা গ্রামে। স্বামীর সাথে দুই সন্তান নিয়ে ছোটো ভিটায় তাঁর বসবাস। বহুকাল ধরে তিনি নিজের একটি ছোট্ট গোছালো বাড়ির স্বপ্ন দেখে আসছেন। কিন্তু নুন আনতে পান্তা ফুরানোর সংসারে স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। গত বছরের শেষের দিকে হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ইউএনও মোহামদ সাইফুল ইসলাম 'জমি আছে ঘর নাই' প্রকল্পের অধীনে আয়েশা খাতুনের ভিটায় একটি আধা পাকা ঘর নির্মাণ করে দেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এদেশের ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল, অসহায় মানুষদের দারিদ্র্য বিমোচন এবং নিরাপদ বাসস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আশ্রয়ণ প্রকল্প ২-এর অধীন 'জমি আছে, ঘর নাই' নামে একটি নতুন প্রকল্প শুরু করেছেন। গ্রামাঞ্চলে যে সকল মানুষের এক খণ্ড জমি আছে কিন্তু বাড়ি তৈরির সামর্থ্য নেই, তাদের ভিটায় অর্ধ পাকা বাড়ি তৈরি করে দেওয়াই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। প্রকল্পটি অত্যন্ত সময়োপযোগী ও মানবিক। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন এবং ২০৪১ সালের উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে এই প্রকল্পটি যুগান্তকারী একটি পদক্ষেপ। এ প্রকল্পের আওতায় ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে সারাদেশে এক লাখ গৃহহীন পরিবারকে ঘর তৈরি করে পুনর্বাসিত করা হয়েছে। একই অর্থবছরে ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলায় এ প্রকল্পের আওতায় ৬৩টি পরিবারের জন্য এক লক্ষ টাকা করে তেষট্টি লক্ষ টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। এই প্রকল্পের নকশা অনুযায়ী এক লক্ষ টাকার মধ্যে গৃহহীনদের টিনের বাড়ি করার উল্লেখ আছে। কিন্তু খুলনা বিভাগের কমিশনার লোকমান হোসেন মিয়া এবং ঝিনাইদহ জেলার জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথ উপজেলা নির্বাহী অফিসারদেরকে টিনের বাড়ির পরিবর্তে অর্ধপাকা বাড়ি করার পরামর্শ প্রদান করেন। তাঁরা বিষয়টি হিসেব করে দেখেন, সদিচ্ছা থাকলে এক লাখ টাকায় একটি অর্ধ পাকাবাড়ি তৈরি করা সম্ভব। তাঁদের পরামর্শক্রমে ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুণ্ডু উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করেন এবং পাইকারি দরে ঘর তৈরির সকল কাঁচামাল যেমন– ইট, সিমেন্ট, বালি, রড ইত্যাদি ক্রয় করেন। ইউএনও-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে এই প্রকল্পের আওতায় প্রথমে চারটি ঘর পরীক্ষামূলকভাবে তৈরি করা হয়। তিনি ঘর তৈরির সকল কাঁচামাল পাইকারি দরে ক্রয় করায় এবং নিজে সকল কার্যক্রম তদারকি করায় এক লক্ষ টাকার মধ্যে পূর্বের নকশা ঠিক রেখে অ্যাটাচ টয়লেটসহ একটি সুন্দর, টেকসই বাড়ি নির্মাণে সফল হন। পরবর্তীতে তিনি বরাদ্দকৃত বাকি ৫৯টি ঘর একই ডিজাইনে তৈরি করেন। এতে উপকারভোগীরা আরো খুশি হন।

উপকারভোগীদের ঘর করার সামর্থ্য ছিল না। সরকার তাদেরকে একটি করে অর্ধপাকা বাড়ি তৈরি করে দিচ্ছে। এই সকল অর্ধপাকা বাড়ি পেয়ে তাদের চোখ আনন্দে অশ্রুসিক্ত হতে দেখা গেছে এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন। এ প্রসঙ্গে হরিণাকুণ্ডের ইউএনও মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন, প্রকল্পটি অত্যন্ত সময়োপযোগী। এই প্রকল্পটি প্রধানমন্ত্রীর ভিশন ২০২১ ও ২০৪১ সালের উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণসহ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এক ধাপ এগিয়ে যাবে। শুধু টিনের ঘরের পরিবর্তে টয়লেটসহ আধা পাকা বাড়ি নির্মাণে হরিণাকুণ্ডু উপজেলার এই ভূমিকা রোল মডেল হিসেবে কাজ করবে।

হরিণাকুণ্ডে এই প্রকল্পটি সফলতা পাওয়ায় খুলনা বিভাগের অবশিষ্ট নয়টি জেলাতেও অনুরূপ আধা পাকাবাড়ি নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যদি এই মডেলে বাড়ি তৈরির সিদ্ধান্ত সারাদেশে বাস্তবায়িত হয়, তাহলে এই দেশের দরিদ্র মানুষেরা আধাপাকা বাড়ির মালিক হয়ে যাবে। তারা পাবে উন্নত, সুন্দর ও নিরাপদ বাসস্থান। সাথে শতভাগ স্যানিটেশনও বাস্তবায়িত হবে। এই ঘরগুলো টিনের ঘরের তুলনায় অনেক বেশি টেকসই ও স্থায়ী। উপকারভোগীরা দীর্ঘদিন এই ঘরগুলো ব্যবহার করতে পারবে এবং তাদের জীবনযাত্রার মানও বৃদ্ধি পাবে।

লেখক: উপপ্রধান তথ্য অফিসার, পিআইডি, খুলনা

ভাষা ও সংস্কৃতি

শহিদুল ইসলাম

প্রাণী জগতের মধ্যে শিম্পাঞ্জি, বানর, মৌমাছি, পাখি, তিমি, ডলফিন, কুকুরসহ গৃহপালিত স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে বিভিন্ন ভাষার আদান-প্রদান লক্ষ করা যায়। তবে পাখির ভাব আদান-প্রদান হয় বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি এবং সুর দ্বারা। পাখি বিশারদরা পাখির জীবন প্রণালীর উপর গবেষণা করে বিভিন্ন তথ্য প্রদান করেছেন। পাখির চোখ ছোটো-বড়ো দেখে বোঝা যায় সে ক্ষুধার্ত-ভীত নাকি কাউকে আক্রমণ করার কথা ভাবছে। পাখি যখন আনন্দে থাকে তখন সে শব্দ করে এবং জীব দিয়ে ঠোঁট চাটে। ঠোঁট দিয়ে যখন নিজের গায়ে এবং ডালে ঘষে তখন বুঝা যাবে যে কিছুক্ষণ আগে খাবার খেয়েছে। ক্ষুধা লাগলে অথবা রেগে গেলে তখন সে ঠোঁট দিয়ে গায়ের লোম এলোমেলো করতে থাকে। শরীর ভালো নেই বুঝাতে সে লেজটা ডানে-বামে নাড়তে থাকে। পাখির মতো প্রত্যেক প্রাণীর ভাষা আছে। প্রাণী জগতের ভিতর লেখ্য ও কথ্য ভাষা কেবল মানুষেরই আছে। John Stuart Mill মানুষের ভাষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন– 'Language is the light of the mind'. Robertson, Stuart, Frederic প্রমুখ মনীষীরা ভাষা সম্পর্কে বলেছেন– Language is the vocal and audible sign of human communication. ভাষা কতকগুলো ফোনেময় এর সম্মিলিত রূপ। ভাষা বিজ্ঞানীদের মতে ৪০ বা তদূর্ধ্ব ফোনেমস ৮০,০০০ বা তদূর্ধ্ব ফোনেমস এবং লক্ষ লক্ষ শব্দের রূপ। একটি শিশু পাঁচ বছর বয়সে (১০,০০০-১৫,০০০) শব্দ ব্যবহার করতে শেখে। পরবর্তীতে GVI এবং SVI অনুসারে ভাষাগত দক্ষতা উত্থান-পতন ঘটে। মস্তিষ্কের প্রতিরূপ বা ধারণার উপর ভিত্তি করে ব্যক্তির আচরণ পরিচালিত হয়। এসব প্রতিরূপ মূলত মস্তিষ্কের জৈব বৈদ্যুতিক (bio-electric) এবং বিদ্যুৎ চুম্বকীয় (Electromagnetic) প্রতিক্রিয়ায় মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। আর ভাষার ব্যবহার এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

ভাষা সম্পর্কে বলতে গিয়ে ভারতীয় সাহিত্যিক শিব নারায়ণ রায় বলেন- ভাষা মানুষের প্রজাতিক বৈশিষ্ট্য; বিবর্তনের ফলে তার দেহের বিশেষ গঠন (মস্তিষ্ক, কণ্ঠ, ওষ্ঠ, জিহ্বা) ইত্যাদি তাকে এই সামর্থ্যের অধিকারী করেছে। ভাষার সূত্রে গড়ে উঠেছে মানুষের সমষ্টিগত জীবন, বিভিন্ন ধ্বনি। অন্যান্য প্রাণী তাদের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন যতটুকু করতে পেয়েছে তার চেয়ে মানুষ কয়েক কোটি গুণ বেশি করতে সক্ষম হয়েছে। মনের ভাব প্রকাশের জন্য তারা প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করেছে যা তাকে নতুনভাবে চিনতে ও শিখতে সাহায্য করেছে। মানব সমাজের আদিম যুগের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে মানুষ যখন ভয়ভীতি এবং অসহায় অবস্থায় জীবনযাপন করত তখন তারা ইশারার সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করত। অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় জবান শক্তি থাকায় তারা কণ্ঠ দ্বারা প্রয়োজন মেটানোর পাশাপাশি মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হতো। কালক্রমে এই শব্দকে স্মৃতিতে ধরে রাখার জন্য তারা চিহ্ন বা বর্ণ আবিষ্কার করতে শেখে। এই বর্ণ বা চিহ্ন তারা প্রস্তর, বৃক্ষ, বৃক্ষের পাতা, মাটির ফলকে, চামড়া প্রভৃতির ওপর লিখে রাখার ব্যবস্থা করে। তাই তো আমরা প্রাচীন শিলালিপিতে হাজারো সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ধর্মীয় সংলাপ, নীতিবাক্য প্রভৃতি লক্ষ করি। মানষের বিচিত্রতা এবং ভৌগোলিক ব্যবধানের কারণে একই কর্মপ্রয়াস বিভিন্ন আকার ধারণ করে।

জীবন-জীবিকার অনুকূল পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে মানব সমাজ বিভিন্ন সভ্যতার জন্ম দিয়েছে। বিভিন্ন সভ্যতা কোনো জাতিকে চিনতে সাহায্যে করে। যেমন ফনিশীয়, আরবীয়, ভারতীয়, আমেরিকান, স্কেন্ডেনেভিয়ান প্রভৃতি। আমরা দৈশিক বিভক্ততার সাথে সাথে কালিক বিভক্ততার বিষয়টি অস্বীকার করতে পারি না। তাই মানুষকে আদিম মানুষ, পাথরের যুগের মানুষ, মধ্য যুগের মানুষ, আধুনিক মানুষ হিসেবে শনাক্ত করি। পরবর্তীতে ফ্যাশন ও উত্তরাধুনিকতা শব্দগুলো অধুনা উচ্চারিত হচ্ছে। তবে দৈশিক ও কালিক বিভক্ততার পাশাপাশি ভাষাগত বিষয়টি মানুষের পরিচিতির ক্ষেত্রে একই সময় এসে হাজির হয়েছে। তাই আমরা বিভিন্ন ভাষাভাষির মানুষের এবং সেই ভাষা অনুসারে পরিচিতি লক্ষ করি। কিন্তু একটি শিশু কোন সমাজে জন্মগ্রহণ করবে এবং কোন ভাষা দ্বারা প্রভাবিত হবে তা আমাদের মানবীয় জ্ঞানের অতীত। হিউম্যান জেমস প্রকল্প জেনেটিক সাইন্সে এক্ষেত্রে বিপ্লব এনেছে। মানুষের জীবন সম্পর্কে তারা বলেছে যে, তিনশত কোটি ডিএনএ বেইজ পেয়ারস-এর মাধ্যমে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কর্মকাণ্ড অর্থাৎ রোগ, শোক, সামাজিক গঠন, চিন্তা শক্তি এমনকি জন্ম-মৃত্যু পর্যন্ত সংকেত আকারে লিপিবদ্ধ থাকে। এ ধরনের তথ্য আবিষ্কার মানব জাতিকে হতবাক করে দেয়। এ সংকেত যদি কোনোকালে মানুষ যদি পরিবর্তন করতে সক্ষম হয় তাহলে তার ভাগ্যও সার্বিকভাবে পরিবর্তিত হবে। তবে মানুষের জন্ম যে সমাজেই হোক না কেন সে সমাজের ভাষা এবং সংস্কৃতি তাকে প্রভাবিত করে। সে প্রাথমিকভাবে ভূমিষ্ট হওয়ার পর সবচেয়ে কাছের মায়ের ভাষা শিখতে শুরু করে। ধীরে ধীরে সমাজের প্রভাব পড়ে। মা কথাটি যেমন মধুর তেমনি মায়ের ভাষাটিও মধুর। অন্তরের অন্তস্তল থেকে অকৃত্রিম অভিব্যক্তি প্রকাশের জন্য মায়ের ভাষার বিকল্প নেই। এই মায়ের ভাষার মূল্য এত বেশি যে, কোনো কোনো জাতির পরিচয়

এই ভাষা অনুসারে আমরা লক্ষ করি। গ্রিক, রুশ, ইংরেজ, চাইনিজ, থাই, মালয়, আরবি প্রভৃতি ভাষা অনুসারে যে জাতির পরিচয় আমরা লক্ষ করি। আর আমরা যে বাঙালি এবং আমাদের মায়ের ভাষা যে বাংলা তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে কোনো দেশের জাতীয়তার ভেতরে একাধিক আঞ্চলিক এবং উপজাতীয় ভাষা থাকে। তারা যে পরিমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করুক না কেন, তাদের অবশ্যই একটি মায়ের ভাষা থাকে। উপজাতীয়দের ভাষা সংরক্ষণ করার জন্য আন্দোলন করতে দেখা যায়। তা তাদের মায়ের ভাষার প্রতি ভালোবাসার উজ্জ্বল উদাহরণ। মায়ের ভাষার ভালোবাসার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছে বাংলাদেশের মানুষ। তাদের মায়ের ভাষার প্রতি অকল্যাণকর খড়্গ এসে পড়েছিল। এর বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদে ফেটে পড়ে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে বিশ্ববাসীর কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। পৃথিবীর হাজার হাজার ভাষা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এবং শেষ পর্যন্ত দুই/একটা ভাষা টিকে থাকবে বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হচ্ছে। কিন্তু যতই হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হোক না বিশ্ববাসী মায়ের ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে যাবে। এই ভাষার গুরুত্ব, তাৎপর্য ও উচ্চতা যথার্থ উপলব্ধি করেছিলেন ষোড়শ শতকের কবি সৈয়দ সুলতান। কবি বলেন–

যারে সে ভাষে প্রভু করিলো সৃজন
সেই তার মাতৃভাষা,
অমূল্য সে ধন।

কবি রামনিধি গুপ্ত স্বদেশী ভাষার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। তাইতো তিনি কবিতার ভাষায় বলেন–

নানান দেশের নানান ভাষা
বিনে স্বদেশী ভাষা, মিটে কি আশা
নানা জলাশয়ের নানা নীর
বিনে ধারার জল মিটে কি চাতকীর।

ভাষাতত্ত্ববিদ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মাতৃভাষার গুরুত্ব অনুধাবন করেছিলেন। তাই তো বলেছিলেন–

> মাতৃভাষা ব্যতীত আর কোন ভাষা কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া পরান আকুল করে? ... কাহার হৃদয় এত পাষাণ যে মাতৃভাষার অনুরাগ তাহাতে জাগে না? পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখ, মাতৃভাষার উন্নতি ব্যতীত কোনও জাতি কখনও কি বড় হইতে পারিয়াছে? আরব, পারস্য জয় করিয়া ছিল পারস্য আরবের ধর্মের নিকট মাথা নিচু করিয়াছিল কিন্তু আরবের ভাষা লয় নাই। শুধু লইয়া ছিল তাহার ধর্মভাব আর কতকগুলি শব্দ। তাই আনোয়ারী, ফেরদৌসী, সাদী, হাফিজ, নিযামী, জামী, সানাঈ, রুমী প্রমুখ কবি ও সাধক বুলবুল কুলের কলতানে আজ ইরানের কুঞ্জ কানন মুখরিত।

মাতৃভাষার সাথে সাহিত্য সংস্কৃতির একটা গভীর সম্পর্ক আছে সাহিত্য-সংস্কৃতি এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। বিশ্ব সাহিত্যের পরিচিত সাহিত্যগুলো অধিকাংশই তাদের নিজেদের ভাষায় রচিত। সুতরাং স্বদেশী সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা এবং জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করার জন্য মাতৃভাষার বিকল্প নেই। আমাদের মাতৃভাষা বাংলা ও বাংলা সাহিত্যে হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী এবং সমৃদ্ধ।

বহু ত্যাগ তিতিক্ষার মাধ্যমে বাংলা মায়ের ভাষা এবং রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পেয়েছে। সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু থাকুক এবং বাঙালি জাতি স্বসংস্কৃতির চর্চার মাধ্যমে এগিয়ে যাক বিশ্বের দরবারে– এই একান্ত প্রত্যাশা আমাদের।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও প্রভাষক, দর্শন বিভাগ, ইস্পাহানি কলেজ, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা
২৫টি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রকাশ

আফরোজা রুমা

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তদানীন্তন রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণের পর সারাদেশের পরিস্থিতি হয়ে উঠে উত্তেজনাপূর্ণ। এমন পরিস্থিতিতে ঢাকায় আসেন সে সময়ের পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এবং ১৬ই মার্চ থেকে শুরু হয় মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক। আলোচনার আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি না হয়েও ২৫শে মার্চ রাতে ঢাকায় শুরু হয় সামরিক অভিযান-বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ও রাজারবাগ পুলিশ লাইনে। এর মধ্যে ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে আটক হন শেখ মুজিবুর রহমান। কিন্তু আটকের আগেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন তিনি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার এ ঘোষণা ২৫টি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রকাশ হয়। বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত থেকে দেখা যায়, ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতের ঢাকার পরিস্থিতি ও শেখ মুজিবুর রহমানকে আটকের ঘটনা ২৭শে মার্চেই বিশ্বের অন্তত ২৫টি দেশের পত্রিকা বা সংবাদ সংস্থার খবরে প্রকাশিত হয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা: *ফ্যাক্টস অ্যান্ড উইটনেস* (আ.ফ.ম সাঈদ) বইতে স্বাধীনতা ঘোষণা সর্ম্পকে বিদেশি সংবাদপত্র ও সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টের একটি সংকলন প্রকাশ করা হয়েছে।

ওই সংকলন অনুযায়ী বিবিসি'র খবরে তখন বলা হয়, 'কলকাতা থেকে সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের খবরে প্রকাশ যে, পূর্ব পাকিস্তানের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান এক গুপ্ত বেতার থেকে জনসাধারণের কাছে প্রতিরোধের ডাক দিয়েছেন'।

ভয়েস অব আমেরিকা'র খবরে বলা হয়েছিল, 'ঢাকায় পাকিস্তান বাহিনী আক্রমণ শুরু করেছে। শেখ মুজিবুর রহমান একটি বার্তা পাঠিয়েছেন এবং সারা বিশ্বের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন'।

দিল্লির দ্য স্টেটম্যানে'র খবর ছিল: 'বাংলাদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে, সামরিক অভিযানের প্রতিবাদে শেখ মুজিবুর রহমানের পদক্ষেপ। একটি গোপন বেতার থেকে প্রচারিত ভাষণে শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের পূর্বাংশকে স্বাধীন বাংলাদেশ হিসেবে নতুন নামকরণ করেছেন'।

গার্ডিয়ানে'র ২৭শে মার্চ সংখ্যায় খবরে বলা হয়, '২৬শে মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জাতির উদ্দেশে রেডিও'তে ভাষণ দেওয়ার পরপরই *দ্য ভয়েস অব বাংলাদেশ* নামে একটি গোপন বেতারকেন্দ্র থেকে শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছে। তার এই ঘোষণা অপর এক ব্যক্তি পাঠ করেন'।

এর বাইরে ভারতের বহু সংবাদপত্র এবং আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, জাপান, হংকং, নরওয়ে, তুরস্ক, সিঙ্গাপুরসহ অনেক দেশের খবরে স্থান পায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার খবর।

১০ই এপ্রিল মুজিবনগর থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার ঘোষিত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে,'বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন এবং বাংলাদেশের মর্যাদা ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান'।

১৯৮২ সালে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় প্রকাশিত *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র* তৃতীয় খণ্ডে শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা উল্লেখ করা হয়। সেখানে বলা হয়, ২৫শে মার্চে মধ্য রাতের পর অর্থাৎ ২৬শে মার্চে প্রথম প্রহরে এ ঘোষণা দেন তিনি। যা তৎকালীন ইপিআর-এর ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। পরে চট্টগ্রামের স্থানীয় একটি বেতারকেন্দ্র থেকে ২৬শে ও ২৭শে মার্চ বেশ কয়েকজন শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা পাঠ করেন।

লেখক: প্রাবন্ধিক

সরকারের উদ্যোগে সবার জন্য শিক্ষা

আবু সালেহ মোহাম্মদ মুসা

খুব বেশি আগের কথা নয়। সাজেদা বানুর আনন্দ আর ধরে না, ছেলে মাকে চিঠি দিয়েছে। কী লিখেছে তা জানতে দু'মাইল কাদা পানি ঠেলে, পায়ে হেঁটে পাশের গ্রামের সাদেক মাস্টার সাহেবের কাছে যেতে হবে। উপায় কী, বাড়ির কাছাকাছি শিক্ষিত লোক নেই। লেখাপড়া কি সবার জন্য? গাঁও-গ্রামের মানুষের এ ধরনের ঘটনা অনেক সময়ই আমাদের নজরে এসেছে।

কখনো আবার ক্ষেতের তরকারি নিয়ে মা-বাবাকে দেখা গেছে মাস্টার সাহেবের কাছে যেতে। ছেলের কাছে চিঠি লিখতে হবে। মাস্টার সাহেব বলেন- এ কি করেছো, চিঠি লিখে দিতে আবার তরকারি কেন, চিঠি লিখে দিলাম গাছের দুটি ফলও দিলাম। গ্রামে শিক্ষিত লোক নেই, কী আর করা। আজ এসব যেন গল্প মনে হয়।

এমন কষ্টের, দুঃখের দিন শেষ। প্রত্যন্ত অঞ্চলে সেই গাঁও-গ্রামের চিত্র এখন ভিন্ন। শ্রমজীবী, কৃষিজীবী, কামার, কুমার সবার ঘরে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে পড়েছে। মা-বাবা উভয়ই এখন চিঠি লিখতে, পড়তে পারে। অফিস- আদালতে, ব্যাংকে নিত্যদিনের কাজের সমাধা করতে এখন কম-বেশি সবাই পারে।

বর্তমান শিক্ষাবর্ষে প্রাক-প্রাথমিক থেকে শুরু করে নবম শ্রেণি পর্যন্ত স্কুল, মাদ্রাসা ও ভোকেশনালে ৪ কোটি ২৬ লাখ ১৯ হাজার ৮৬৫ জন শিক্ষার্থীর মাঝে মোট ৩৫ কোটি ২১ লাখ ৯৭ হাজার ৮৮২টি নতুন বই বিতরণ করে সরকার। মন্ত্রণালয় সূত্রে আরো জানা যায়, প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ে ২ কোটি ৩৯ লাখ ৬৫ হাজার ১৫১ শিক্ষার্থীর মধ্যে নতুন বইয়ের পাশাপাশি অনুশীলন খাতাও বিতরণ করা হয়েছে। অটিস্টিক শিশুদের মূল ধারার শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ৩০০ জন শিক্ষক-অভিভাবককে মাস্টার ট্রেইনার হিসেবে তৈরি করা হয়েছে।

সরকার সকল ক্ষেত্রে বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষায় বৃত্তি, অনেক ক্ষেত্রে দুপুরে খাবার পরিবেশনের ব্যবস্থা, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দূরের ছাত্রীদের সাইকেল প্রদানসহ ভিন্ন ভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান করে চলেছে। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা যাতে স্কুলে সহজে যাওয়ার সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সরকার বদ্ধপরিকর। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ২০১৫ সালের সংসদে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, দেশে শিক্ষার হার ৭০ শতাংশ। আর বর্তমান সরকারের গৃহীত উদ্যোগসমূহ যদি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয় তাহলে ২০২১ সালে শিক্ষিতের হার উল্লেযোগ্যভাবে উন্নীত হবে এমনটি পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা।

শিক্ষা ক্ষেত্রে এ আশার আলো বাস্তবে রূপ নেওয়া এখন সময়ের অপেক্ষা মাত্র। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা তিন স্তরবিশিষ্ট- প্রাথমিক স্তর, মাধ্যমিক স্তর এবং উচ্চশিক্ষা বা বিশ্ববিদ্যালয় স্তর। সংবিধানের ১৭নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রতিটি শিশু মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বিনামূল্যে শিক্ষা সুবিধা পাওয়ার অধিকার রাখে।

ইতঃপূর্বে প্রকাশিত তথ্যে জানা যায়, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার উপযোগী ৯৭ দশমিক ৯৪ শতাংশ শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঝরে পড়ার হার কমে ২০ দশমিক ৪ শতাংশে নেমে এসেছে এবং শিক্ষাচক্র সমাপনের হার ৭৯ দশমিক ৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ২০১৮ সালের প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলে দুই পরীক্ষা মিলিয়ে পাসের হার ৯৭ দশমিক ৬০ শতাংশ। গত বছর প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি সমাপনী পরীক্ষায় পাস করেছিল ৯৫ দশমিক ১৮ শতাংশ শিক্ষার্থী। এবার পিইসি ও ইবতেদায়ি পরীক্ষায় মোট ২৯ লাখ ২৭ হাজার ৮০৮ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়। এদের মধ্যে পাস করেছে ২৮ লাখ ৫৭ হাজার ৪৬১ জন। ২০১৮ সালের অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) ও জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষায় গড় পাসের হার ৮৫ দশমিক ৮৩ শতাংশ।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীসহ অন্যান্য বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকার বর্তমানে লক্ষ লক্ষ মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানসহ আনুষঙ্গিক অনেক অনেক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে যাচ্ছে যা বিশেষভাবে গরিব মেধাবীদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে সহায়তা করছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তিমূলক ও উচ্চশিক্ষার জন্য সরকারের দেওয়া সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘এখন অভিভাবকেরা তাদের সন্তানদের যথাযথভাবে শিক্ষিত করে তোলার ব্যাপারে সচেতন। তবে আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে তাদের অনেকেই এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন না। এ জন্য তাদের পড়াশোনার জন্য সরকার সব ধরনের সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে’। প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, ‘দেশকে দরিদ্রমুক্ত করার প্রাথমিক হাতিয়ার হিসেবে সরকার শিক্ষার প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। সরকার প্রত্যেক নাগরিকের শিক্ষা-সুবিধা নিশ্চিত করতে চায়’।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো দশটি শিক্ষা বোর্ডে অধিভুক্ত। বোর্ডগুলো তিনটি পাবলিক পরীক্ষা পরিচালনা করে: জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষা, মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষা এবং উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষা। মেধারভিত্তিতে এসব স্তরেও শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৃত্তি দেওয়া হয়।

প্রায় ১৭ কোটি জনসংখ্যার এই দেশে উন্নয়নে প্রয়োজন সম্মিলিত সদিচ্ছার। তাই সময় এসেছে সরকারের দেওয়া শিক্ষার সুযোগ সবার গ্রহণ করে ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়ার। আমরা এ সুযোগ গ্রহণ করে নিজের উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের উন্নয়ন করব।

শিক্ষার উন্নয়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নানামুখী পদক্ষেপ এ সরকারের শুরু থেকে সুনাম কুড়িয়েছে এবং তা অব্যাহত থাকবে। তবে উন্নয়নের ধারাকে অটুট রেখে তা কীভাবে আরো বেগবান করা যায় তা আমাদের ভাবতে হবে। এ বিশাল জনসমষ্টিকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে প্রতিযোগিতার বিশ্বে টিকে থাকতে আমাদের যা যা করণীয় তার সুদূরপ্রসারী চিন্তাভাবনার আলোকে আমাদের গতিপথ এখনই নির্ধারিত হতে হবে।

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাকে সামনে রেখে ২০২১ সালের স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ার এখনই সময়। বর্তমান সময়ে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার যে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে তাকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে সঠিক দিকনির্দেশনার মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার এইতো সময়। এ জয়যাত্রা কোনোভাবেই যাতে ব্যাহত না হয় সেদিকে সকলের দৃষ্টি দিতে হবে।

বর্তমান সরকারের গড়া ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন আমাদের দৈনন্দিন কাজ-কর্ম, চলাচল, শিক্ষা, চিকিৎসা তথা স্বাস্থ্যসেবা, কৃষিকাজ, ব্যবসা, বিদেশ ভ্রমণ, দেশ-বিদেশে চাকরির সুযোগ সবই নিয়ে এসেছে হাতের মুঠোয়। দিনে দিনে এ সুযোগ আরো সহজলভ্য হচ্ছে। আমরা ঘরে বসেই আয়ের পথ দেখতে পাচ্ছি, দেশে বসেই বিদেশিদের কাজ ইন্টারনেটের মাধ্যমে সমাধা করতে পারছি, নতুন নতুন আয়ের পথ সৃষ্টি হচ্ছে। ভালো কাজের জন্য, ভালো দক্ষতার জন্য বিশ্বে আমাদের মানমর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ঐতিহ্যের ধারাকে সমুন্নত রেখে আমাদের আগামী প্রজন্মের পথকে আরো প্রসারিত করতে চাই সবার জন্য শিক্ষা।

আমাদের শিক্ষার মান উন্নত করার ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য চাই উপযুক্ত শিক্ষা যা আমাদের মানুষের মতো মানুষ হতে সহায়তা করবে। এছাড়াও ‘অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো’-এর তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশে অনেক অলাভজনক সংগঠন রয়েছে, যারা সামাজিক সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য অনানুষ্ঠানিক ও আধা-আনুষ্ঠানিক শিক্ষাদান কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। আমরা এসব শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করে নিজেদেরকে শিক্ষিত জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করব, ২০২১ সালের বাংলাদেশ হবে আমাদের সুখের ঠিকানা– এ আশার আলো জ্বালাতে আসুন সকলে এগিয়ে আসি, সবাইকে শিক্ষিত করতে যার যার অবস্থান থেকে বিশেষভাবে অবদান রাখি। তাহলে আমাদের উন্নয়নের পাশাপাশি দেশ এগিয়ে যাবে, উন্নত জাতি হিসেবে আমরা বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব।

লেখক: কলামিস্ট ও প্রাবন্ধিক

বাংলাদেশ ইমিগ্রেশান ডে

১৯৭৪ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেওয়া বাংলায় ভাষণের তারিখকে ‘Bangladesh Immigration Day’ হিসেবে ঘোষণা করেছে New York State Senate। এ ঘোষণার সনদ তথা ঘোষণাপত্র ৬ই মার্চ বিকালে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংগ্রহ ও প্রদর্শনের জন্য হস্তান্তর করা হয়। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সিনেপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত এ হস্তান্তর অনুষ্ঠানে ঘোষণাপত্রটি প্রদান করেন নিউইয়র্ক মুক্তধারা ফাউণ্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বজিত সাহা। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের পক্ষে ঘোষণাপত্রটি গ্রহণ করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ। হস্তান্তর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক মোঃ রিয়াজ আহম্মদের সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সচিব মোঃ আবদুল মজিদ। অনুষ্ঠানে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বলেন, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন যা অর্থমূল্য দিয়ে নিরূপণ করা যাবে না। বিষয়টি প্রদর্শনী ও ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে সাধারণ জনগণকে অবহিত করা হবে। উল্লেখ্য, ঘোষণাপত্রটি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের প্রধানলবিতে দর্শকদের জন্য প্রদর্শন করা হবে বলে জাদুঘর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

প্রতিবেদন: জেসিকা হোসেন

সচিত্র বাংলাদেশ এখন ফেসবুকে

ভিজিট করুন

www.facebook.com/sachitrabangladesh/

চিকিৎসা শিক্ষায় এগিয়ে নারীরা

মোতাহার হোসেন

কিছু কিছু সংবাদ আশার আলো জ্বালায়। এ ধরনের খবর সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। নতুন করে অনেকেই নতুন প্রত্যয়, নতুন আশায় বুক বাঁধে। এমন একটি খবর হচ্ছে চিকিৎসা সেবায় পুরুষদের পেছনে ফেলে নারীদের এগিয়ে যাওয়ার গল্প। মেডিক্যালে ২০১৮ সালে ১০ হাজার ২২৩ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে, তারমধ্যে শতকরা ৬০ ভাগই ছাত্রী। বাদ বাকি ৪০ ভাগ ছাত্র। মেডিক্যালে ছাত্রী বেশি ভর্তি হচ্ছে, পাসও করছে বেশি। আবার এমবিবিএস পাসের ক্ষেত্রে শীর্ষ স্থানগুলোও ছাত্রীদের দখলে। নারী চিকিৎসকদের ৯৬ ভাগ বিশেষ দক্ষ স্ত্রী ও প্রসূতিরোগ বিষয়ে। পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায়, চিকিৎসা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে নারীর সংখ্যা পুরুষকে ছাড়িয়ে গেছে। স্বাস্থ্য অধিদফতরের সূত্র মতে, ঢাকা মেডিকেল কলেজে গত শিক্ষাবর্ষে ২২০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে। তাদের মধ্যে ১৩৬ জন ছাত্রী, ছাত্র মাত্র ৮৪ জন। গত ১০ বছরে পুরুষের তুলনায় এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জনকারী নারী চিকিৎসকের সংখ্যাও প্রায় ৩ হাজার বেশি।

গত ২০০৭ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি ও এমবিবিএস পাসের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, মেডিক্যালে ছাত্রের তুলনায় ছাত্রীর সংখ্যা বেশি। বাংলাদেশে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় নারীদের প্রভাব অত্যন্ত ইতিবাচক। এ বিষয়ে নীতিনির্ধারকদের আরো বেশি দৃষ্টি দেওয়া দরকার। এখন এমবিবিএস পাসের ক্ষেত্রে ছাত্রীরা শুধু সংখ্যায় বেশি তাই নয়, শীর্ষ স্থানগুলোও তাদের দখলে। গত বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন মেডিক্যাল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাস করা শীর্ষ ১০ জন শিক্ষার্থীর ৮ জন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের। আবার ওই আট জনের সাত জনই ছাত্রী। এই ধারা বেশ কয়েক বছর চলছে। ব্র্যাক জেমস পি গ্রান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ ও আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, আইসিডিডিআরবি'র গবেষণায় দেখা গেছে, এমবিবিএস পাস করা ৯১ শতাংশ নারী চিকিৎসক স্ত্রীরোগ ও প্রসূতিবিদ্যায় উচ্চতর ডিগ্রি নিতে আগ্রহী।

পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ২০০৭ সাল থেকে মেডিকেল কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে ছাত্রীরা ছাত্রদের থেকে ছাড়িয়ে যাওয়া শুরু করেছে। ২০০৬-২০০৭ শিক্ষাবর্ষে দেশের সরকারি-বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলোতে ৪ হাজার ৩৯৫ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছিল। এর মধ্যে ছাত্র ২ হাজার ১৬৭ জন এবং ছাত্রী ২ হাজার ২২৮ জন। ছাত্র ও ছাত্রী ভর্তির হার ছিল যথাক্রমে ৪৯ ও ৫১ শতাংশ। গত শিক্ষাবর্ষে ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৬০ শতাংশ। ১০ বছরে ২০০৭-২০১৬ সাল পর্যন্ত মেডিক্যাল কলেজগুলো থেকে মোট ৩৯ হাজার ২৮৫ জন বাংলাদেশি এমবিবিএস ডিগ্রি নিয়েছেন। তাদের মধ্যে ছাত্র ২১ হাজার ১২৩ জন এবং ছাত্রী ১৮ হাজার ১৬২ জন। অর্থাৎ এই সময়ে ছাত্রের চেয়ে ২ হাজার ৯৬১ জন বেশি ছাত্রী চিকিৎসক ডিগ্রি নিয়েছেন।

প্রতিযোগিতামূলক ভর্তি পরীক্ষার ভিত্তিতে জাতীয় মেধাক্রম তৈরি হচ্ছে। এতে ছাত্রীদের প্রাধান্য দেখা যাচ্ছে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজকে দেশের সেরা মেডিক্যাল কলেজ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মেধাতালিকার শীর্ষে থাকা শিক্ষার্থীরা এখানে ভর্তি হয়। পাঁচটি মেডিক্যাল কলেজ প্রতিবছর শুধু ৪৯০ জন করে ছাত্রী ভর্তি করছে। ছাত্রীর হার বেড়ে যাওয়ার পেছনের ভুমিকা আছে। ২০০৬ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিলে (বিএমডিসি) নিবন্ধিত ৩৪ হাজার ৬৯৭ জন চিকিৎসকের তথ্য বিশ্লেষণ করে ব্র্যাক জেমস পি গ্রান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ ও আইসিডিডিআরবির গবেষকেরা দেখেছেন, এদের মধ্যে ৪৮ শতাংশ পুরুষ চিকিৎসক ও ৫২ শতাংশ নারী চিকিৎসক। পুরুষ চিকিৎসকদের ৮৭ শতাংশের বিশেষ দক্ষতা মেডিসিন ও সার্জারি বিষয়ে। আর নারী চিকিৎসকদের ৯৬ শতাংশের বিশেষ দক্ষতা স্ত্রী ও প্রসূতিরোগ বিষয়ে।

কর্মক্ষেত্রে নারীদের বিশেষ করে নারী চিকিৎসকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা জরুরি এবং সে সাথে নারীবান্ধব কর্মক্ষেত্র নিশ্চিত করাও জরুরি। শহরের মতো গ্রামেও নিরাপত্তা, আবাসনসহ আধুনিক সুযোগসুবিধা নিশ্চিত করা গেলে নারী চিকিৎসকরা গ্রামে কাজ করতে আরো বেশি আগ্রহী হয়ে উঠবে।

বাংলাদেশসহ প্রতিবেশী দেশ ভারতেও গবেষণায় দেখা গেছে, চিকিৎসা, শিক্ষা ও পেশা চর্চার ক্ষেত্রে মেয়েরা অনেক বেশি নিবেদিতচিত্ত ও আন্তরিক। পাশাপাশি বর্তমানে পরিবার ও সমাজ থেকে মেয়েরা অনেক বেশি সমর্থন পাচ্ছে। চিকিৎসা সেবার মতো মহান পেশায় মেয়েরা আসুক এমন প্রত্যাশা প্রায় সব মা-বাবারই থাকে। নারী চিকিৎসকের সংখ্যাও বাড়ছে এটা যেমন ইতিবাচক দিক, তেমনি বেশি সংখ্যায় নারী চিকিৎসককে কাজে লাগানোর জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়াও জরুরি। কর্মক্ষেত্রে নারীদের সমস্যাগুলো দূর করতে পারলে চিকিৎসা সেবা নারীদের জন্য আরো স্বস্তিকর এবং সেবামূলক হবে।

অনেক সময় হাসপাতালে রোগীকে ২৪ ঘণ্টা সেবা দিতে গিয়ে নারী চিকিৎসকদের রাতের পালায় দায়িত্ব পালনে নানা সমস্যায় পড়তে হয়। গ্রাম পর্যায়ে নিরাপদে থাকা কিছুটা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এসব সমস্যার সমাধান করা গেলে চিকিৎসা পেশা নারীদের জন্য অনেক সহজ এবং সাবলীল হবে। স্বাস্থ্যসেবায় নারী চিকিৎসক বৃদ্ধি পাওয়ায় তার সুফল পাচ্ছে দেশের মানুষ। পাশাপাশি, নারী চিকিৎসকদের উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন, প্রশিক্ষণ ও সেবার ক্ষেত্রে বিদ্যমান অসুবিধা দূর করে তাদের চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্যসেবার আরো সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে পারলে নারীরা এক্ষেত্রে আরো বেশি এগিয়ে যাবে, ক্ষমতায়িত হবে নারী, এগিয়ে যাবে দেশ।

লেখক: সাংবাদিক ও কলামিস্ট

বঙ্গবন্ধু উদ্ধৃতি শীর্ষক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে

কে সি বি তপু

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলাদেশের স্থপতি, সোনার বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাঙালি জাতির মুক্তিসংগ্রামে নেতৃত্ব দেন, পরবর্তীতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির পদ অলংকৃত করেন। তবে তিনি শুধু বাঙালির নন, তিনি ছিলেন বিশ্বমানবতার আপনজন। তাই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তৃতার উচ্চারণগুলোই যেন বাংলাদেশের রূপকার শেখ মুজিবের চিন্তাচেতনা ও রাজনৈতিক দর্শন।

বই পরিচিতিতে বলা হয়েছে, 'জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫) বিশ্ব রাজনীতির এক অনন্য নাম। তাঁর নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম অর্জন করেছে। মানুষে মানুষে সমতায় বিশ্বাসী বঙ্গবন্ধু চিরজীবন গণমানুষের রাজনীতি করেছেন, লড়াই করেছেন বাঙালি জাতির সার্বিক মুক্তি ও কল্যাণের লক্ষ্যে।'

বিশ্বমানবতাবাদী উদার দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী বঙ্গবন্ধু জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সবজাতির সমমর্যাদা ও বিশ্বশান্তিতে বিশ্বাসী। সারা দুনিয়ার সকল শোষিত, নির্যাতিত, দুঃখী মানুষের ন্যায়বিচারের ও শান্তি নিশ্চিত করে নতুন শঙ্কামুক্ত উন্নত বিশ্বগঠন তাঁর অভীষ্ট। এই বিশ্বনেতার বিপুল সংখ্যক বক্তৃতা, সাক্ষাৎকার ও আত্মকথা থেকে বেছে নেওয়া একশটি

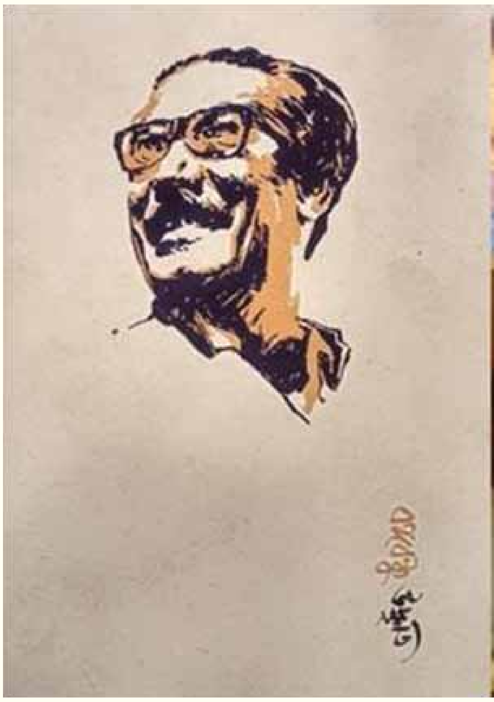

অমর বাণী। মহান এই নেতার কণ্ঠে বিভিন্ন সময়ে গণতন্ত্র, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, অসাম্প্রদায়িকতা, রাজনৈতিক সমঝোতা ও সহনশীলতা, দুর্নীতিবিরোধীসহ জনসাধারণের কল্যাণার্থে যে কথাগুলো উচ্চারিত হয়েছে তা যেন এখনো সাম্প্রতিক। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এমন কিছু অমর-কালোত্তীর্ণ উচ্চারণ নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে *বঙ্গবন্ধু উদ্ধৃতি*। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন মঞ্চে বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা, সাক্ষাৎকার এবং আত্মকথা থেকে একশটি উদ্ধৃতি স্থান পেয়েছে বইটিতে।

বর্ণিত গ্রন্থটির প্রকাশক সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশন-সিআরআইয়ের ট্রাস্টি ও বঙ্গবন্ধুর দৌহিত্র রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক। একশ পৃষ্ঠার বইটির মূল্য চারশ টাকা।

মূলত বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে অনেক গ্রন্থ প্রকাশ হলেও মহান এই নেতার বাছাইকৃত একশ উক্তি নিয়ে সংকলিত বই এটিই প্রথম। এসব উদ্ধৃতিতে ফুটে উঠেছে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি ও স্বাধীন উদ্ধৃতির সংকলন এই বইটি, এতে তাঁর রাজনীতি, জীবনবোধ, দর্শন ও রাষ্ট্রচিন্তার আংশিক পরিচয় পাওয়া যায়।

ইতিহাস ও সমাজচিন্তায় ঋদ্ধ তাঁর (বঙ্গবন্ধুর) অনন্য কথামালা সমকালীন বিশ্বে আজও প্রাসঙ্গিক হওয়ায় এই উদ্ধৃতিগুলো নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দিতেই, তা বই আকারে তার প্রকাশ করেছে সিআরআই।

বঙ্গবন্ধু উদ্ধৃতি পাওয়া যাবে সিআরআই কার্যালয়সহ আজিজ সুপার মার্কেটের বিদিত, কাঁটাবনের কনকর্ড এম্পোরিয়ালের সংহতি ও কাক-এ, নিউ মার্কেটের নিউ বুক সোসাইটি, জাতীয় জাদুঘরের পাঠক সমাবেশ সেন্টার, পান্থপথের মাদল সেন্টারে। এছাড়া চট্টগ্রামের বাতিঘর ও খুলনার মৃত্তিকা-এর পাশাপাশি অনলাইনে রকমারি ডটকমে পাওয়া যাবে *বঙ্গবন্ধু উদ্ধৃতি* বইটি। গ্রন্থটির বহুল প্রচার কাম্য।

লেখক: প্রবন্ধিক ও গবেষক

বিদায় কিংবদন্তি শিল্পী শাহনাজ রহমতুল্লাহ

ফারিহা রেজা

অগণিত সুহৃদ ও ভক্তদের অশ্রুজলে ভাসিয়ে না ফেরার দেশে চলে গেলেন সুরের পাখি শাহনাজ রহমতুল্লাহ। ২৩শে মার্চ শনিবার মধ্যরাতে আকস্মিকভাবে খবর ছড়িয়ে পড়ে সুরের পাখি শাহনাজ আর নেই। শোকের ছায়া নেমে আসে সংগীতাঙ্গনে। আধুনিক ও দেশাত্মবোধক অনেক গানের কিংবদন্তি এই শিল্পীর হাজারো ভক্ত-অনুরাগী ভিড় করেন তাঁর বারিধারার বাসায়। সারাজীবন এই গুণী শিল্পী ভক্তদের ভালোবাসার অর্ঘ্য পেয়েছেন রাশি রাশি। ২৪শে মার্চ রাজধানীর বারিধারায় পাক মসজিদে বাদ জোহর তাঁর জানাজা হয়। তারপর বনানী সামরিক কবরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয় তাঁকে।

২০১৬ সালে 'চ্যানেল আই মিউজিক অ্যাওয়ার্ড'-এর আজীবন সম্মাননা গ্রহণ করছেন শিল্পী শাহনাজ রহমতুল্লাহ

যে ছিল দৃষ্টির সীমানায়/যে ছিল হৃদয়ের আঙ্গিনায়/সে হারালো কোথায়/কোন্ দূর অজানায়– শাহনাজ রহমতুল্লাহর হৃদয় আকুল করা কণ্ঠ প্রতিটি বাঙালির হৃদয়ে জেগে থাকবে চিরকাল। তাঁর গায়কী ছিল অনন্য, অতুলনীয়। বাংলা সংগীতে সম্ভ্রান্ত উচ্চতায় তাঁর অবস্থান। শাহনাজ রহমতুল্লাহর কণ্ঠ, গায়কী তাঁকে 'অভিজাত' ঘরানার শিল্পীর কাতারে চিরস্থায়ী আসন এনে দিয়েছে। দেশাত্মবোধক গান এবং আধুনিক গানকে তিনি এমন এক উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছেন– যা বাংলা গানে তাঁকে কালজয়ী শিল্পীর মর্যাদা এনে দিয়েছে।

আধুনিক গান, গজল, দেশাত্মবোধক ও চলচ্চিত্রের অসংখ্য চিরায়তধারার গান গেয়েছেন শিল্পী শাহনাজ। ১৯৫২ সালে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি। ছোটোবেলা থেকেই সংগীত চর্চায় মগ্ন ছিলেন তিনি। বাংলা গানের বরেণ্য এই শিল্পী ছোটোবেলা থেকেই জনপ্রিয়তা লাভ করেন। মাত্র এগারো বছর বয়সে চলচ্চিত্রের গানে কণ্ঠ দেন। তিনি বাংলা ও উর্দু চলচ্চিত্রে গান করেছেন। তাঁর গাওয়া গান বাংলাদেশের সংগীতকে সমৃদ্ধ করেছে। ১৯৬৩ সালে 'নতুন সুর' ছবিতে প্লেব্যাক করেন। ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত নিয়মিত বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে গান করেছেন। বাংলাদেশ টেলিভিশনে গান করা শুরু করেন ১৯৬৪ সাল থেকে। গীতিকার ও সুরকার খান আতাউর রহমানের বেশ কিছু গান গেয়ে জনপ্রিয়তা লাভ করেন তিনি। *আবার তোরা মানুষ হ* চলচ্চিত্রের গান ও 'আমার আগুনে পোড়ানো এ দুটি চোখ' বেতারের গাওয়া তার এই গানগুলো শ্রোতারা চিরকাল মনে রাখবে।

শাহনাজ রহমতুল্লাহ গজল সম্রাট মেহেদি হাসানের শিষ্য ছিলেন। তাঁর ভাই আনোয়ার পারভেজ ছিলেন সুরকার, তাঁর আরেক ভাই প্রয়াত চিত্র নায়ক জাফর ইকবালও ভালো গান গাইতেন। সংগীত পরিবারে তিন ভাইবোনই মায়ের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছেন।

পেশাগত জীবনের ৫০তম বছরে তাঁর শিল্পী ক্যারিয়ার শেষ করার ঘোষণা দেন তিনি। ১৯৯২ সালে শাহনাজ রহমতুল্লাহ একুশে পদক পান। শ্রোতাদের পছন্দের ওপর ভিত্তি করে বিবিসি বাংলা এক জরিপে সর্বকালের সেরা ২০টি বাংলা গানের তালিকায় শাহনাজ রহমতুল্লাহর চারটি গান স্থান পায়। ১৯৯০ সালে *ছুটির ফাঁকে* চলচ্চিত্রে প্লেব্যাক করে জাতীয় পুরস্কার পান তিনি। সংগীতে বিশেষ অবদানের জন্য শিল্পকলা একাডেমি পুরস্কার ও চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতির পুরস্কার, ২০১৬ সালে 'চ্যানেল আই মিউজিক অ্যাওয়ার্ড'-এর আজীবন সম্মাননা, ২০১৩ সালে সিটি ব্যাংক থেকে গুণীজন সংবর্ধনা দেওয়া হয় তাঁকে।

শাহনাজ রহমতুল্লাহর স্বামী আবুল বাশার রহমতুল্লাহ, ছেলে সায়েফ রহমতুল্লাহ ও মেয়ে নাহিদ রহমতুল্লাহ। তারা যথাক্রমে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় বসবাস করছেন। শাহনাজ রহমতুল্লাহ এদেশের গণমানুষের প্রাণের স্পন্দনের সাথে মিশে যেতে পেরেছেন। এটাই কালজয়ী একজন শিল্পীর বড়ো সার্থকতা।

লেখক: প্রাবন্ধিক

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ ৭ই মার্চ ২০১৯ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রামাণ্য চলচ্চিত্র প্রত্যক্ষ করেন। তথ্যসচিব আবদুল মালেক এসময় উপস্থিত ছিলেন–পিআইডি

ডিএফপি কর্তৃক ঐতিহাসিক সাতই মার্চ এবং মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন

মিতা খান

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্যের স্বীকৃতির প্রেক্ষাপটে সার্কিট হাউস রোডে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর ৭ই মার্চ দিবসটি যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে উদ্‌যাপন করে। এ উপলক্ষে অধিদপ্তর প্রাঙ্গণে ৭ই মার্চের ভাষণভিত্তিক প্রামাণ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইসতাক হোসেনের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে তথ্য মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ প্রধান অতিথি এবং তথ্যসচিব আবদুল মালেক বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ ২৬শে মার্চ ২০১৯ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর আয়োজিত মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন–পিআইডি

এ সময় তথ্যমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা অনেক মানুষ দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রচার করেছেন। ২৫শে মার্চ রাতে ঢাকাসহ যেখানে যেখানে পাকবাহিনী হত্যাযজ্ঞ চালায়, চট্টগ্রামও তার মধ্যে অন্যতম। সেই বিভীষিকাময় রাতের পরের দিন চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ কর্মী নূরুল হক শহরের বিভিন্ন স্থানে মাইকিং করে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করেন। জিয়াউর রহমান চার দেয়ালের মধ্যে নিরাপত্তারক্ষী পরিবেষ্টিত অবস্থায় বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন, আর নূরুল হক জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মাইকিং করে তা প্রচার করেন। এজন্য বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচারে জিয়াউর রহমানের চেয়ে চট্টগ্রামের নূরুল হকের কৃতিত্ব বেশি।

তথ্যমন্ত্রী আরো বলেন, বিএনপি ইতিহাস বিকৃতির অপচেষ্টা করলেও বিশ্বব্যাপী আমাদের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লিপিবদ্ধ। জিয়াউর রহমান তার জীবদ্দশায় কখনো নিজেকে স্বাধীনতার ঘোষক বলে দাবি করেননি। ২৫শে মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধুর দেওয়া ঘোষণা তিনি ২৭শে মার্চ বঙ্গবন্ধুর পক্ষে পাঠ করেন।

২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। এ উপলক্ষেও চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর দিবসটি যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে উদ্‌যাপন করে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে বিভিন্ন সেক্টরে নারীদের অবদানের ওপর এ অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত প্রামাণ্য চলচ্চিত্র *আমরা তোমাদের ভুলবো না* এর প্রদর্শন ও আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। এসময় তথ্য মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যের শুরুতেই ড. হাছান মাহমুদ হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় চার নেতা, ভাষা সংগ্রামীসহ সকল শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। মন্ত্রী বলেন, পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে হত্যার পর থেকে তাঁর নাম ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার অপচেষ্টা চলেছে। কিন্তু সেই অপচেষ্টাকারীরাই ইতিহাস থেকে মুছে গেছে আর বঙ্গবন্ধু রয়েছেন চিরঞ্জীব।

এ সময় একাত্তরের মর্মান্তিক গণহত্যা প্রসঙ্গে বিএনপি'র সমালোচনা করে তিনি বলেন, গতকাল ২৫শে মার্চ ছিল গণহত্যা দিবস। আওয়ামী লীগ ১৪ দলসহ দেশের বিভিন্ন সংগঠন দিবসটি পালন করলেও বিএনপি করেনি। বেগম খালেদা জিয়া এবং পাকিস্তান উভয়েই ৩০ লক্ষ শহিদদের সংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। 'যারা শহিদদের সংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন তোলে– তারা দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বে কতটুকু বিশ্বাস করে? প্রশ্ন রাখেন তথ্যমন্ত্রী।

বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের বিস্ময়কর উন্নয়ন আজ বিশ্বে আমাদেরকে সম্মানজনক পরিচিতি দিয়েছে উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের অগ্রগতি আরো তরান্বিত হতো যদি বিএনপি-জামায়াত নেতিবাচক রাজনীতি না করত। নেতিবাচক রাজনীতি পরিহার করে দেশের স্বার্থে স্বাধীনতার চেতনায় উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ার কাজে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

এ অনুষ্ঠানে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইসতাক হোসেনের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন তথ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ আজহারুল হক, গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও ভারপ্রাপ্ত প্রধান তথ্য অফিসার মো. জাকির হোসেন। এ সময় অধিদপ্তরের পরিচালক স ম গোলাম কিবরিয়া অনুষ্ঠানের সূচনা বক্তব্য দেন।

লেখক: কপি রাইটার, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

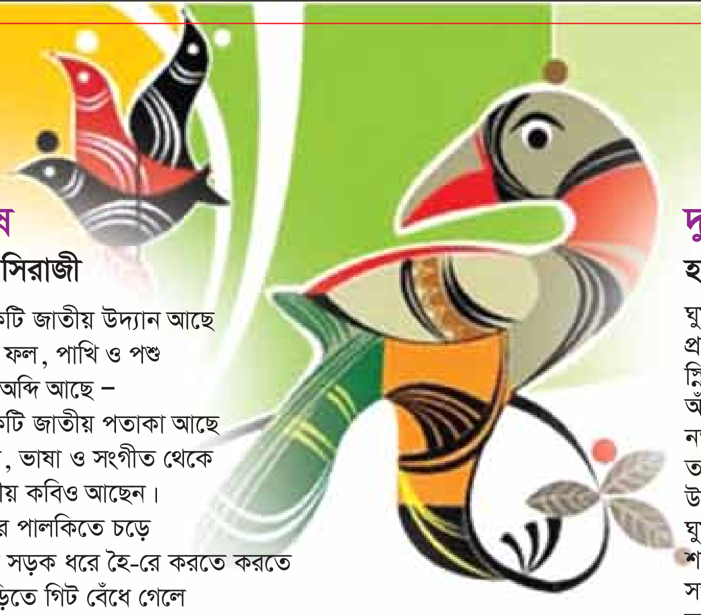

মহামানুষ

হাবীবুল্লাহ্ সিরাজী

আমাদের একটি জাতীয় উদ্যান আছে
জাতীয় ফুল, ফল, পাখি ও পশু
এমনকি মাছ অব্দি আছে –
আমাদের একটি জাতীয় পতাকা আছে
জাতীয় দিবস, ভাষা ও সংগীত থেকে
একজন জাতীয় কবিও আছেন।
একদিন ধর্মের পালকিতে চড়ে
পুব-পশ্চিমের সড়ক ধরে হৈ-রে করতে করতে
লুঙ্গি ও পাগড়িতে গিট বেঁধে গেলে
ভাষার পালে হাওয়া লাগল;
পদ্মা-যমুনা পার হয়ে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত পৌঁছে
উত্তরের আশ আর দক্ষিণের শ্বাস এক হতে হতে
পলি ও বালির মধ্যে গতরের গন্ধে সীমারেখা হলো;
আমাদের একটি দেশ হলো, বাংলাদেশ।

ঠোঁটে তর্জনী

জাহাঙ্গীর ফিরোজ

যে কথা বলতে চেয়েছি, সে কথা হলো না বলা
অন্ধকার ঘিরে ধরে পৃথিবীর আলো,
আজ তাই ভাবনায় সবকিছু এলোমেলো
আকাশ পাতাল থেকে উঠে আসা হাহাকার
চুপ হয়ে গেল
কারো মুখে শব্দ নেই কোনো।
ভয়ে বীণ রাত্রি দিন
অগণন মিথ্যের দাপটে আতঙ্কে ডুবে যায়।
কথক পাখিটি আর বলবে না কিছু
বলার ইচ্ছেগুলো উপ্ত থাক
সুপ্ত বিশ্বাসের নাবাল জমিতে।
এখন গ্রহণ কাল
রাহু গিলে নিয়েছে আলোকে
আবার গ্রহণ কাল শেষ হবে
তবু আশাহীন!
বিশ্বাসেরও মৃত্যু হয় কি?
কেউ আর বলছে না কিছু
মূক ও বধির যেন চেয়ে আছে!
কেউ কিছু শুনছে না আর
ভয় ও আতঙ্ক চোখে
রুদ্ধ ঠোঁটে তর্জনী আজ।

দ্যুতি হর্ষ স্বপ্ন জাগানিয়া

হাসান হাফিজ

ঘুম ভাঙানিয়া এক ব্যাকুল বাঁশরি তুমি
প্রসন্নতা ঢেলে দেওয়া মূর্ছনার ভোর
স্নিগ্ধ মায়া প্রশান্তি ও ঘোর
আঁধার রাত্রিকে তুমি সাহসে বিশ্বাসে স্বপ্নে
নতুনের উদ্দীপনে
তাড়াও অলক্ষ্যে দূরে
উজ্জ্বল আকাশ থেকে তুমি হও মাটির সমীপবর্তী
ঘুমন্ত মৃত্তিকা পায় তোমার কাঙ্ক্ষিত চুম
শস্যের সুছন্দ তান জেগে ওঠে সহজিয়া
সত্তায় প্রতীতি ফোটো বৈশাখি হরষে
তুমি এক স্বপ্ন জাগানিয়া দ্যুতি
বর্ষে বর্ষে ঘুরে ঘুরে
আবর্তিত নতুনের গান
তুমি প্রগতির মুক্তি, প্রেরণারও উৎসমূল
আত্মশক্তি জাগানোর
আকুলতা উচ্ছ্বসিত আনন্দের প্লাবনমদিরা।

রুবাই

সৈয়দ লুৎফুল হক

আমার ঘরেই বসত করে
দেখি না যে তারে,
দেখা হবে কোনো একদিন
আঁধার মাটির ঘরে।
খাঁচার ভেতর পাখি আমার
আসে বার বার,
যাবেই চলে সময় হলে
ফিরবে না সে আর।
পরান পাখি আসতো যেত
বসতো গাছের ডালে,
তার বিরহে কেন্দে আমি
ভাসি নয়ন জলে।

আপন মহিমায়

জাকির হোসেন চৌধুরী

একদা চৈত্রের দুপুরে বেজে যায়
ঝরা পাতার শান্ত নূপুর
খরতাপে উষ্ণ হৃদয়ের সবুজ আঙিনায়
অতঃপর নববর্ষ আসে নব উল্লাসে
ইলিশ-পান্তায় টানাটানি পড়ে যায়
হাজারো মানুষ জড়ো হয় মঙ্গল শোভাযাত্রায়
পুরনো হিসাব চুকিয়ে হালখাতা উৎসবে
ফিরে আসে বৈশাখ
বৃক্ষ চূড়ায় পত্রপল্লবে যে নতুন যৌবন ফিরে পায়
নদীও ভরে ওঠে কানায় কানায়
আম জাম লিচুরা নেচে ওঠে গাছে।
কাঁঠাল ছড়ার ঘ্রাণ পেয়ে শিশুরা নাচে
সোনালি ফসল ক্ষেত ভয়ে চোখ বুজে থাকে
রৌদ্র বৈশাখে কালো থাবা হাসে
মধু বাঁকে বাঁকে
কাঁচা আম ঝরে পড়ে ঘর হয় নড়বড়ে
খেয়ালিপনায় মেতে ওঠে বৈশাখ আপন মহিমায়।

জার্নাল: একাত্তর

সোহরাব পাশা

বাঙালির শ্রেষ্ঠ নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
বাঙালির অজেয় সন্তান
স্বদেশের প্রতি তাঁর ভালোবাসা আকাশ সমান,
যাঁর প্রতিচ্ছবি এঁকে গভীর বিস্ময়ে পৃথিবী দেখছে আজ
অপরূপ বাংলাদেশ গৌরবে উজ্জ্বল-দীপ্তিমান
তাঁর স্বপ্ন ছিল শুধু আলোকিত সোনার বাংলা,
বাংলার মানুষ ভালো থাক, দুঃস্বপ্ন রাত্রির হোক অবসান
অহোরাত্রি শুধু এই বাসনায় নিমগ্ন-বিভোর,
হাসিখুশি মন-প্রাণ, কণ্ঠে ভরা অবিনাশী গান
এই শ্যামল মৃত্তিকা পাখি ডাকা সূর্যমুখী ভোর;
একাত্তরে পৃথিবী শুনেছে তাঁর অমিয় উদাত্ত আহ্বান
যা' ছিল বাঙালির স্বপ্ন ও মুক্তির গান
'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'
যুদ্ধ হলো, অকাতরে ঝরে গেল কত প্রাণ
বর্বর আগুনে পুড়ে গেল কত গ্রাম,
কান্না ভুলে যায় বাংলাদেশ দুঃখ-শোকে মুহ্যমান
শহিদের রক্তে রাঙা হলো দৃপ্ত জয়ের নিশান;
সেদিন বাঙালি পেল স্বপ্ন দেখার স্বাধীন ভাষা,
অনন্য এদেশ, 'বঙ্গবন্ধু' এর রূপকার
নেই সেই পরাধীনতার ঘৃণ্য কুটিল কুয়াশা
বিশ্বসেরা এই বাংলাদেশ বাঙালির অহংকার।

কল্পনায় বেঁচে আছি

রুস্তম আলী

একটি সুন্দর মুখের হাসি দেখে আমার দিন কেটে যায়।
ক, খ, অ, আ দিয়ে লেখা কিছু কথামালা আমাকে মুগ্ধ করে।
তারপরও আমি বিষণ্নতায় ভুগি।
চারপাশের প্রতারকের প্রতারণা দেখে।
মাঝে মাঝে কল্পনা বাস্তবে রূপ নেয়।
সেই কল্পনা নিয়ে বেঁচে আছি।
মন মদিনার স্তম্ভ নয়।
তারপরও মনকে বোঝাতে চেষ্টা করি।
দুষ্টু মানুষের পাহারা নিজেকে অপরাধী বলে মনে হয়।
তারপরও একটি সুন্দর মুখের হাসি দেখে আমার দিন কেটে যায়।
ক, খ, অ, আ দিয়ে লেখা কিছু কথামালা আমাকে মুগ্ধ করে।
প্রতারকের প্রতারণা খুব সুক্ষ্ম।
তাই অপরকে বুঝতে কষ্ট হয়।
যে, বোঝে সে ব্যথা পায়।
বুঝেও না বোঝার ভান করি।
অথচ হৃদয় ফেটে যায়।
মন স্থির থাকতে চায় না।
একটি সুন্দর মুখের হাসি দেখে আমার দিন কেটে যায়।
ক, খ, অ, আ দিয়ে লেখা কিছু কথামালা আমাকে মুগ্ধ করে।
বাতাসে যে ধুলাবালি থাকে তারচেয়ে প্রতারকের সংখ্যা বেশি।
কিন্তু তার মাঝেও আমরা বেঁচে আছি।
এ বেঁচে থাকা শুধু কল্পনায়,
বীরত্ব বা বিশুদ্ধতা নয়।

নিঃসঙ্গ কে

শাহনাজ

আমার কথা আমি বলছি
না আর কারোর নয়
কেবল নিজের
সময়ের, সময়ের না অন্যের।
কেমন সময় এলো
সবাই ভাবে ওতো কেন মানুষের
কোনো না কোনো দলের।
কেন মানুষ একাই একটি দুনিয়া নয়
এক তো এদের মধ্যে বহু
নিঃসঙ্গ কেউ নয়।
তবুও কেবল একান্তের
না কোনো দলের নয়
একক এবং একজন।

শঙ্খের মাঝে সমুদ্রের গর্জন

মিলি হক

আনন্দের শুরু হয়েছিল সেই কবে পরবাসে
বন্দর থেকে বন্দরে নোঙর ভিড়ায় নাবিক
জীবন থমকে গেল এক দ্বীপে
গৃহী জীবন কী সুখের!
উষ্ণ চায়ের কাপ ধরিত্রীর বুকে
যে নারী চক্ষুতে সুখ বিলায়
তীক্ষ্ণ ধারালো ভুরু দিয়ে মৃত্যু ঝরায়।
থেমে যায় শ্রাবণ, সমুদ্রের গর্জন
পাতার কার্নিশ বেয়ে দু'ফোঁটা শিশির
ভিজতে ভিজতে দারুচিনি দ্বীপ ফেলে
চলে যাব চিম্বুক পাহাড়ে শুকনো নদীর খোঁজে।
ফুল্লরা, যদি আসো শঙ্খের মাঝে সমুদ্রের গর্জন দেব।
তুমুল কোলাহল বৃথা জীবন
কানামাছি খেলে অনাবিল দিন কাটাব
যদি মনে পড়ে অভিমানে অভিমানে
ভিজে যাওয়া মন নিয়ে ছুঁয়ে দিও
দোলনচাঁপার ঝাড় বেদনার নীলে
যদি মন কাঁদে চলে আসো
বন্দরে বন্দরে নোঙর করা নাবিকের নীড়ে।

আকাশ থাকে কারো নজরে

শাহরিয়ার নূরী

আকাশ থাকে কারো নজরে,
বেদনার নীলে
শিশিরের মতো কণায় কণায়
হাসিতে-চিঠিতে কারো,
গরম দুপুরে মায়ের আদরে
আঁচলে আঁচলে,
দোলা খায় বিদায়ী তাল পাখায়।
পায়ের পরশে সবুজ হাঁটা চলায়
অম্লান নীলাভ্র,ওরা ছায়া পায়?
আকাশ কোথায় তুমি,
চোখ মেলে কি দেখতে হবে,
কী দুর্ভাগ্য?
থাকো না কেন মনের জানালায়!

বৈশাখি দুপুর

আতিক আজিজ

সন্ধ্যা হলো বাড়ি ফিরে যাবো। বিস্তৃত নিমগ্ন বনভূমি
আর পাটবাজারের বুড়ো বটগাছ। স্পষ্ট মনে আছে
সেদিন পহেলা বৈশাখের বিকেলবেলা দুহাতে গাঁদা ফুলের মালা নিলে
স্বাগত হাতের উষ্ণ দুহাতে নিলাম।
সমস্ত পথের ছবি তোমার মুখের। নিবিড়তা আতত চুম্বন
একটি সমগ্র ভোর সারা ইতিহাস। ভালোবাসা, শান্ত বোশেখি বাতাস
দেখ নামিয়েছে নিমগ্ন অসংখ্য ঝুরি মাটির নিভৃতে।
কোনোদিন তোমাকে বলিনি ছোটবেলার সেই ডায়নিবুড়ির গল্প,
কাকনহাটি গ্রামের শেষের ধু ধু বটগাছ, সরব নিঝুমপুরী।
সুদূর মুদিত জ্যোৎস্না কোনোখানে পাতার রঙিন শব্দ নেই
একটি পাতার সঙ্গে অপর পাতার আত্মীয়তা, সান্দ্র পরিচয়
মাটির গভীরে হীরা, মাটির গভীরে শিখা প্রবাহিত।
তোমার জামদানি শাড়ির নীল অন্যমন অসহ্য মেঘের মতো
নিমীলতা। জল দুঃখ অশ্রুময়।
নিভৃত ধ্যানের তাপে প্রকাশিত প্রস্ফুটিত বিশুদ্ধ কমল
অরণ্যের প্রতিটি গাছের শিরা মূর্ত আবির্ভাব।
ভালোবাসা, কোথায় একাকী বসো কোন ছাদে ঘনিষ্ঠ সজল
বৃষ্টি থেমে যাওয়া আলো। বৈশাখি দুপুর
মাঝে মাঝে সম্পূর্ণ গৌরবে আসে– অনাসক্ত ধুলো, হাওয়া বিস্তীর্ণ অভাব
তখন আসনি তুমি একবারো– ভালোবাসা, আমাদের মিলন বেলার সন্ধ্যা,
কেমন অস্পষ্ট মনে হয়, বৈশাখি মেলার আলো বিবর্ণ সুদূর।

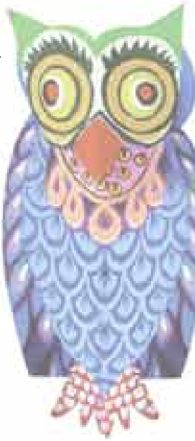

আগামীকাল আসুক

সৈয়দ শাহরিয়ার

আগামীকাল আসুক, বৈশাখের
ঝড়ো, বৃষ্টি কিংবা রোদ কড়কড়ে
বৈশাখের পরে
চলছে সময়, দিনকাল
সময় বদলে দেবে
শব্দ, বাক্য, বিন্যাস, রচনা
থরে থরে
হৃদয়ের শব্দ সব তাড়িয়ে এগোয়
আমায়, হতাশায় এবং পায়ে পায়ে
তেজদীপ্ত
বৃষ্টিতে আরক্ত মেখে
হাওয়ায় আগছালো
মন ছুঁয়ে যায় কালের ডানায়
মুহূর্তে সপ্ত আকাশে
নক্ষত্ররাজিতে
মঙ্গল এক তুড়িতে পাশে ফেলে
মহাকাল অতিক্রম করে
মানুষের ক্ষণকাল!
আগামীকালের পরের... বৈশাখে।

মন দুপুরে

সাদিয়া সিমরান

বৃষ্টি পড়ল মনদুপুরে
টাপুর টুপুর টাপুর টুপুর
পড়ল দেখি পড়ল ঘন
একটু আগে এই তো ছিল
খাঁ-খাঁ দুপুর তেমন
তোমার ছোঁয়ায় যায় চলে যায়
ভাসল উড়ে নেচে নেচে যেমন
দেখি তুমি থোকা থোকা,
গন্ধে গন্ধে ঝরিয়ে দিলে বকুল
বরষা কোথায় মেঘ যত দল
কোথায় বকুল কোথায় বকুল
হারায় বকুল, সাথে তুমি
বন্ধ ফ্যানে ঘুমটি আর স্বপ্ন টুটে
এটা নাকি হয় যে অকূল!

বৈশাখি মেলা

শাহরুবা চৌধুরী

সকলেরই নিশ্চয়ই কোথাও কোনো জন্মভূমি আছে?
ভালোবাসা, তুমি প্রথম কোথায় দৃষ্টি মেলেছিলে?
দাঁড়িয়ে আছি একলা বড়ো, মস্ত আঁধার বেলা
মনে পড়ছে সুদক্ষিণা বৈশাখিরই মেলা।
ডান গালেরই তিলে কী যে রেখেছিলে
পরাণভুক তুমি আমায় একলা টেনে ছিলে;
প্রশ্রয় না অন্য কিছু? নীরব যন্ত্রণা–
সেসব কথা গহীন অতি, ঘুম জমতো না।
সেখানে আজ হয় না যাওয়া
জীবন থেকে বৈশাখি হাওয়া
সৌরভ তার ইতস্তত রয়েছে যা ফেলা,
নদীর মতো ঘুমিয়ে নেই বৈশাখি ঐ মেলা।

কংক্রিটের পাখি

ইজামুল হক

কারিশমা ঝুলে আছে স্বপ্নের ভেতর
কুমারী পীড়িত নীলাকাশ
দীর্ঘ শ্বাসে দীর্ণ হয়।
বিষণ্ন ছায়া ফেলে
উড়ে যায় কংক্রিটের পাখি
অদৃষ্টের চুলো থেকে উঠে আসে ধোঁয়া
স্বপ্ন ভিজে যায়
ভিজে ভিজে মিশে যায়
পৃথিবীর তিন ভাগ জলে।

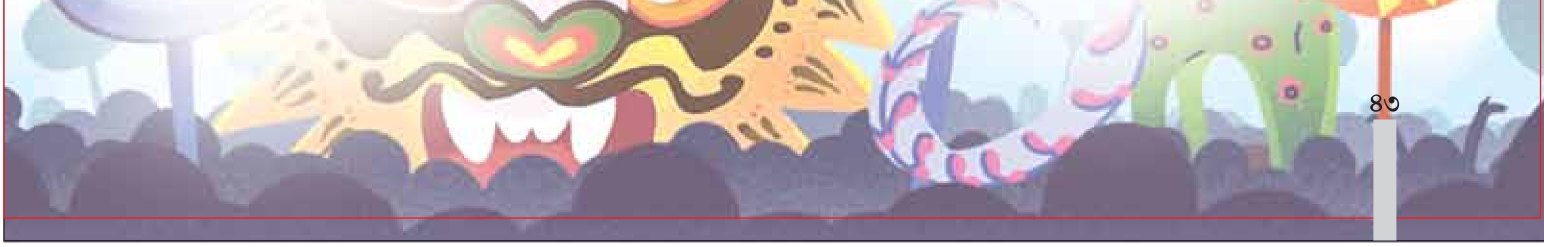

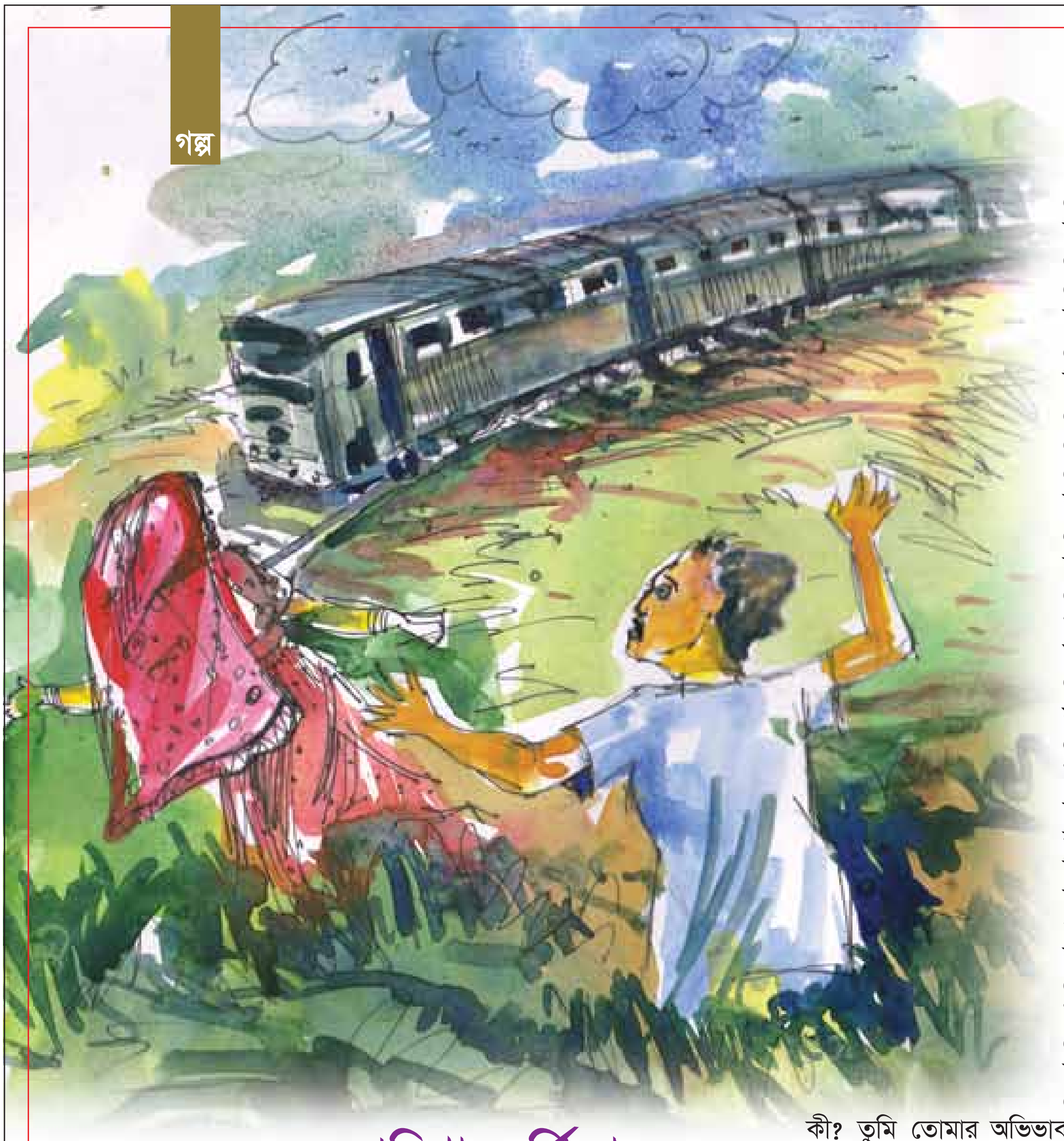

অপরিণামদর্শিতা

ফকির জসীমউদ্দিন

কিছুক্ষণ আগেও মেয়েটির দিকে তাকিয়েছিল টিকিট কালেক্টর। মেয়েটি খানিক দূরে। ট্রেনের দাঁড়ানো সীমানা এখনো পেরিয়ে আসতে পারেনি সে। কিছুটা ভয়, কিছুটা আতঙ্ক এমন মনেই কমলাপুর বিশাল রেল স্ট্রেশনের প্লাটফরমে ছোটো ছোটো পা ফেলে রেল গেইটের দিকে আসছে মেয়েটি। যতই গেইটের দিকে যাচ্ছে ততই টিকিট কালেক্টরের খেয়াল হচ্ছে বেশি বেশি সেদিকে। কখনো কখনো আড়চোখে সেদিকে তাকাচ্ছেন তিনি। মনে মনে ভাবছেন, ব্যাপারটা কী, এত রাতে মেয়েটি একা এদিকে আসছে, সঙ্গে তো আর কোনো লোককেই দেখছি না। মেয়েটা একাই রেল গেইটের দিকে চলেছে, মেয়েটির পরনে লাল টুকটুকে বেনারশি শাড়ি। মাথায় টিকলি, হাতে কনুই অবধি চুড়ি ও মুখে মেকাপ। এত রাতে ট্রেনে চেপে ঢাকায় আসার মানেটা কী!

টিকিট কালেক্টর এরূপ চিন্তা করে মেয়েটির দিকে খেয়ালি হয়ে অন্যান্য প্যাসেঞ্জারদের থেকে টিকিট চার্জ করতে থাকল।

এ সময়টায় খুব বেশি প্যাসেঞ্জারের ঝক্কি ঝামেলা নেই। তবে কখনো কখনো কয়েকটি মাদি কুকুর প্লাটফরমের বাইরের চত্বরে ঘুরাফেরা করতে দেখা যায় এবং কতক কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠতেও শোনা যায়। প্লাটফরমের ভেতরে ফ্লোরের একপ্রান্তে খালি জায়গায় দেয়ালে ঠেস দিয়ে কোনো কোনো নিঃস্ব এবং ষাটোর্ধ্ব বয়োবৃদ্ধ ভিক্ষুককে ঢুলু ঢুলু চোখে কাত হয়ে বসে ঘুমাতেও দেখা যায় এসময়। মেয়েটি টিকিট কালেক্টরকে পেরিয়ে রেল গেইট দিয়ে যেতেই টিকিট কালেক্টর একটু রূঢ় মেজাজে মেয়েটিকে ডেকে বলল, দাঁড়াও। টিকিট দাও?

মেয়েটি বিনম্র ভাব দেখিয়ে বলল, টিকিট নেই।

কোথা থেকে এসেছ? ঘোড়াশাল থেকে। তোমার সাথে কেউ নেই? না, নেই। টিকিট কাটনি কেন? আমার কাছে কোনো টাকা নেই।

এ সময় স্টেশনের অভ্যন্তরে টিকিট কালেক্টর খানিকটা দূরে তাকিয়ে দেখল, একটি যুবক ছেলে এদিকেই খুব দ্রুত পায়ে হেঁটে আসছে বিস্মিত মনে। টিকিট কালেক্টর বিস্ফারিত চোখে এদিকে তাকালো বিস্মিত মনে।

যুবক ছেলেটি রেল গেইটের কাছে এসে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'কাজটি ভালো করনি জুঁই'।

জুঁই কোনো কথা না বলে ঠাঁই দাঁড়িয়ে রইলো টিকিট কালেক্টরের সামনে। টিকিট কালেক্টর যুবক ছেলেটিকে জুঁইয়ের সাথে কথা বলতে দেখে অন্য প্যাসেঞ্জারের থেকে টিকিট কালেকশনে মনোযোগী হলেন। যুবক ছেলেটি জুঁইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এমনটি করা ঠিক হয়নি জুঁই'। জুঁই কোনো কথা বলল না। আবারো বলল, 'আমি না হয় ভুলই করেছি, সেজন্য তোমার এমনটি করার মানে কী? তুমি তোমার অভিভাবককের সাথে কথা বলতে পারতে, জানাতে পারতে। লেঠা চুকে যেত'।

জুঁই কিছুই বলছে না। খালপাড়, যেখানে মাস কলাইয়ের খেতের নামায় সাঁকোতে পা ফেলতেই জুঁইয়ের সাথে প্রথম দেখা হয় যুবক ছেলেটির। জুঁই যখন খালপাড় থেকে সাঁকোর মাঝামাঝি জায়গায় এসে যায় তখনই যুবক ছেলেটি ও জুঁই মুখোমুখি হয় পরস্পরের। যুবক ছেলেটি হাস্যোজ্জ্বল মুখে অপলক দৃষ্টিতে জুঁইয়ের দিকে তাকিয়েছিল। পরস্পর মুখোমুখি খানিক সময়ে যুবক ছেলেটি জুঁইকে দেখছিল অবলীলায়। পেছনে সাঁকোর বাঁশে দাঁড়িয়ে রফিক একটু বিরক্তিভাব দেখিয়ে বলল, এই সুজন দুজনে সাঁকোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছিস যে, আমাদের তো যেতে অসুবিধা হচ্ছে। তুই মেয়েটিকে পাশ কাটিয়ে চলে যা।

সুজন একটু জোর গলায়ই পেছনে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'একপাশ হয়ে খাড়া বাঁশে ধরেই আমি জায়গা করে দিচ্ছি– মেয়েটি যাওয়ার জন্যে। একটু অপেক্ষা কর'।

ঠিক আছে। ঠিক আছে। তাই কর।

সুজন খালের ওইপাড়ে গিয়ে অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল রফিকের জন্যে। রফিক এপাড়ে এসে হাঁটতে হাঁটতে সুজনকে বলল, কী ব্যাপার, সাঁকোতে মেয়েটির পথ আগলে ধরে ঠাঁই দাঁড়িয়ে ছিলি! হ্যাঁ ছিলাম। মেয়েটিকে আমার খুব ভালো লেগেছে। তাই ইচ্ছে করেই সাঁকোর মাঝামাঝি জায়গায় মেয়েটির সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

অন্য কোনো উদ্দেশ্যে।

মানে?

এই মানে, মেয়েটাকে বিয়ে করার ইচ্ছে।

ইচ্ছেতো আছেই, তবে মেয়েটির ঠিকানাতো আমি জানি না।

আমি জানি।

কোথায়?

পলাশে সার কারখানার পাশে। সোবাহান মেম্বারের মেয়ে। মেম্বারের মেয়ে। মেয়েটির নাম জুঁই। মেয়েটি কী পড়াশুনা করে জানিস?

জানি, পলাশ ডিগ্রি কলেজে আই.এ পড়ে।

তো

তো-কি, বল?

বলছিলাম কী, মেয়েটিকে আমার ভালো লেগেছে। অর্থাৎ মেয়েটিকে বিয়ে করতে চাই।

বিয়েশাদি আল্লাহ্ হাতে। চেষ্টা করতে আপত্তি কী!

তাহলে কী করা যায়?

তাহলে তোমার কোনো আপত্তি না থাকলে আমিই যাব সোবাহান মেম্বারের কাছে বিবাহের প্রস্তাব দিতে।

না, না তা ঠিক হবে না। তোমার বয়স কম। মুরুব্বিদের সাথে কথা বলতে মুরুব্বি লাগে।

থাম, থাম, ওই যে উনি ছাতি ফুটিয়ে এদিকে আসছে।

উনি কে?

সোবাহান মেম্বার।

সুজন এমনটা দেখে খানিকটা পেছনে গিয়ে আমতলায় গিয়ে দাঁড়াল।

রফিক একটু এগিয়ে গিয়ে সোবাহান মেম্বারকে বলল, চাচা, আপনার সাথে আমার কিছু কথা আছে।

কী কথা?

আমি ছোটো মানুষ। আপনি মুরুব্বি। তবে মুরুব্বির সাথে মুরুব্বি কথা বললে ভালো হয়।

তা তুমি কী বলতে চাও, বলো?

বলছিলাম– সুজনের বাবা রহমত আলী আপনার সাথে দেখা করবে আপনার মেয়ের জুঁইয়ের বিবাহ বিষয়ে।

কার সাথে জুঁইয়ের বিবাহ?

সুজনের সাথে।

ঠিক আছে। আমাকে ভেবে দেখতে হবে। এখন আমাকে যেতে দাও।

এই কথা বলে মেম্বার চলে গেল মাথায় ছাতা ফুটিয়ে।

সোবাহান মেম্বার মনে মনে চিন্তা করল, মেয়ে যখন লায়েক হয়েছে মেয়ের বিয়ের বিষয়ে যে কেউই প্রস্তাব দিতে পারে। তাতে মন খারাপের কিছুই নেই। এমনটা ভাবতে ভাবতে সোবাহান মেম্বার যখন বাড়ির ভেতরে ঢুকলো তখন সকিনা বিবি একবার সোবাহান মেম্বারের মুখের দিকে তাকিয়ে খানিকটা চিন্তিত মনেই বলল, কী হয়েছে আপনার, কারো সাথে রাগারাগি হইছে? সোবাহান মেম্বার ভালো ভাব দেখিয়েই সখিনা বিবিকে বলল, না, না খারাপ না। গাছে ফল পাকলে সবাই ঝুঁকি দেয়।

বুঝলাম না আপনার কথা। সোবাহান মেম্বার ঘরে ঢুকে কাটে বসতে বসতে বলল, ওই যে উত্তর পাড়ার রহমন আলী তার পোলা সুজনের সাথে আমাগো জুঁইয়ের বিবাহ বিষয়ে কথা কইতে রহমত আলী আমাগো বাড়িতে আইবো।

বেশতো, ভালো কথা।

কী কইলা, ভালো কথা, বুইঝা কথা কইছো।

সুজন ভালো ছেলে। বেটে, দেখায় শুনায় তেমন ভালো না হলেও ভালো। ফার্টিলাইজার মেইলে চাকুরি করে, এ প্রস্তাব ফেলা ঠিক হবে না।

তুমি মেয়ের মা। তোমার মেয়ের ব্যাপারে তুমিই ভালো বুঝ। তবে মেয়ের একটা পছন্দ আছে না?

মেয়ের আবার পছন্দ কী- মেয়েকে কি আমরা গাংগে ভাসাইয়া দিমু।

তুমি ঠিকই কইছ জুঁইয়ের মা।

এই কথা শেষ করতে না করতে রহমত আলী বাড়ির গেইট পেরিয়ে বারান্দার সিঁড়ি ভেঙে দুহাতে দুটি মিষ্টির পাতিল নিয়ে ঘরে ঢুকে সোবাহান মেম্বারের দিকে তাকিয়ে বলল, আসছেলা মুয়ালাইকুম।

সোবাহান মেম্বার একটু হাস্যোজ্জ্বল মুখে জবাব দিল– আলাইকুম সালাম।

রহমত আলী খাটের পাশে একটি চেয়ারে বসতে বসতে অবলীলায় বলল, বাড়িতে অনেক কাজ ফালাইয়া আইছি। খুব দরকারেই আইছি। আমাগো সুজন আপনার মাইয়্যা জুঁই-রে খুব পছন্দ করছে। আমার পোলার সাথে আপনার মাইয়ার বিয়ার প্রস্তাব দিতে আইছি।

সখিনা বিবি পাশের রুম থেকে ঘোমটা মাথায় ধীর পায়ে হেঁটে এসে আগ্রহ প্রকাশ করে বলল, আমাগো কোনো আপত্তি নাই। সুজন ভালো ছেলে। দিন-তারিখ ঠিকঠাক করতে পারেন।

সোবাহান মেম্বার কোনো কথা বলল না।

রহমত আলী খানিকক্ষণ চিন্তাভাবনা করে বলল, তাহলে পহেলা অগ্রহায়ণ মাসেই বিবাহের দিন ধার্য হলো।

সখিনা বিবি হ্যাস্যোজ্জ্বল মুখে বলল, তা'ই ঠিক হইল বিয়াই সাহেব।

সোবাহান মেম্বার বলল, তাতে আমারও কোনো আপত্তি নাই।

এমন কথাবার্তার মধ্যেই জুঁই সদর দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করে সখিনা বিবিকে ডেকে অন্য রুমে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, তোমরা কীসের কথা বলছ সুজনের বাবার সাথে।

সখিনা বিবি হাসিখুশি মুখে বলল, তোর বিয়া, সুজনের সাথে তোর বিয়া। দিন-তারিখ ঠিক কইয়া দিছি। দিন-তারিখ বলে দিয়েছে। আমার মতামত নিয়েছ?

তুই মেয়ে মানুষ। তোর আবার মত কী। আমরা কি-তোর কোনো ক্ষতি করবো।

না? এই বিয়া হবে না। সুজনকে আমি ভালোবাসি না।

মাগো আমি তো দিন-তারিখ বলে দিয়েছি। এটা ফিরাই কীভাবে। মান সম্মানের প্রশ্ন।

জুঁই কোনো কথা বলল না।

বিবাহে তেমন কিছু ঢাকঢোল পিটানো না হলেও অগ্রহায়ণ মাসের পহেলা তারিখেই বিবাহ অনুষ্ঠিত হলো কনের বাড়িতে। কাজী সাহেবও বিবাহের কাজ সম্পন্ন করলেন। জুঁই বাসরঘরে বধূ সেজে বসে আছে বিষণ্ন মনে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে জুঁই চিন্তা করে কোনো কুল কিনারা স্থির করতে পারছে না মনে মনে। সুজনকে দিয়ে সংসার জীবন সুন্দর হবে না– এটাই জুঁইয়ের মনের কথা। একথা ভেবেই জুঁই উঠে দাঁড়াল বাসরের পালঙ্ক থেকে। একবার এদিক-সেদিক তাকিয়ে বাসর ঘরের পেছন দরজা দিয়ে জুঁই ধীর পায়ে বের হয়ে পড়ে রাস্তায়। তখন রাত সাড়ে দশটা। দৌড়াতে থাকে স্টেশনের দিকে। পেছনে সুজন। দৌড়াতে দৌড়াতে স্টেশনে দাঁড়ানো ট্রেনের কামড়ায় ঢুকে পড়ে জুঁই। সুজনও তড়িঘড়ি ট্রেন ছাড়ার সাথে সাথে ট্রেন কামড়ার ডান্ডিতে ধরে পাদানিতে পা রেখে দাঁড়িয়ে থাকে অস্থির মনে।

জুঁই এতক্ষণ প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে এসবই ভাবছিল মনে মনে। সুজনও দাঁড়িয়ে আছে। দুঃখ আর ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জুঁই মনে মনে ভাবছে সুজন ঝুঁকি নিয়ে নিজের জীবনকে বাজি রেখে আমার পিছু পিছু এসে পড়েছে অবলীলায়। তাকে অপছন্দ করা আমার ভুল হবে। তাকে আপন করে নেওয়াই আমার জন্য বুদ্ধিমতীর কাজ।

জুঁইয়ের এমনটা ভাবনার মধ্যে সুজন জুঁইকে আলতোভাবে ধাক্কা দিয়ে বলল, 'কী ব্যাপার, কথা বলছ না যে'। জুঁই বলল, 'বলছি আমার ভুল হয়ে গেছে, আমার ভুল হয়ে গেছে। চলো বাড়ি ফিরে চলো'।

সুজন বলল, 'দাঁড়াও, আমি টিকিট কেটে নিয়ে আসছি'।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ১লা মার্চ নির্বাচন ভবন অডিটোরিয়ামে জাতীয় ভোটার দিবস ২০১৯ অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন–পিআইডি

রাষ্ট্রপতি : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রবাসীদেরকে ভোটার করতে নির্বাচন কমিশনের প্রতি আহ্বান

প্রবাসী বাংলাদেশিরা যাতে প্রতিটি নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন তারজন্য নির্বাচন কমিশনকে তাদেরকে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ। রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে ১লা মার্চ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক আয়োজিত দেশের প্রথম 'জাতীয় ভোটার দিবস' পালন অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন।

প্রবাসে বসবাসরত বাংলাদেশিরা যাতে জাতীয় পরিচয়পত্র পেতে পারেন তার বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করে রাষ্ট্রপতি বলেন, বাংলাদেশের প্রায় এক কোটি লোক প্রবাসে অবস্থান করে এবং তারা বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। কিন্তু এদের অনেকেরই জাতীয় পরিচয়পত্র নেই। জাতীয় পরিচয়পত্র থাকলে প্রবাসীদের নাগরিকত্বসহ তাদের রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তি সহজতর হবে। তিনি আরো বলেন, জাতীয় ভোটার দিবসের এ বছরের বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে, 'ভোটার হব, ভোট দিব'– যা অত্যন্ত সময়োপযোগী ও যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আন্তর্জাতিক বাজারে পাটজাত পণ্যের চাহিদা সৃষ্টিতে পদক্ষেপ নিতে হবে

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, পাটশিল্প বিকাশের স্বার্থে দেশের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারেও পরিবেশবান্ধব পাটজাত পণ্যের চাহিদা সৃষ্টিতে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে। এছাড়া বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সব সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এলক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করবে এমন আশা প্রকাশ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, এতে পাটচাষিদের পাটের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে এবং পাট ও পাটজাত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ ও পাট খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধি লাভ করবে। ৬ই মার্চ জাতীয় পাট দিবস উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে রাষ্ট্রপতি একথা বলেন। এ বছর তৃতীয়বারের মতো 'জাতীয় পাট দিবস-২০১৯' উদ্‌যাপিত হলো।

স্কাউটিং পারে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আধুনিক করে গড়ে তুলতে

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, স্কাউট আন্দোলন শিশু-কিশোরদের চারিত্রিক গুণাবলি বিকাশে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। লেখাপড়ার পাশাপাশি সামাজিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নিজেদের সম্পৃক্ত করার মানসিকতা তৈরিতে স্কাউটিংয়ের ভূমিকা অনন্য। স্কাউটিংই পারে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আধুনিক, প্রগতিশীল, সৃজনশীল করে গড়ে তুলতে। ১০ই মার্চ গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার মৌচাক জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সাত দিনব্যাপী ১০ম বাংলাদেশ ও ৩য় সানসো স্কাউট জাম্বুরি উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন। রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, স্কাউটরা নিয়মিত সমাজসেবামূলক কাজের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা ও আর্তমানবতার সেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। বাংলাদেশকে আরো সুন্দর করে গড়ে তুলতে স্কাউটরা অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে।

টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে রাষ্ট্রপতির শ্রদ্ধা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৯তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় তাঁর সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ। ১৭ই মার্চ সকাল সোয়া ১০টায় টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন রাষ্ট্রপতি। এ সময় কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে জাতির পিতাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

টেকসই উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে প্রকৌশলীদের প্রতি আহ্বান

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ দেশের চলমান উন্নয়ন কর্মসূচি জনবান্ধব ও টেকসই করায় সহায়তা করতে প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদদের প্রতি আহ্বান জানান। ১৯শে মার্চ বুয়েট-এর ১১তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে রাষ্ট্রপতি একথা বলেন। এসময় তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বাধীনতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে উন্নয়ন পরিকল্পনা 'ভিশন-২০২১ এবং ভিশন-২০৪১' গ্রহণ করেছেন। এই স্বপ্ন বাস্তবায়নে জনবান্ধব ও টেকসই উন্নয়নে প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদদের ভূমিকা রাখতে হবে। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ১৮ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়েছে।

প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে

দেশের জলবায়ু উপযোগী স্থাপনা নির্মাণের নির্দেশ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২রা মার্চ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ-এর ৫৯তম কনভেনশন উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে যেসব স্থাপনা নির্মাণ করা হবে, তা যেন দেশের জলবায়ু উপযোগী হয়। প্রধানমন্ত্রী প্রকৌশলীদের আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করে সাফল্য অর্জনের প্রশংসা করেন। তিনি নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে গবেষণা বাড়ানোর এবং উৎপাদনের কৌশল উদ্ভাবন করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি কারিগরি শিক্ষার ওপর জোর দেন এবং প্রতি উপজেলায় কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রক্রিয়া সরকার হাতে নিয়েছে বলে উল্লেখ করেন। পরে প্রকৌশলে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ২০১৮ সালের স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়।

পতাকার মর্যাদা রক্ষায় সদা প্রস্তুত থাকার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩রা মার্চ রাজশাহী সেনানিবাসে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৭, ৮, ৯ এবং ১০ বীর-এর 'ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড' জাতীয় পতাকা প্রদান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে প্রধানমন্ত্রী দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় সেনাসদস্যদের আত্মত্যাগ, কর্তব্যনিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, একটি আধুনিক ও চৌকস সশস্ত্রবাহিনী গড়ে তুলতে তাঁর সরকার বদ্ধপরিকর। এলক্ষ্যে 'ফোর্সেস গোল ২০৩০' প্রণয়ন করে পর্যায়ক্রমে তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তিনি বলেন, পতাকা হলো জাতির স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, সম্মান এবং মর্যাদার প্রতীক। তাই পতাকার মর্যাদা রক্ষায় সশস্ত্রবাহিনীকে সদা প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি সেনাবাহিনীর সবাইকে দক্ষ, সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে সৎ এবং মঙ্গলময় জীবনের অধিকারী হওয়ার এবং পবিত্র সংবিধান ও দেশমাতৃকার সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ থেকে যে-কোনো অভ্যন্তরীণ কিংবা বাহ্যিক হুমকি মোকাবিলায়ও সদা প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী চার বীরকে জাতীয় পতাকা প্রদান করেন।

একনেকে আট প্রকল্পের অনুমোদন

জাপানি বিনিয়োগকারীদের জন্য আড়াইহাজারে একটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠাসহ ৬ হাজার ২৭৬ কোটি ২৪ লাখ টাকা ব্যয়ে একনেকে ৮টি প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়। ৫ই মার্চ শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে একনেক সভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এসব প্রকল্পের অনুমোদন দেন।

নবনির্বাচিত মেয়র ও কাউন্সিলরদের জনকল্যাণে কাজ করার নির্দেশ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭ই মার্চ তাঁর কার্যালয়ে ঢাকা উত্তর সিটির নবনির্বাচিত মেয়র এবং দুই সিটির নবনির্বাচিত কাউন্সিলরদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে প্রধানমন্ত্রী নতুন প্রতিনিধিদের শপথের মর্যাদা রক্ষা করে কাজ করার নির্দেশনা দেন। তাছাড়া তিনি স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করতে নিজস্ব আয় বাড়ানোরও আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক অ্যাওয়ার্ড অর্জন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৯' উপলক্ষে 'লাইফটাইম কন্ট্রিবিউশন ফর উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট অ্যাওয়ার্ড'-এ ভূষিত হন। নারীর ক্ষমতায়নে অসামান্য অবদান এবং দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে দক্ষ নেতৃত্বের জন্য এ পদক অর্জন করেন প্রধানমন্ত্রী। নারী দিবস উপলক্ষে ৭ই মার্চ জার্মানির বার্লিনে সিটি কিউব আইটিবি প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এ পুরস্কারের ঘোষণা দেওয়া হয়। ইনস্টিটিউট অব সাউথ এশিয়ান উইমেন (আইএসএডব্লিউ) এ পদক প্রদান করে। জার্মানিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ইমতিয়াজ আহমেদ প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে এ পদক গ্রহণ করেন।

নারী সমাজকে নিজেদেরই সক্ষমতা অর্জন করতে হবে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৯ই মার্চ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় আয়োজনে 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের সফলতার কথা তুলে ধরেন এবং বর্তমান সরকার নারীদের উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বলে উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর সরকার নারীর ক্ষমতায়নে সমাজের সর্বস্তরে পুরুষের পাশাপাশি তাদের সম-অধিকার নিশ্চিত করেছে বলে উল্লেখ করেন এবং দেশের নারী সমাজকে নিজের ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে নিজেদেরই সক্ষমতা অর্জনের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, শুধু আইন করলেই নারীর প্রতি সহিংসতা এবং বৈষম্য দূর হবে না। এজন্য সমাজ সচেতনতা সৃষ্টি করে সবাই এক হয়ে কাজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি শিশু ও নারী ধর্ষণকে অত্যন্ত গর্হিত একটি অপরাধ বলে উল্লেখ করেন এবং নারীর পরিচয় গোপন রেখে পুরুষকে সমাজের সবার কাছে তুলে ধরার জন্য গণমাধ্যমের প্রতি আহ্বান জানান। পরে এ অনুষ্ঠানে ৫ জন নারীকে 'জয়িতা সম্মাননা' প্রদান করেন প্রধানমন্ত্রী।

চার উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে এবং নয়াদিল্লি থেকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ১১ই মার্চ ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে পরিবহণ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সংক্রান্ত ৪টি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২রা মার্চ ২০১৯ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর ৫৯তম কনভেনশনের উদ্বোধন অধিবেশনে বক্তৃতা করেন–পিআইডি

মির্জাপুরের কুমুদিনী কমপ্লেক্সে ১৪ই মার্চ ২০১৯ দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা স্মারক স্বর্ণপদক প্রদান ও কুমুদিনীর ৮৬তম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে পদকপ্রাপ্তদের মাঝে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা–পিআইডি

উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ–ভারত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশ্বে একটি রোল মডেল আখ্যায়িত করেন এবং আগামীতেও এ সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সহযোগিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং বাংলাদেশের সোনালি অধ্যায় গড়তে ভারত সবসময় পাশে থাকবে বলে উল্লেখ করেন।

একনেকে ছয় প্রকল্পের অনুমোদন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জামালপুরে 'শেখ হাসিনা নকশি পল্লি'সহ ছয় প্রকল্পের অনুমোদন দেন। ১২ই মার্চ শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে এ অনুমোদন দেওয়া হয়। এসব প্রকল্পের মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ২ হাজার ৬৫০ কোটি ৭৬ লাখ টাকা।

সরকারি হাসপাতালেই প্রাইভেট প্র্যাকটিসের নির্দেশ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকদের সরকারি হাসপাতালেই প্রাইভেট প্র্যাকটিসের নির্দেশ দেন। যাতে চিকিৎসকদের বেসরকারি হাসপাতাল বা টাকার বিনিময়ে আলাদা চেম্বারে যেতে না হয় এবং রোগীরা যাতে সরকারি হাসপাতালের সেবা নিতে পারেন। ১২ই মার্চ শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে একনেক সভায় সভাপতিত্বকালে প্রধানমন্ত্রী এ নির্দেশ দেন।

রণদা প্রসাদ সাহা স্মারক স্বর্ণপদক প্রদান ও ৩১ প্রকল্পের উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৪ই মার্চ টাঙ্গাইলে মির্জাপুর কুমুদিনী ট্রাস্ট কমপ্লেক্সে 'দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা স্মারক স্বর্ণপদক' প্রদান এবং ৩১টি প্রকল্পের উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী দানবীর রণদা সাহা দেশের নারী শিক্ষার প্রসার ঘটানো থেকে শুরু করে মানবতার সেবায় যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন তা তুলে ধরেন। তিনি রণদা প্রসাদ সাহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আর্তমানবতার সেবায় এগিয়ে আসার জন্য দেশের বিত্তশালীদের প্রতি আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে ৪ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে স্বর্ণপদক প্রদান করেন। তাঁরা হলেন– তদানীন্তন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (মরণোত্তর), জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম (মরণোত্তর), নজরুল বিশেষজ্ঞ ও গবেষক প্রফেসর রফিকুল ইসলাম এবং বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী ও মুক্তিযোদ্ধা শাহাবুদ্দিন। পরে তিনি কুমুদিনী কমপ্লেক্স থেকে ফলক উন্মোচনের মাধ্যমে জেলার ৩১টি প্রকল্পের উদ্‌বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

ড্রাইভারদের অশুভ প্রতিযোগিতা বন্ধ করার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৬ই মার্চ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দ্বিতীয় কাঁচপুর সেতু, ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ভুলতায় চার লেন ফ্লাইওভার এবং লতিফপুর রেলওয়ে ওভারপাস উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গাড়ি চালানোর সময় চালকরা রাস্তায় একটা অশুভ প্রতিযোগিতা করে। ফলে অনেক দুর্ঘটনা ঘটে। এলক্ষ্যে চালকদের অশুভ প্রতিযোগিতা বন্ধ করার নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী।

শিশুদের জন্য দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় সংকল্প

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৭ই মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৯৯তম জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধ প্রাঙ্গণে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসন এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতার সমাধিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া ও মোনাজাত করেন। পরে প্রধানমন্ত্রী শিশুদের উদ্দেশে বলেন, আজকের শিশুরা আগামী দিনে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দেবে। তাই তাদের দেশপ্রেমের আদর্শ নিয়ে বেড়ে উঠতে হবে। এলক্ষ্যে জাতির পিতার আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে শিশুদের জীবন গঠনের আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি শিশুদের জন্য দারিদ্র্য ও নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় সংকল্প পুনর্ব্যক্ত করেন। এলক্ষ্যে তাঁর সরকার কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী *বঙ্গবন্ধুকে লেখা চিঠি* নামে একটি বইয়ের মোড়কও উন্মোচন করেন।

প্রতিবেদন: সুলতানা বেগম

তথ্যমন্ত্রী: বিশেষ প্রতিবেদন

বিশ্বকে এগিয়ে আসার আহ্বান

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় নিজস্ব সামর্থ্যে কাজ করে চলেছে বাংলাদেশ। আঞ্চলিক ও বিশ্ব সংস্থাগুলো থেকে প্রাপ্য অর্থায়নযোগে এ কাজকে আরো এগিয়ে নিতে পারে। ৯ই মার্চ রাজধানীর হোটেল ওয়েস্টিনে ২য় আন্তর্জাতিক জলবায়ু অর্থায়ন সম্মেলন (2nd International Conference on Climate Finance-ICCF)-এ প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন তিনি।

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বিশ্ব সম্প্রদায়কে পথ দেখিয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বাংলাদেশ বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী না হয়েও ক্ষতির শিকার হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে জলবায়ু পরিবর্তন ফান্ড গঠন করে বিশ্বের বুকে অনন্য নজির স্থাপন করেছে বাংলাদেশ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জলবায়ু পরিবর্তনে খাপ খাওয়ানো ও যুগান্তকারী পরিবেশবান্ধব তৎপরতার জন্য ২০১৫ সালে 'চ্যাম্পিয়নস অব দ্য আর্থ' পুরস্কারে ভূষিত হন। বাংলাদেশ গৃহকাজে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারে পৃথিবীর প্রথম স্থানে। মোট বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীর ৩ দশমিক ৩ শতাংশ বা ৫৫ লাখ বসতবাড়িতে ৫৬০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার করছে। শিগ্‌গিরই এ হার ১০ শতাংশে উন্নীত হবে।

বাংলাদেশ সেন্টার ফর এডভান্সড স্টাডিজের নির্বাহী পরিচালক ড. আতিক রহমানের সভাপতিত্বে কনফারেন্সে ড. সালিমুল হক, ইউএনএফসিসি প্রতিনিধি ড. পল ভি দেশংকর, অক্সফোর্ড পলিসি ম্যানেজমেন্টের সিনিয়র কনসালট্যান্ট ক্যাথেরিন কুক-সহ দেশি-বিদেশি জলবায়ু বিশেষজ্ঞরা উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

সব টিভির সম্প্রচার হবে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটে

বাংলাদেশের সব টেলিভিশন চ্যানেল আগামী ১২ই মে'র মধ্যে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ১-এর মাধ্যমে সম্প্রচার কার্যক্রম শুরু করবে বলে জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। ১১ই মার্চ সচিবালয়ে বেসরকারি টেলিভিশন মালিকদের সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অব টেলিভিশন চ্যানেল ওনার্সের (অ্যাটকো) কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক শেষে এ তথ্য জানান তথ্যমন্ত্রী।

এসময় তথ্যমন্ত্রী বলেন, ১২ই মে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের এক বছর পূর্তি হবে। ১২ই মে নাগাদ বাংলাদেশের সমস্ত টেলিভিশন চ্যানেলগুলো বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সম্প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট কর্তৃপক্ষ টেলিভিশনগুলোকে তিন মাস বিনামূল্যে সেবা দেবে বলেও জানান তিনি। ১২ই মে নাগাদ বাংলাদেশ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কোম্পানি সকল টিভি'র ডাটা অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে গাজীপুরে সজীব ওয়াজেদ ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে সেখান থেকে আপলিংক এবং ডাউনলিংক করা হবে। সেজন্য বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট কর্তৃপক্ষ সবার সঙ্গে আলোচনা করে টেলিভিশনগুলো কী দরে স্যাটেলাইট ব্যবহার করবে তা নির্ধারণ করা হবে এবং বাংলাদেশ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কোম্পানি বিটিভি'র মাধ্যমে কেবল অপারেটরদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক 'এল এন বি (লো নয়েজ ব্লক)' যন্ত্র সরবরাহ করবে বলেও জানান তথ্যমন্ত্রী।

বিদেশি টিভিতে বিজ্ঞাপন প্রচারের বিষয়ে বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী বিদেশি চ্যানেলের মাধ্যমে বাংলাদেশে বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, আমরা ইতোমধ্যে কেবল অপারেটরদের স্মরণ করিয়েছি। আবার নোটিশ জারি করব। ১লা এপ্রিলের পর থেকে কেউ যদি এই আইন ভঙ্গ করে, সরকারের এ নির্দেশনা পালন না করে, তাহলে আমরা আইনি ব্যবস্থায় যাব।

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ ৯ই মার্চ ২০১৯ হোটেল ওয়েস্টিনে ২য় আন্তর্জাতিক জলবায়ু অর্থায়ন সম্মেলনে বক্তৃতা করেন–পিআইডি

পশ্চিমাদের অন্ধ অনুকরণ আর নয়

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেন, মানবিক মূল্যবোধে অনেক পশ্চিমা দেশ থেকে আমরা এগিয়ে আছি, তাই পশ্চিমাদের অন্ধ অনুকরণ নয়। তারা ভৌত ও অবকাঠামোগত দিক দিয়ে উন্নততর হলেও, পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধে আমরা তাদের থেকে উন্নত ও বেশি ধনী। ১৬ই মার্চ রাজধানীর গুলিস্তানে মহানগর নাট্যমঞ্চ হলে ঢাকা মানবাধিকার কনভেনশন ২০১৯-এ প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন তিনি।

ন্যায়ভিত্তিক সুষম সমাজ, উন্নত রাষ্ট্রের পাশাপাশি উন্নত জাতি গঠনে মানবিক মূল্যবোধ ও মানবাধিকারের ওপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করে ড. হাছান মাহমুদ এ সময় জাতির পিতার কথা স্মরণ করে বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির অধিকার রক্ষায় প্রথমে স্বাধিকার আন্দোলন গড়ে তোলেন, পরে তিনি আন্দোলনকে স্বাধীনতা সংগ্রামে রূপ দেন। স্বাধীনতার পর মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যার কারণে তাঁর 'সোনার বাংলা' গড়ার স্বপ্ন পুরোপুরি বাস্তবায়িত হতে পারেনি, যা পূর্ণ করার কাজ করে চলেছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আমাদেরকেও ঐক্যবদ্ধভাবে সেলক্ষ্যে কাজ করতে হবে।

মানবাধিকার রক্ষায় আয়োজক সংস্থার উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে সকল মানবাধিকার সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান মন্ত্রী। অনুষ্ঠানে মানবাধিকার নিয়ে প্রশংসনীয় কাজের জন্য সংস্থার নির্বাচিত কর্মীদের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন তিনি।

এসডিজি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ অনেক দূর এগিয়েছে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দশটি বিশেষ উদ্যোগের প্রচার কার্যক্রম এবং শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রম প্রকল্পের ওপর দিনব্যাপী কর্মশালা ২রা মার্চ জয়পুরহাটে অনুষ্ঠিত হয়। তথ্যসচিব আবদুল মালেক প্রধান অতিথি হিসেবে কর্মশালার উদ্‌বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে তথ্যসচিব বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে একটি সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দশটি বিশেষ উদ্যোগ জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে জনগণের সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি অর্জনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এমডিজিতে সাফল্য অর্জনের পর এসডিজি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ অনেক দূর এগিয়েছে। রূপকল্প–২০২১, রূপকল্প–২০৪১ এবং ডেল্টা প্ল্যান–২১০০ বাংলাদেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করতে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখবে।

প্রতিবেদন: শারমিন সুলতানা শান্তা

জাতীয় ঘটনার প্রতিবেদন

জাতীয় ভোটার দিবস

১লা মার্চ: দেশে প্রথমবারের মতো নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত হয় 'জাতীয় ভোটার দিবস'। দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– ভোটার হব, ভোট দেব।

আইইবির অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

২রা মার্চ: ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এ চার দিনব্যাপী ৫৯তম কনভেনশনের উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন প্রকৌশলীরা। পরিবেশ ও প্রতিবেশের কথা মাথায় রেখেই তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা নিতে হবে। স্থাপনা নির্মাণের সময় কৃষিজমি ও জলাধার যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৯তম জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস ২০১৯ উপলক্ষে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধু সমাধিসৌধ কমপ্লেক্সে আয়োজিত বইমেলায় ডিএফপি'র স্টল ঘুরে দেখেন–পিআইডি

বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস

৩রা মার্চ: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস'। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল-'লাইফ বিলো ওয়াটার, ফর পিপল অ্যান্ড প্লানেট'।

বিশ্ব যৌন নিপীড়ন বিরোধী দিবস

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ৪ঠা মার্চ নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'বিশ্ব যৌন নিপীড়ন বিরোধী দিবস'।

জাতীয় পাট দিবস

৬ই মার্চ: দেশব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'জাতীয় পাট দিবস'। এবারে দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল, 'সোনালি আঁশের সোনার দেশ, জাতির পিতার বাংলাদেশ' বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'পাটের কোনো কিছুই ফেলনা নয়। ফলে পাটে লোকসান হওয়ার কথা নয়'।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ পালিত

৭ই মার্চ: বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে জাতি ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ পালন করে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত

৮ই মার্চ: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও নারীবাদী সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করে 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'সবাই মিলে ভাবো, নতুন কিছু করো/নারী-পুরুষ সমতার নতুন বিশ্ব গড়ো'।

জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস

১০ই মার্চ: সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করে 'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল, 'দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুতি, হ্রাস করবে জীবন ও সম্পদের ঝুঁকি'।

জাতীয় মৌ মেলা ২০১৯

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে তিন দিনব্যাপী 'জাতীয় মৌ মেলা ২০১৯' অনুষ্ঠিত হয়। এবারের মেলার প্রতিপাদ্য ছিল, 'পুষ্টি, আয় ও ফলন বাড়াবে মৌ চাষ'। মেলা অনুষ্ঠিত হয় রাজধানীর ফার্মগেটের আকামু গিয়াসউদ্দিন মিল্কী মিলনায়তন চত্বরে।

শেখ হাসিনা ও নরেন্দ্র মোদির ভিডিও কনফারেন্স

১১ই মার্চ: ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বাংলাদেশের চারটি উন্নয়ন প্রকল্প উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ উদ্‌বোধনে প্রধানমন্ত্রী

১৩ই মার্চ: বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৯-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে শিক্ষার্থীদের বেশি বেশি সম্পৃক্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন।

বিশ্ব কিডনি দিবস পালিত

১৪ই মার্চ: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করে 'বিশ্ব কিডনি দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'সুস্থ কিডনি সবার জন্য, সর্বত্র'।

আন্তর্জাতিক নদীকৃত্য দিবস

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ১৪ই মার্চ পালিত হয় 'আন্তর্জাতিক নদীকৃত্য দিবস'। এবারের প্রতিপাদ্য ছিল– 'নদী সুরক্ষা ও ব্যবস্থাপনায় নারীর ভূমিকা'।

বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস

১৫ই মার্চ: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে পালিত হয় 'বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস'। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল– 'নিরাপদ মানসম্মত পণ্য'।

দ্বিতীয় কাঁচপুর সেতুসহ ৩ প্রকল্প উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী

১৬ই মার্চ: গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দ্বিতীয় কাঁচপুর সেতু, ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ভুলতায় চার লেন ফ্লাইওভার ও লতিফপুর রেলওয়ে ওভারপাস উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বঙ্গবন্ধুর ৯৯তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপিত

১৭ই মার্চ: বর্ণাঢ্য আয়োজনে সারাদেশে উদ্‌যাপিত হয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ৯৯তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস।

টুঙ্গিপাড়ায় শিশু সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী

জাতির পিতার জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধ কমপ্লেক্সে শিশু সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আজকের শিশুরাই আগামী দিনে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দেবে। তাই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে শিশুদের জীবন গঠন করতে হবে।

এনইসি বৈঠক

১৯শে মার্চ: শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (এনইসি) বৈঠকে চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য ১ লাখ ৬৫ হাজার কোটি টাকার সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) অনুমোদন লাভ করে।

বিশ্ব বন দিবস

২১শে মার্চ: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও পালিত হয় 'বিশ্ব বন দিবস'।

বিশ্ব পানি দিবস

২২শে মার্চ: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'বিশ্ব পানি দিবস' উদ্‌যাপিত হয়। এবার দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'Leaving no one behind'।

বিশ্ব আবহাওয়া দিবস

২৩শে মার্চ: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'বিশ্ব আবহাওয়া দিবস'। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল– 'সূর্য, পৃথিবী ও আবহাওয়া'।

সমরাস্ত্র প্রদর্শনী উদ্‌বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

২৪শে মার্চ: তেজগাঁও পুরানো বিমানবন্দরের জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে সামরিক বাহিনীর সমরাস্ত্র প্রদর্শনীর উদ্‌বোধন করেন।

বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস'। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল– 'এখনই সময় অঙ্গীকার করার যক্ষ্মামুক্ত বাংলাদেশ গড়ার'।

স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান

২৫শে মার্চ: বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে স্বাধীনতা পুরস্কার ২০১৯ প্রদান করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। নিজ নিজ ক্ষেত্রে গৌরবময় ও অসামান্য অবদান রাখার স্বীকৃতি হিসেবে এবার ১৩ ব্যক্তি ও একটি প্রতিষ্ঠানকে স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

জাতীয় গণহত্যা দিবস পালিত

নানা আয়োজনে একাত্তরের ২৫শে মার্চে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বর হত্যাযজ্ঞ স্মরণে পালিত হয় জাতীয় 'গণহত্যা দিবস'।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস

২৬শে মার্চ: যথাযোগ্য মর্যাদায় সারাদেশে বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপন করে 'মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস'।

শিশু-কিশোর সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী

বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে শিশু-কিশোর সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও মাদকের থেকে শিশু-কিশোরদের দূরে রাখতে হবে'।

প্রতিবেদন: আখতার শাহীমা হক

জাতিসংঘ বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে ৭ই মার্চের ভাষণ নিয়ে আলোচনা

জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে ইউনেস্কোর বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের ওপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন স্থায়ী মিশনের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ও উপস্থায়ী প্রতিনিধি তারেক মো. আরিফুল ইসলাম। এরপর রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতির পিতার ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের ভিডিও প্রদর্শন করা হয়। এরপর শুরু হয় আলোচনা পর্ব। এ ভাষণে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য একজন সুযোগ্য রাষ্ট্রনায়কের সুচিন্তিত কৌশলের সবটুকুই প্রতিভাত হয়েছে। এ মর্মে মন্তব্য করেন বক্তারা।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৬শে মার্চ ২০১৯ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের স্মরণে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন–পিআইডি

বাংলাদেশকে ১৬ কোটি ডলার দেবে বিশ্বব্যাংক

রোহিঙ্গাদের মৌলিক সেবা এবং সামাজিক সুরক্ষা দিতে বাংলাদেশকে সাড়ে ১৬ কোটি ইউএস ডলার অনুদান দেবে বিশ্বব্যাংক। বাংলাদেশি মুদ্রায় এ অর্থের পরিমাণ প্রায় এক হাজার ৪০০ কোটি টাকা। ৯ই মার্চ ওয়াশিংটনে বিশ্বব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে বোর্ড সভায় এ অনুদান অনুমোদন হয়। এ অর্থে রোহিঙ্গা আশ্রিত এলাকায় তৈরি করা হবে– ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, সড়ক, ফুটপাত, ড্রেন, কালভার্ট ও সেতু। ক্যাম্পের ভেতর ও বাইরে বসবে সড়ক বাতি।

ছয় দেশের শিল্পী গাইছেন বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গান

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে প্রকাশ হচ্ছে ৬ দেশের ৮ শিল্পীর অ্যালবাম 'বঙ্গবন্ধু তুমি স্বপ্ন বাঙালির'। 'দ্য মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ লাভারস অব দ্য ওয়ার্ল্ড সোসাইটি, বাংলাদেশ চ্যাপ্টার এ আয়োজন করেছে। শিল্পীরা হলেন– বাংলাদেশ থেকে ফাহমিদা নবী ও সুবীর নন্দী, ভারত থেকে নচিকেতা চক্রবর্তী ও শুভমিতা, নেপাল থেকে আশরা কুনওয়ার, ভুটান থেকে সাংগে হ্লাদেন শেরিং, শ্রীলঙ্কা থেকে ডেভিড এবং মালদ্বীপ থেকে শালাবি। পুরো অ্যালবামের গানগুলো লিখেছেন কবি সুজন হাজং। সুর করেছেন যাদু রিছিল।

বাংলাদেশের উন্নতি সবসময়ই ভারতের জন্য আনন্দের

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছেন, বাংলাদেশে উন্নতি সবসময়ই ভারতের জন্য আনন্দের বিষয় এবং প্রেরণার উৎস। ১১ই

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাথে ১১ই মার্চ ২০১৯ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যৌথভাবে চারটি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্‌বোধন করেন–পিআইডি

মার্চ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে একযোগে তাঁর দেশের আর্থিক সহযোগিতায় বাংলাদেশে চারটি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্‌বোধনকালে প্রদত্ত ভাষণে এ কথা বলেন। শেখ হাসিনা গণভবন থেকে এবং নরেন্দ্র মোদি নয়াদিল্লির তাঁর কার্যালয় থেকে ভিডিও কনফারেন্সে যোগ দেন।

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

উদার দেশ বাংলাদেশ

বিশ্বের ১৪৪টি উদার দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ৭৪তম। যুক্তরাজ্যের চ্যারিটিজ এইড ফাউন্ডেশন এই তালিকা তৈরি করেছে। 'সিএএফ ওয়ার্ল্ড গিভিং ইনডেক্স ২০১৮' শীর্ষক এই তালিকায় এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান নবম। আর দক্ষিণ এশিয়ায় চতুর্থ। মোট একশ'র মধ্যে বাংলাদেশের স্কোর ৩১, সবচেয়ে বেশি ৫৯ পয়েন্ট নিয়ে উদার দেশের তালিকায় শীর্ষস্থানে আছে ইন্দোনেশিয়া।

নতুন নোট চালু

একশ টাকার নতুন নোট চালু করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। কটন কাগজে ভার্নিশযুক্ত এ নোট অধিক সুদৃঢ়। এ নোটের উভয়পাশে ভার্নিশের প্রলেপের কারণে চকচকে মনে হবে। খসখসে নয় পিচ্ছিল অনুভূত হবে। রং ও ডিজাইন অপরিবর্তিত হওয়ায় নোটের ওপর লেখা কঠিন হবে।

দুই রুটে চক্রাকার বাস সেবা

রাজধানীর ধানমন্ডি, সায়েন্স ল্যাব, নিউ মার্কেট, আজিমপুর রুটে

চক্রাকার বাস সার্ভিস শুরু হয়েছে। উন্নত সেবা শৃঙ্খলার পাশাপাশি যানজট কমাবে এ সেবা। এ চক্রাকার বাসে সর্বনিম্ন রেট ১০ টাকা সর্বোচ্চ ৩০ টাকা। নির্ধারিত রুটের ৩৬টি স্থানে বাসগুলো থামবে। টিকিট কেটে লাইনে দাঁড়িয়ে বাসে উঠতে হবে। ৫ থেকে ১০ মিনিট পর পর রাস্তার দুপাশে বাস পাওয়া যাবে।

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

ডিজিটাল বাংলাদেশ

ইন্টারনেটে এক দেশ এক রেট

টেলিকম সেক্টরে সেবার মানে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও আইসিটি মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার। তিনি অপারেটরদের কাছে দাবি তোলেন, 'এক দেশ এক রেট' হতে হবে। গ্রামাঞ্চলে জন্ম নেওয়া তো কারো অপরাধ নয়। তাহলে একই সেবা নিয়ে তাদের কেন বেশি বিল দিতে হবে? ফলে সবাই যেন সমান সুবিধা পান সেটা নিশ্চিত করতে হবে।

১২ই মার্চ রাজধানীর একটি হোটেলে টেলিকম রিপোর্টার্স নেটওয়ার্ক-টিআরএনবি আয়োজিত 'ডিজিটাল সেবায় ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

স্মার্টফোন ও কম্পিউটারের সিমুলেশন সফটওয়্যার তৈরি করছে বাংলাদেশ

বিশ্বজুড়ে ব্র্যান্ডের স্মার্টফোন নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো ফোন তৈরির আগে অভ্যন্তরীণ গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরীক্ষা করে থাকে। এসব ফোন অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার জন্য যে প্রযুক্তির প্রয়োজন তা তৈরি করছে বাংলাদেশের ইঞ্জিনিয়াররা।

জাপানের প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান হলোর টেকনোলজি আইএনসি এ বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করছে। এর ফলে বাংলাদেশে দক্ষ কর্মী তৈরি, কর্মসংস্থান এবং বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের অবস্থান আরো দৃঢ় হচ্ছে। এ ধারা অব্যাহত রাখতে সম্প্রতি দ্বিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষর করেছে ক্লাউড কোডার লিমিটেড (বাংলাদেশ) ও হলোর টেকনোলজি আইএনসি (জাপান)। ১৭ই মার্চ গুলশানে ক্লাউড কোডারের নিজ অফিসে দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

১৮০টি দেশে সফটওয়্যার রফতানি করছে বাংলাদেশ

২১শে মার্চ ২০১৯ রাজধানীর বসুন্ধরা আন্তর্জাতিক কনভেনশন সিটিতে তথ্যপ্রযুক্তি খাতের প্রদর্শনী বেসিস সফটএক্সপোর সমাপনী অনুষ্ঠান হয়। এতে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেন, 'আমরা এমন একটা সময়ে এখন উপনীত

হয়েছি যখন ডিজিটাল যন্ত্র উৎপাদনের বিষয়টি অনেক সম্ভাবনাময় হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশ এখন ১৮০টি দেশে সফটওয়্যার রফতানি করছে। আইওটি পণ্য আমরা সৌদি আরবে রফতানি করছি'।

মন্ত্রী আরো বলেন, ২০২১ সাল থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে প্রযুক্তির বিস্ময়কর আবিষ্কার ৫জি যুগে প্রবেশের প্রস্তুতি ইতোমধ্যেই আমরা শুরু করেছি। এসময় প্রযুক্তির বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সফটওয়্যার ও ডিজিটাল ডিভাইস প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সংগঠন বেসিসসহ তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ ও উদ্ভাবকদের ৫জির সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রযুক্তি বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবটিক, বিগডাটা, আইওটি ও ব্লকচেইন প্রযুক্তির ওপর নিজেদের আরো দক্ষ করে গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রী ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদৃষ্টি সম্পন্ন পরিকল্পনা তুলে ধরে বলেন, এক সময় ডিজিটাল বাংলাদেশকে নিয়ে হাস্য-তামাসা করা হতো। আজ তা পৃথিবীর অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

সমাপনী অনুষ্ঠানে দেশের প্রথম কম্পিউটার ব্যবহারকারী মোহাম্মদ মুসাকে মরণোত্তর সম্মাননা প্রদান করা হয়। পরিবারের পক্ষে তার মেয়ে এই সম্মাননা গ্রহণ করেন।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফফাত আঁখি

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহের উদ্‌বোধন শিশুদের অতিরিক্ত চাপ না দেওয়ার আহ্বান

'প্রাথমিক শিক্ষার দীপ্তি, উন্নত জীবনের ভিত্তি'– প্রতিপাদ্য নিয়ে সারাদেশে 'জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৯' পালিত হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৩ই মার্চ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে-এর উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী শিশুদের শিক্ষার জন্য অতিরিক্ত চাপ না দেওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, শিশুরা যেন খেলতে খেলতে, হাসতে হাসতে সুন্দরভাবে নিজের মতো করে পড়তে পারে। এলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী অভিভাবক-শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে শিক্ষার্থীদের বেশি বেশি সম্পৃক্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন। এছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্লাস ওয়ানে ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তির প্রক্রিয়া বন্ধ করতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন এবং বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এলাকাভিত্তিক প্রাইমারি স্কুলে সব শিশুকে ভর্তি করতে বলেন। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুরা যাতে মূলস্রোতে যুক্ত হয়ে দেশের উন্নয়নে ভূমিকা অক্ষুণ্ন রাখতে পারে সেক্ষেত্রে শিক্ষক, সহপাঠী এবং বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে যত্নবান হওয়ার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। এসময় তিনি মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে 'জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক' প্রদান করেন।

কোচিং বাণিজ্য বন্ধ ও শিক্ষার মানোন্নয়নে কাজ করার আশ্বাস

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি ১৩ই মার্চ সচিবালয়ে তাঁর দপ্তরে স্টুডেন্টস কেবিনেট নির্বাচন উপলক্ষে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী কোচিং বাণিজ্য বন্ধের পদক্ষেপ এবং শিক্ষার মানোন্নয়নে বেশ কিছু বিষয়ে কাজ করার আশ্বাস দেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৩ই মার্চ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ-২০১৯' উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে মেধাবী শিক্ষার্থীদের জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক ২০১৮ প্রদান করেন–পিআইডি

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মানবিকতা, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের শিক্ষা দেওয়ার আহ্বান

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি শিক্ষা খাতে যেসব পরিবর্তন হচ্ছে এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অবশ্যই ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ১০ই মার্চ চট্টগ্রামে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ইস্ট ডেল্টার প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানবিকতা, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের শিক্ষা দেওয়া এবং শিক্ষার্থীদের মাদক, সন্ত্রাস, মৌলবাদ ও জঙ্গিবাদ থেকে দূরে থাকার শিক্ষা দেওয়ার আহ্বান জানান।

বিশ্ববিদ্যালয়কে মানবসম্পদ গড়তে কাজ করার নির্দেশ

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেন, দেশের শিল্প ও সেবা খাতের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা সম্ভব। এক্ষেত্রে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। ৬ই মার্চ বসুন্ধরায় নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি হিসেবে একথা বলেন মন্ত্রী। তিনি উচ্চ-শিক্ষার প্রত্যাশিত মান নিশ্চিত করতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আইন অনুযায়ী তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করবে বলে আশা প্রকাশ করেন এবং ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করে সেবার মানসিকতা নিয়ে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে আন্তরিকতার সঙ্গে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশ দেন। এছাড়া পরমতসহিষ্ণুতার সংস্কৃতিকে ধারণ ও মাদক, জঙ্গি এবং সন্ত্রাসমুক্ত দেশ গড়তে কাজ করার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান মন্ত্রী।

প্রতিবেদন: মো. সেলিম

শিল্প-বাণিজ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

জাপানিদের জন্য ৫০০ একর জমি বুঝে পেল বেজা

জাপানি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার জন্য ৫০০ একর জমি বুঝে পেয়েছে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)। নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসন ২৪শে মার্চ এ জমি বেজার কাছে হস্তান্তর করে। এ উপলক্ষে ঢাকার বীর উত্তম সি আর দত্ত সড়কে বেজার কার্যালয়ে জমি হস্তান্তর অনুষ্ঠানে নারায়ণগঞ্জের জেলা প্রশাসক উপস্থিত ছিলেন। নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে প্রায় ১ হাজার একর জমির ওপর জাপানি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা হবে এবং এর উন্নয়ন করবে জাপানের বিশ্ববিখ্যাত কোম্পানি সুমিতোমা করপোরেশন। শুরুতে ৫০০ একর জমিতে কাজ হবে। বেজা বলছে, জাপানি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের মাধ্যমে দেশটির বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগে আকৃষ্ট করা হবে।

নতুন কোম্পানিগুলো কর অবকাশ সুবিধা পাবে

অর্থনৈতিক অঞ্চলে শুধু নতুন কোম্পানিই কর অবকাশ সুবিধা পাবে। নতুন শিল্প ইউনিটের বাণিজ্যিক উৎপাদনে শুরুর প্রথম ১০ বছর বিভিন্ন হারে এই কর অবকাশ সুবিধা মিলবে। সম্প্রতি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এ প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। সাধারণত কোনো উদ্যোক্তা নতুন ব্যবসা শুরুর ক্ষেত্রেই কর অবকাশ সুবিধা পান। কর অবকাশ সুবিধা দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো– নতুন উদ্যোক্তা যেন ব্যবসাটি শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে পারেন। এজন্য তাকে করের বোঝা থেকে কিছুটা স্বস্তি দেওয়া হয়।

এনবিআরের প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, অর্থনৈতিক অঞ্চলে স্থাপিত নতুন শিল্প ইউনিটকে প্রথম তিন বছর কোনো কর দিতে হবে না। এরপর আরো তিন বছর কোনো কর দিতে হবে না। এরপর চতুর্থ বছরে ৮০ শতাংশ, পঞ্চম বছরে ৭০ শতাংশ, ষষ্ঠ বছরে ৬০ শতাংশ, সপ্তম বছরে ৫০ শতাংশ, অষ্টম বছরে ৪০ শতাংশ, নবম বছরে ৩০ শতাংশ এবং দশম বছরে ২০ শতাংশ পর্যন্ত কর অব্যাহতি সুবিধা দেওয়া হবে।

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

বিনিয়োগ : বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলাদেশে ২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করবে সৌদি আরব

বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য সম্প্রসারণে আগ্রহী সৌদি আরব। সেলক্ষ্যে দেশটির সরকার বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে ২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করবে বলে জানিয়েছেন ঢাকা সফররত দেশটির বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বিষয়ক মন্ত্রী ড. মজিদ বিন আব্দুল্লাহ আল কাসাবি। ৭ই মার্চ প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে গেলে তিনি এই আশ্বাস দেন। পরে, বিদ্যুৎ, ঔষধ ও জনশক্তি রপ্তানি খাতে পারস্পরিক সহযোগিতায় দুটি চুক্তি ও চারটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সৌদি আরব সফরের ধারাবাহিকতায় দুদিনের সফরে ঢাকায় আসেন দেশটির ৩৪ সদস্যের প্রতিনিধি দলটি। এসময় সৌদি বাণিজ্য ও পরিকল্পনামন্ত্রী বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নের প্রশংসা করে দুদেশের সম্পর্ক আরো এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

তেলনির্ভর অর্থনীতি থেকে বেরিয়ে উৎপাদনমুখী বাণিজ্যের প্রতি আগ্রহ দেখান দেশটির বাণিজ্য ও বিনিয়োগ মন্ত্রী ড. মজিদ বিন আব্দুল্লাহ আল কাসাবি। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশে ২৫ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের প্রস্তাবও দেন তিনি।

এসময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুদেশের সম্পর্ক আরো এগিয়ে নিতে নতুন উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান। জনশক্তি রপ্তানিসহ বিভিন্ন অমীমাংসিত বিষয়গুলো দ্রুত সমাধানে সৌদি সরকারকে জোর তাগিদও দেন প্রধানমন্ত্রী।

বাংলাদেশে আসবে চীনের বড়ো বিনিয়োগ

আগামী এক থেকে দেড় দশকে চীন বাংলাদেশের জ্বালানি, বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ খাতে ৫ হাজার কোটি ডলার বিনিয়োগ করবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি। ঢাকার সোনারগাঁও হোটেলে ১১ই মার্চ হংকং অ্যান্ড সাংহাই ব্যাংকিং করপোরেশনের (এইচএসবিসি) 'বাংলাদেশ-চীন বাণিজ্য সম্ভাবনা' শীর্ষক আলোচনা সভায় বাণিজ্যমন্ত্রী এসব কথা বলেন। এতে বাংলাদেশে চীনা ব্যবসায়ী গোষ্ঠী, ব্যাংকের গ্রাহক, এইচএসবিসির কর্মকর্তাসহ বাংলাদেশের ব্যবসায়ীসহ সংশ্লিষ্ট জন উপস্থিত ছিলেন। বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা যে প্রগতি ও উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছি, তাতে চীন গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। আগামী ১০-১৫ বছরে চীন বাংলাদেশের জ্বালানি, বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ খাতের উন্নয়নে ৫ হাজার কোটি ডলার বিনিয়োগ করবে বলে আশা করা যায়।

প্রতিবেদন: এস আর সবিতা

নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

নারীর ক্ষমতায়নে অবদানের স্বীকৃতি পেলেন শেখ হাসিনা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'লাইফটাইম কন্ট্রিবিউশন ফর উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট অ্যাওয়ার্ড'-এ ভূষিত হয়েছেন। আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে সামনে রেখে ৭ই মার্চ জার্মানির বার্লিনে সিটি কিউব আইটিবি প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে এ পুরস্কার গ্রহণ করেন জার্মানিতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ইমতিয়াজ আহমেদ।

নারীর ক্ষমতায়নে অসামান্য অবদান এবং দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে দক্ষ নেতৃত্বের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে এ পুরস্কার দিয়েছে ইনস্টিটিউট অব সাউথ এশিয়ান উইমেন (আইএসএডব্লিউ)। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মো. মাহবুব আলী।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন

৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এবার দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল-'সবাই মিলে ভাবো, নতুন কিছু করো, নারী-পুরুষ সমতার নতুন বিশ্ব গড়ো'। নারীর অগ্রগতি ও মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে সারাবিশ্বের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিবসটি পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে পৃথক পৃথক বাণী দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

নারী গণিত অলিম্পিয়ার্ড ২০১৯ অনুষ্ঠিত

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে তৃতীয়বারের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় 'নারী গণিত অলিম্পিয়ার্ড ২০১৯'। ৮ই

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৯ই মার্চ ২০১৯ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয়ে সাফল্য অর্জনকারী নারীদের মাঝে ফটোসেশনে অংশগ্রহণ করেন–পিআইডি

মার্চ অনুষ্ঠিত এ গণিত অলিম্পিয়ার্ড আয়োজন করে যৌথভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নারী গণিত অলিম্পিয়ার্ড কমিটি এবং এ এফ মুজিবুর রহমান ফাউন্ডেশন। এতে বিভিন্ন বিভাগে ২০টি সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন।

ঢাকা উইমেন্স ম্যারাথন ২০১৯

টানা চতুর্থবারের মতো ঢাকার হাতিরঝিলে ৮ই মার্চ সকালে অনুষ্ঠিত হয় 'ঢাকা উইমেন্স ম্যারাথন ২০১৯'। এভারেস্ট একাডেমি ও ইমেগো স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট লিমিটেডের যৌথ উদ্যোগে এবং বাংলাদেশ অ্যাথলেটিকস ফেডারেশনের সার্বিক সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত এ প্রতিযোগিতায় দেশ-বিদেশের পাঁচ শতাধিক নারী অংশগ্রহণ করেন। ১০ কিমি. পথ ৪৭ মিনিট ৫৯ সেকেন্ডে পাড়ি দিয়ে এবারের আসরে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন যুক্তরাজ্যের দৌড়বিদ জেন ক্রাউডা, দেশের কৃতী অ্যাথলেট পুরুষ ফুটবল দলের প্রথম নারী কোচ মিরোনা খাতুন প্রথম রানারআপ এবং দ্বিতীয় রানারআপ হয়েছেন সুইজারল্যান্ডের অ্যালেক্স মেকোনেন।

রাঁধুনী কীর্তিমতী সম্মাননা পেলেন চার নারী

রাঁধুনী কীর্তিমতী সম্মাননা ২০১৮ প্রদান করা হয়েছে ২রা মার্চ ঢাকার সোনারগাঁও হোটেলে। স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডের ব্র্যান্ড রাঁধুনী এবার চার নারীকে চারটি বিশেষ ক্ষেত্রে অবদানের জন্য কীর্তিমতী সম্মাননা প্রদান করে। সম্মাননা যাঁরা পেলেন– সাংবাদিকতায় রোজী ফেরদৌস, সমাজকল্যাণে তসলিমা ফেরদৌস, ব্যবসা উদ্যোক্তায় কোহিনূর ইয়াসমীন ও ক্রীড়ায় সালমা খাতুন।

জাতিসংঘের তিন সংস্থার সম্মাননা পেলেন তিন নারী

নানা ধরনের সামাজিক প্রতিবন্ধকতাকে মোকাবিলা করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা তিন নারীকে সম্মাননা জানিয়েছে জাতিসংঘের অধীন আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও), ইউএন ওমেন ও জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ)। এঁরা হলেন– পুষ্প খাতুন (১৯), পারভীন আক্তার (৩৩) ও নাসিমা আক্তার (৩৭)। ১৪ই মার্চ এই পুরস্কার প্রদান করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের 'সাহসী নারী' পদক পেলেন আইনজীবী রাজিয়া

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের আন্তর্জাতিক সাহসী নারী (আইডব্লিউওসি) পদক পেয়েছেন রোহিঙ্গা আইনজীবী রাজিয়া সুলতানা। ৮ই মার্চ ওয়াশিংটন ডিসিতে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে তিনিসহ এ পদক পাওয়া ১০ জনের হাতে পুরস্কার তুলে দেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও।

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

১০৯ সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

সরকারি সহায়তা এখন ব্যাংক হিসাবে

প্রান্তিক মানুষদের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্পের ভরতুকি বা অর্থসহায়তা দিচ্ছে সরকার। সারা দেশের ৪৬ লাখ ৫৪ হাজার আটশ একান্নটি ব্যাংক হিসাবে এসব অর্থ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার সুবিধাবঞ্চিত মানুষ ১০, ৫০ ও ১০০ টাকায় হিসাব খুলে এসব সহায়তা পাচ্ছেন।

দেশব্যাপী নামমাত্র অর্থে খোলা ব্যাংক হিসাবের সংখ্যা প্রায় এক কোটি ৮০ লাখ। আর এসব হিসাবের বিপরীতে জমা রয়েছে এক হাজার ছয়শ দশ কোটি টাকা। এর মধ্যে কৃষকের ব্যাংক হিসাব হচ্ছে ব্যাংক হিসাবের ৫২ শতাংশ। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ভাতাভোগী ২৬ শতাংশ এবং বাকি ২২ শতাংশ অন্যান্য। এসব ব্যাংক হিসাবধারী একদিকে যেমন আর্থিক সেবার অন্তর্ভুক্ত হতে পারছেন, অন্যদিকে এসব হিসাবের মাধ্যমে ভরতুকি কিংবা অর্থ সহায়তাও পাচ্ছেন। একইসঙ্গে গড়ে উঠছে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ের মনোভাব– যা অর্থনীতির জন্য খুবই ইতিবাচক।

কৃষক, মুক্তিযোদ্ধা, অতিদরিদ্র মহিলা, দুস্থ, ছিন্নমূল ও কর্মজীবী শিশু, এমনকি ভিক্ষুকরাও যাতে দশ টাকায় ব্যাংক হিসাব খুলতে পারে, সেজন্য ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। একইভাবে স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীরাও যেন এ সুযোগ পায় সে ব্যবস্থাও করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। অন্যান্য ব্যাংক হিসাবের মতো এসব হিসাবে ন্যূনতম কোন স্থিতি রাখতে হবে না, নেই কোনো বাড়তি চার্জও।

কৃষকসহ অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে ব্যাংকিং সেবায় আনার জন্য সরকার ন্যূনতম মূল্যে ব্যাংক হিসাব খোলার সুযোগ করে দিয়েছে। এ হিসাবের আওতায় কৃষকদের কৃষি উপকরণ ও ভাতার টাকা বিতরণের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এসেছে। এতে প্রশাসনিক কাজেও অনেক সুবিধা হয়েছে। আগে ভরতুকি ও সরকারি সহায়তার মধ্যে থাকত মধ্যস্বত্বভোগীরা। ফলে সঠিকভাবে প্রান্তিক মানুষের কাছে সহায়তা ও ভরতুকি পৌঁছাত না। সময়ও লাগত অনেক বেশি। এছাড়াও একই হিসাব ব্যবহার করে রেমিটেন্স উত্তোলন, কৃষিঋণ গ্রহণেরও সুযোগ রয়েছে। এ কার্যক্রমের শুরু থেকেই কৃষকদের সঞ্চয়ের মনোভাব গড়ে তোলার কাজটিও করা হয়। অন্য হিসাবে সঞ্চয়

করলে যে পরিমাণ লাভ দেওয়া হয়, তারচেয়ে বেশি পরিমাণ লাভ এসব হিসাব প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক নির্দেশ প্রদান করে তফসিলি ব্যাংকগুলোকে।

কৃষকের ব্যাংক হিসাবের পাশাপাশি একশ টাকার বিনিময়ে হিসাব খুলেছে ১৫ লাখ ৪০ হাজার শিক্ষার্থী। স্কুল ব্যাংকিংয়ের আওতায় খোলা এসব হিসাবে সঞ্চয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে এক হাজার চারশ বিশ কোটি টাকা। বর্তমানে ৫৭টি তফসিলি ব্যাংকের মধ্যে ৫৬টিতে এসব হিসাব খোলার সুযোগ রয়েছে।

অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি ও সামাজিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে ব্যাংলাদেশ ব্যাংক ২০১৭ সালের ১৭ই জানুয়ারি কৃষকদের জন্য দশ টাকায় ব্যাংক হিসাব খোলার সুযোগ করে দেয়। পরবর্তীতে মুক্তিযোদ্ধা ও সামাজিক ভাতাপ্রাপ্তদেরও এ সুবিধার আওতায় আনা হয়। এসব হিসাবের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়। এসব হিসাব সচল রাখার মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আরো গতিশীল হয়েছে। সরকারের যুগান্তকারী এ পদক্ষেপের ফলে গ্রামীণ জীবনে এসেছে গুণগত পরিবর্তন, উত্তরণ ঘটছে সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক মানুষদের।

প্রতিবেদন: মেজবাউল হক

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

রপ্তানির সম্ভাবনাময় খাত মধু

মৌ চাষ পুষ্টির চাহিদা পূরণের পাশাপাশি পরাগায়নের মাধ্যমে ফল ও ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মৌ সম্পদের টেকসই উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার, প্রসেসিং ও বাজারজাত অপরিহার্য। মধু উৎপাদন ও বিপণনের মাধ্যমে স্থানীয় চাহিদা পূরণ করে রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব। মধু উৎপাদন, বিপণন, প্রসেসিং নিয়ে গবেষণা প্রয়োজন। মৌ চাষ স্বল্প শ্রম ও স্বল্প বিনিয়োগের তুলনায় অধিক মুনাফা লাভের ব্যবসা হিসেবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি পর্যায়েও মৌ চাষ ও বিপণনে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ খাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মোট ৩০ শতাংশ নারী জড়িত। কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক ১০ই মার্চ খামারবাড়িতে আকামু গিয়াসউদ্দিন মিল্কী অডিটরিয়াম চত্বরে 'জাতীয় মৌ মেলা ২০১৯'-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন। তিন দিনব্যাপী এবারের মৌ মেলার প্রতিপাদ্য ছিল–'ফলন, আয় ও পুষ্টি বাড়াবে মৌ চাষ'। এবারের মেলায় মোট ৬০টি স্টল অংশগ্রহণ করে।

কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাকের সাথে ১৮ই মার্চ ২০১৯ ন্যাম ভবনে জাপানি প্রতিষ্ঠান Yanmar-এর প্রেসিডেন্ট Takeshi Ando-এর নেতৃত্বে ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন–পিআইডি

বাংলাদেশের কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণে কাজ করবে ইয়ানমার

বাংলাদেশে কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণে সহযোগিতা করতে আগ্রহী জাপানি প্রতিষ্ঠান Yanmar (ইয়ানমার)। স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়নে পাশে থাকা জাপানের শত বছরের পুরাতন এই প্রতিষ্ঠানটি কৃষি উন্নয়নেও কাজ করতে চায়। ১৮ই মার্চ কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাকের সাথে রাজধানীর ন্যাম ভবনে বৈঠকে জাপানি প্রতিষ্ঠানটির প্রেসিডেন্ট Takeshi Ando এসব কথা জানান। Takeshi Ando বলেন, কৃষক পর্যায়ে দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাসহ ভবিষ্যতে বাংলাদেশের বাজারে রিমোট সেন্সিং টেকনোলজি সম্পন্ন পণ্য নিয়ে আসতে চায় ইয়ানমার।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, সরকারি ও বেসরকারি সব প্রতিষ্ঠানকে সাথে নিয়ে কৃষি মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে নিরলসভাবে। বাংলাদেশের কৃষির বড়ো চ্যালেঞ্জ হচ্ছে সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাত ও বাজারজাত। কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োগ ও বাণিজ্যিক কৃষির জন্য সহযোগিতা চায় বাংলাদেশ। টেকসই কৃষি উন্নয়ন তথা বিভিন্ন ফসল ও শস্য বহির্ভূত কৃষি খাতের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষি যান্ত্রিকীকরণ এখন সময়ের দাবি বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

দেশীয় ভোজ্য তেলের উৎপাদন বৃদ্ধির আহ্বান

কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেন, দেশে জনসংখ্যার মাথাপিছু ভোজ্য তেলের ব্যবহার বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে দেশীয় ভোজ্য তেলের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। মাটি ও আবহাওয়া উপযোগী নতুন নতুন তেলবীজের জাত উদ্ভাবন করে ব্যাপক হারে আবাদ করে ভোজ্য তেলের আমদানি হ্রাস করতে হবে। এক সময় ভোজ্য তেল হিসেবে সরিষাই প্রধান ছিল। সরিষা শুধু তেলই নয়, এ থেকে পুষ্টি সমৃদ্ধ খৈল পাওয়া যায়, যা মৎস্য ও পশু খাদ্য হিসেবে বেশ চাহিদা রয়েছে। ১৯শে মার্চ কৃষি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সরিষা/তেলবীজ চাষ সম্প্রসারণ ও ভোজ্যতেলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভবিষ্যৎ করণীয় নির্ধারণ বিষয়ক সভায় এসব কথা বলেন তিনি।

প্রতিবেদন: এনায়েত হোসেন

কর্মসংস্থান : বিশেষ প্রতিবেদন

সরকারি শূন্যপদে নিয়োগ প্রক্রিয়ার কার্যক্রম শুরু

চলতি বছর সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে শূন্য পদের বিপরীতে প্রায় তিন লাখ লোক নিয়োগ দিবে সরকার। এর মধ্যে রয়েছে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণি পদে প্রায় ৫০ হাজার অস্থায়ী ভিত্তিতে (অ্যাডহক) এবং বিভিন্ন পদে স্থায়ীভাবে প্রায় দুই লাখ লোক। সরকারি প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা পদে প্রায় পাঁচ হাজার লোক নিয়োগের চিন্তাভাবনাও রয়েছে। এজন্য শিগগিরই ৪১তম বিসিএসের সার্কুলার জারি করা হবে। ৪০তম বিসিএসের সার্কুলার জারি করা হয়েছে ইতোমধ্যে। মোট এক হাজার ৯০৩ জন ক্যাডার নিয়োগ দেওয়া হবে বিসিএসে। এছাড়া আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বিভিন্ন বাহিনীতে ৬০ হাজার, শিক্ষা খাতে ৪০ হাজার, স্বাস্থ্য খাতে ৩৫ হাজার, ব্যাংকিং খাতে ২০ হাজার লোক নিয়োগ দেওয়া হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় এই নিয়োগ কার্যক্রম শুরু হচ্ছে।

এই লোক নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হবে আগামী জুন থেকে। ইতোমধ্যে নিজ নিজ মন্ত্রণালয় ও বিভাগের শূন্য পদের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। ২৫শে জানুয়ারি জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রী আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে এক কোটি ২৮ লাখ কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

১৫তম শিক্ষক নিবন্ধনের লিখিত পরীক্ষা

১৫তম শিক্ষক নিবন্ধনের লিখিত পরীক্ষা আগামী ২৬শে ও ২৭শে জুলাই অনুষ্ঠিত হবে। এর আগে, আগামী ১৯শে এপ্রিল ১৫তম নিবন্ধনের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার এ দিন ধার্য করেছে। সম্প্রতি এনটিআরসিএ কর্তৃপক্ষ গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে এ তথ্য জানায়।

ঘোষিত তারিখ অনুযায়ী, আগামী ১৯শে এপ্রিল শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে ১১টায় স্কুল ও স্কুল পর্যায়: ২-এর প্রিলিমিনারি পরীক্ষা এবং বিকেল ৩টা থেকে ৪টা পর্যন্ত কলেজ পর্যায়ের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। অন্যদিকে আগামী ২৬শে জুলাই শুক্রবার সকাল ৯টা থেকে ১০টা পর্যন্ত স্কুল ও স্কুল পর্যায়: ২-এর লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। আর আগামী ২৭শে জুলাই কলেজ পর্যায়ের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

নন-এমপিও শিক্ষকদের এমপিওভুক্তির আশ্বাস শিক্ষামন্ত্রীর

আগামী এক থেকে দেড় মাসের মধ্যে যোগ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে এমপিওভুক্তির আওতায় আনতে যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। ২৪শে মার্চ জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে শিক্ষকদের অবস্থান কর্মসূচিতে উপস্থিত হয়ে এই কথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী। শিক্ষকদের আশ্বস্ত করে মন্ত্রী বলেন, নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তকরণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

প্রতিবেদন: ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

শেষ হলো ট্রাফিক সপ্তাহ

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) ট্রাফিক সপ্তাহ ২৩শে মার্চ শেষ হয়েছে। ঢাকা মহানগরীর জনসাধারণকে ট্রাফিক শৃঙ্খলা উন্নতির লক্ষ্যে ১৭ই মার্চ ট্রাফিক সপ্তাহ শুরু হয়। এলক্ষ্যে ট্রাফিক বিভাগ জানায়, ট্রাফিক সপ্তাহের প্রথম ৬ দিনে ১ হাজার ১৯৭টি বাস-মিনিবাস, ২৫৪টি ট্রাক, ৯৮০টি কাভার্ড ভ্যান, ৯০২টি প্রাইভেট সিএনজি, ৪ হাজার ২৭১টি প্রাইভেটকার-জিপ, ৯৪৮টি মাইক্রোবাস, ১ হাজার ৭১৬টি পিকআপ, ১৪৫টি হিউম্যান হলার, ১৬ হাজার ৮৪১টি মোটরসাইকেল এবং ৩৭৩টি অন্যান্য যানবাহনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। তাছাড়া হাইড্রোলিক হর্ন ব্যবহার করার কারণে ৯৮১টি, হুটার-বিকন লাইটের জন্য ২৮টি, উলটো পথে চলাচলের কারণে ৮ হাজার ৩৮৩টি, পুলিশ-ডিএমপি স্টিকার লাগানোর জন্য ৬ ও কালো গ্লাস ব্যবহারের জন্য ৮৬টি যানবাহনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ৩ হাজার ৩১৯টি মোটরসাইকেল আটক করা হয়েছে। গাড়ি চালানোর সময় মোবাইল ফোন এবং এয়ারফোন ব্যবহারের অভিযোগে ২৫৬টি গাড়ির বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।

এছাড়া ট্রাফিক শৃঙ্খলা আনার লক্ষ্যে ডিএমপি'র প্রচেষ্টা সব সময়ই থাকে। এলক্ষ্যে গত বছরের ৫ থেকে ১৪ই আগস্ট পর্যন্ত ট্রাফিক

সপ্তাহ পালন, একই বছরের ৫ থেকে ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ট্রাফিক সচেতনতা মাস পালন এবং ২৪ থেকে ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত ট্রাফিক শৃঙ্খলা সপ্তাহ পালন করা হয়। চলতি বছরের ১৫ই জানুয়ারি থেকে ২রা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ট্রাফিক শৃঙ্খলা পক্ষ পালন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ট্রাফিক সচেতনতা বৃদ্ধি, ট্রাফিক গাইড বুক প্রকাশ ও প্রচার, ট্রাফিক আইন সম্পর্কে ধারণা প্রদান, সচেতনতামূলক সভা-সমাবেশ, ভিডিও প্রদর্শন, লিফলেট, পোস্টার বিতরণ, পথচারীদের ফুটওভারব্রিজ, আন্ডারপাস ও জেব্রা ক্রসিং দিয়ে রাস্তা পারাপারে উদ্বুদ্ধকরণসহ নানামুখী কর্মসূচি পালন করা হয়।

মতিঝিল-ধানমন্ডি-উত্তরায় চক্রাকার বাস সার্ভিস চালু

সড়কে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে এবং যাত্রীদের সুবিধার্থে রাজধানীর ধানমন্ডি-উত্তরা-মতিঝিলে পৃথক পৃথক চক্রাকার বাস সার্ভিস চালু করছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি)। ১৩ই মার্চ ডিএসসিসির নগর ভবনের সভাকক্ষে সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে বাস রুট রেশনালাইজেশন বিষয়ে গঠিত কমিটির সভা শেষে এক ব্রিফিংয়ে এ কথা জানান মেয়র মোহাম্মদ সাঈদ খোকন। তিনি বলেন, চক্রাকার বাস সার্ভিসটি এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে প্রাথমিকভাবে চালু হবে।

প্রতিবেদন: মো. সৈয়দ হোসেন

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

বিশ্ব আবহাওয়া দিবস

২৩শে মার্চ ২০১৯ বিশ্ব আবহাওয়া দিবস। প্রতিবছর বাংলাদেশসহ বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার ১৯৩টি সদস্য দেশ ও স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলসমূহ ২৩শে মার্চ বিশ্ব আবহাওয়া দিবস পালন করে আসছে। সংস্থাটি প্রতিবছর দিবসটি পালনের জন্য বাস্তব ও সময়োপযোগী একটি প্রতিপাদ্য বিষয় নির্বাচন করে থাকে। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে- 'সূর্য, পৃথিবী ও আবহাওয়া'।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারো যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালন করেছে। এসময় এ অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে আবহাওয়া সংক্রান্ত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও প্রামাণ্যচিত্র জনসাধারণের জন্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থাসহ ঢাকা শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়কদ্বীপ সজ্জিতকরণ ও র‍্যালির আয়োজন করা হয়।

পানির অভাবে ঝুঁকিতে মানুষ ও প্রকৃতি

২২শে মার্চ বিশ্ব পানি দিবস। জাতিসংঘ এসডিজির সাথে সমন্বয় রেখে এ বছর বিশ্ব পানি দিবস ২০১৯-এর প্রতিপাদ্য– 'Leaving no one behind', যা বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত যথার্থ।

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর সার্বিক তত্ত্বাবধানে ইতোমধ্যে দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা 'বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০' অনুমোদন করেছে। এ প্ল্যানের মূল উদ্দেশ্য হলো– বর্তমান সরকার ঘোষিত ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণ ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে উন্নীত হওয়া। এলক্ষ্য অর্জনে দেশের নদনদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখননের মাধ্যমে সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে একবিংশ শতাব্দীর সুপেয় পানির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বদ্ধপরিকর।

প্রতিবেদন: রিপা আহমেদ

যোগাযোগ : বিশেষ প্রতিবেদন

কলকাতার পথে মধুমতির যাত্রা

ঢাকা-কলকাতা যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল শুরু হয়েছে ২৯শে মার্চ। বাংলাদেশ-ভারত নৌ প্রটোকল চুক্তির আওতায় দুই দেশের নৌ-ভ্রমণে ইচ্ছুক পর্যটকদের যাতায়াতের সুবিধার্থে সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে ঢাকা-কলকাতা যাত্রীবাহী নৌ-চলাচল শুরু হয় লাল-সবুজ পতাকাবাহী এমভি মধুমতি ১৬০ জনের একটি বহর নিয়ে। অভ্যন্তরীণ নৌ-করপোরেশনের জাহাজ এমভি মধুমতি নারায়ণগঞ্জের পাগলার মেরি অ্যান্ডারসন ঘাট থেকে যাত্রা শুরু করে কলকাতার উদ্দেশে। এ বহরের মধ্যে যাত্রী ছিলেন ১০৭ জন। বাকিরা হলেন জাহাজ স্টাফ,

শিল্পী ও ক্যাটারিংয়ের লোকজন। যাত্রার আগে জাহাজ ঘাটে আয়োজন করা হয় উদ্‌বোধন অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আজ একটি ঐতিহাসিক দিন। ভারতের সঙ্গে আবার নৌ চলাচল শুরু হচ্ছে। ভারতের সঙ্গে আমাদের গভীর সম্পর্ক। এই সম্পর্ক আরো গভীর এবং দৃঢ় হবে এই নৌযাত্রার মধ্য দিয়ে। এটি একটি মাইলফলক হবে। বক্তৃতা শেষে তিনি এই নৌযাত্রার শুভ উদ্‌বোধন ঘোষণা করেন।

ওয়াটার বাস সার্ভিস

চট্টগ্রাম বন্দরকেন্দ্রিক যানজট এড়াতে বিমানবন্দরগামী যাত্রীদের দ্রুততম সময়ে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে নগরের সদরঘাট থেকে পতেঙ্গা ১৫ নম্বর ঘাট পর্যন্ত ওয়াটার বাস সার্ভিস চালু করতে যাচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। চট্টগ্রাম বন্দরের সচিব ওমর ফারুক জানিয়েছেন, ওয়াটার বাস নির্মাণের জন্য চিটাগাং ড্রাইডককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সংস্থাটি জাহাজ নির্মাণ প্রতিষ্ঠান ওয়েস্টার্ন মেরিনের সাথে চুক্তিও সম্পন্ন করেছে। সম্ভাব্য জুন মাস থেকে চালু করা হবে ওয়াটার বাস। এতে বন্দরকেন্দ্রিক যানজট কমবে। সুফল পাবে বিমান যাত্রীরা।

ওয়েস্টার্ন মেরিনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার সাখাওয়াত হোসেন বলেন, 'বন্দর কর্তৃপক্ষের এ উদ্যোগের সুফল পাবে চট্টগ্রামের মানুষ। ওয়াটার বাস চালু হলে মাত্র ৩০ মিনিটের মধ্যে যাত্রীদের বিমানবন্দরে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। আমরা দ্রুতগতি সম্পন্ন চারটি ওয়াটার বাস নির্মাণ করছি। ৩০ জন যাত্রীর ধারণক্ষমতার চারটি বাস দিয়ে সার্ভিসটি শুরু করতে চাই'। বন্দর সূত্র জানায়, প্রাথমিকভাবে ৩০ আসনের দুই জোড়া দ্রুতগতির ওয়াটার বাস নামানো হবে। চাহিদার সাথে সাথে সার্ভিস বাড়ানো হবে। ফ্লাইটের সময়সূচির সাথে সমন্বয় করে ওয়াটার বাস সার্ভিস চলবে।

প্রতিবেদন: জাহিদ হোসেন নিপু

মাদক প্রতিরোধ : বিশেষ প্রতিবেদন

মাদক-জঙ্গিবাদ নির্মূলে জিরো টলারেন্স

দেশ উন্নয়নের মহাসড়কে এগিয়ে যাচ্ছে উল্লেখ করে পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী বলেন, ২০২১ সাল থেকে ২০৪১ সাল পর্যন্ত উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় মাদক ও জঙ্গিবাদ নির্মূলে জিরো টলারেন্স দেখতে চাই। ১২ই মার্চ বগুড়া পুলিশ লাইন্স মাঠে আয়োজিত জেলা পুলিশের বার্ষিক পুলিশ সমাবেশ, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। পুলিশ মহাপরিদর্শক বলেন, বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে উন্নয়নের মহাসড়কে এগিয়ে যাচ্ছে দেশ। চ্যালেঞ্জের মধ্যে একটি মাদক অপরটি জঙ্গিবাদ। মাদক ও জঙ্গিবাদ নিয়ে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, মাদক ও জঙ্গিবাদ নির্মূলে শুধু পুলিশ নয়, সমাজের সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে নিয়ে কাজ করতে চাই। কারণ সবার সহযোগিতা থাকলে দেশ থেকে অবশ্যই মাদক ও জঙ্গিবাদ নির্মূল হবে।

সন্দেহ হলেই পুলিশ সদস্যদের ডোপ টেস্ট: আইজিপি

মাদকাসক্তে সন্দেহভাজন পুলিশ সদস্যদের ডোপ টেস্ট করা হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী। ১২ই মার্চ রাজশাহী পুলিশ লাইনে নারী ব্যারাক ভবনের উদ্‌বোধন শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি একথা বলেন। তিনি বলেন, আগামীতে যে পুলিশ সদস্যের আচার-ব্যবহার ও অন্যান্য লক্ষণ দেখে সন্দেহ হবে, তাকেই ডোপ টেস্টের মুখোমুখি হতে হবে। অতি সম্প্রতি এমন উদ্যোগই নেওয়া হয়েছে। এরই মধ্যে বিষয়টি জানিয়ে পুলিশের সব ইউনিট প্রধানকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও জানান আইজিপি।

ডিএমপি'র মাদক ও জঙ্গি বিরোধী সমাবেশ

১০ই মার্চ রাজধানীর কড়াইল বস্তিতে ডিএমপি আয়োজন করে 'মাদক ও জঙ্গি বিরোধী সমাবেশ'। এর প্রধান অতিথির বক্তব্যে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার মো. আছাদুজ্জামান মিয়া বলেন, কেউ মাদকের সঙ্গে জড়িত থাকলে, তার অবস্থান যাই হোক কোমরে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে। এখন আসুন, যদি আমরা দেশকে ভালোবেসে থাকি তাহলে মাদককে উপড়ে ফেলি।

প্রতিবেদন: জান্নাত হোসেন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২রা এপ্রিল বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ১২তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ২০১৯ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অটিস্টিক শিশু-কিশোর পরিবেশিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন–পিআইডি

স্বাস্থ্যকথা : বিশেষ প্রতিবেদন

সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসকদের আলাদা কর্নার হচ্ছে

সরকারি হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা যাতে আরো বেশি সেবা দিতে পারেন, সেজন্য হাসপাতালগুলোতে আলাদা কর্নার তৈরির পরামর্শ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ১২ই মার্চ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির সভা শেষে ব্রিফিংকালে পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান প্রধানমন্ত্রীর এ পরামর্শের কথা জানান।

সব সরকারি হাসপাতালে আইসিইউ স্থাপনেরও নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এছাড়াও হাসপাতালে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র ও ফুডকোর্ট রাখার নির্দেশ দেন তিনি। সভায় সরকারি কর্মচারীদের হাসপাতাল ৫০০ শয্যায় উন্নীত করার প্রকল্পটি পাসের সময় প্রধানমন্ত্রী এসব নির্দেশ দেন।

কলেরা শনাক্ত হবে মাত্র ১৫ মিনিটে

কলেরা রোগ সংক্রমণের শুরুতে দ্রুত এবং কার্যকরভাবে তা শনাক্ত করার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র (আইসিডিডিআরবি)-এর গবেষকরা। যা থেকে মাত্র ১৫ মিনিটেই শনাক্ত করা যাবে রোগটি। ১২ই মার্চ আইসিডিডিআরবি থেকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গবেষকেরা স্থানীয়ভাবে কলকিট নামের একটি ডিপস্টিক তৈরি করেছেন। আর এ কলকিট আরডিটি মলে ভিব্রিও কলেরি ব্যাকটেরিয়া চিহ্নিত করতে সক্ষম। এটি এমন একটি ইমিউনোক্রোমাটোগ্রাফিক ডিপস্টিক পরীক্ষা পদ্ধতি, যা মলের নমুনাযুক্ত টিউবের মধ্যে ডোবালে সর্বোচ্চ ১৫ মিনিটেই যথাযথ ফল প্রদর্শন করে।

বিশ্ব কিডনি দিবস

কিডনি নষ্ট হওয়ার লক্ষণ সহজে মানুষ বুঝতে পারে না। ৭০-৮০ শতাংশ কিডনি নষ্ট হওয়ার পর মানুষ চিকিৎসা নিতে আসে। কিডনি রোগ যেন না হয় সে বিষয়ে বেশি জোর দিতে হবে। এজন্য মানুষকে সচেতন করা জরুরি হয়ে পড়েছে। ১৩ই মার্চ বিশ্ব কিডনি দিবস উপলক্ষে রাজধানীর ল্যাবএইড হাসপাতালে 'দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগ: বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত' শীর্ষক সেমিনারে কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞরা এসব কথা বলেন। এ বছরে দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'সুস্থ কিডনি সবার জন্য, সর্বত্র'।

বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস পালন

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ২৪শে মার্চ পালিত হয়েছে বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস। এবারে দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'এখনই সময় অঙ্গীকার করার, যক্ষ্মামুক্ত বাংলাদেশ গড়ার'। দিবসটি উপলক্ষে প্রেসক্লাবে জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি ও ব্র্যাকের যৌথ আয়োজনে এক সংবাদ সম্মেলনে জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির কর্মকর্তারা বলেন, বাংলাদেশে প্রতিটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে, জেলা হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বক্ষব্যাধি হাসপাতাল, সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতালে বিনামূল্যে যক্ষ্মা নির্ণয় ও চিকিৎসা করা হয়। দেশের প্রতিটি রোগী বিনামূল্যে যক্ষ্মার ওষুধ পায়।

প্রতিবেদন: মো. আশরাফ উদ্দিন

প্রতিবন্ধী : বিশেষ প্রতিবেদন

আগামী অর্থবছর থেকে ভাতা পাবে প্রতিবন্ধীরা

আগামী বাজেট থেকে সরকার দেশের সব প্রতিবন্ধীকে ভাতা প্রদান করবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ২রা এপ্রিল ১২তম 'বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস' উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, বর্তমানে সরকার ১০ লাখ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে মাসিক ৭০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করছে। সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী দেশে এখন ১৪ লাখ প্রতিবন্ধী মানুষ রয়েছে, যারা আগামীতে ভাতার আওতায় আসবে। অটিজম আক্রান্ত শিশুরা সুস্থ পরিচর্যা পেলে সবার সঙ্গে মিলে চলতে পারবে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এদের মাঝে যে সুপ্ত জ্ঞান ও প্রতিভা থাকে, সেটাকে কাজে লাগাতে হবে'।

প্রতিবন্ধীদের বহুমুখী প্রতিভার উদাহরণ দিয়ে শেখ হাসিনা বলেন,

দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরা প্লাস্টিক ও বেত দিয়ে মোড়া তৈরি করছে, নানা সাংসারিক উপকরণ তৈরি করছে। সুযোগ পেলেই আমি এগুলো সংগ্রহ করি, ব্যবহার করি। প্রতিবছর দুই ঈদ ও নববর্ষের জন্য যেসব শুভেচ্ছা কার্ড পাঠাই, সেগুলোও প্রতিবন্ধীদের চিত্রাঙ্কন থেকেই নির্ধারিত মূল্য দিয়ে সংগ্রহ করা। প্রতিবন্ধীদের এ চিত্রাঙ্কনে তৈরি কার্ড দিয়ে বিশ্ব অটিজম আন্দোলনের অগ্রপথিক সায়মা ওয়াজেদ হোসেন একটি অ্যালবাম তৈরি করেছে। যেটি তাঁর সরকার উপহারস্বরূপ বিভিন্ন জায়গায় পাঠাচ্ছে।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী অটিজম আক্রান্ত পাঁচ শিশুকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এবং অটিজম সচেতনতা সৃষ্টিতে বিশেষ অবদানের জন্য তিন জন ব্যক্তি ও তিনটি প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করেন।

প্রতিবেদন: হাছিনা আক্তার

শিশু ও কিশোর উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

জাতীয় শিশু দিবস পালিত

যথাযোগ্য মর্যাদায় ও নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে ১৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৯তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস পালন করা হয়। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল– 'শিশুর জীবন করো রঙিন'। এ দিবস উপলক্ষে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় শিশু সমাবেশ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৯তম জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস ২০১৯ উপলক্ষে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধু সমাধিসৌধ কমপ্লেক্সে আয়োজিত শিশু সমাবেশ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে 'বঙ্গবন্ধুকে লেখা চিঠি' শীর্ষক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন–পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, শিশুরা যেন শিক্ষা, খেলাধুলা, শরীরচর্চা, সাংস্কৃতিক চর্চা– সব দিকে পারদর্শী হয়ে ওঠে, তা নিশ্চিত করার ওপর জোর দিয়েছে সরকার। তিনি বলেন, 'আজকের শিশু যাতে আগামী দিনে একটি সুন্দর জীবন পায়, তা নিশ্চিত করতে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। আমরা পরিবেশ সৃষ্টি করছি যেন আমাদের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখতে পারে, মানুষের মতো মানুষ হতে পারে, উচ্চ শিক্ষা নিতে পারে'।

শিশুদের নিয়ে বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতার কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মাত্র সাড়ে তিন বছর সময় পেয়েছিলেন। এরই মধ্যে তিনি শিশুদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করে দিয়ে যান'। তিনি বলেন, শিশুদের যে অধিকার সেটা যাতে নিশ্চিত হয় তারজন্য ১৯৭৪ সালে জাতির পিতা এ বাংলাদেশে শিশু আইন প্রণয়ন করেন, তখনো জাতিসংঘ আইন করেনি। আমরা তাঁর আলোকেই জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ প্রণয়ন করি। এছাড়া শিশুদের উন্নয়নে বর্তমান সরকারের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কথাও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৯

অতিরিক্ত চাপে লেখাপড়া নিয়ে শিশুদের মধ্যে যেন ভীতি তৈরি না হয় সেজন্য শিক্ষক ও অভিভাবকদের নজর দেওয়ার অনুরোধ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ১৩ই মার্চ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৯-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিশুদের শিক্ষার জন্য অতিরিক্ত চাপ দেওয়া উচিত না। তাদের পড়াশোনাটা তারা যেন খেলতে খেলতে, হাসতে হাসতে সুন্দরভাবে নিজের মতো করে পড়তে পারে সেই ব্যবস্থাটাই করা উচিত। সেখানে অনবরত পড়, পড়, পড় বলা বা ধমক দেওয়াতে তাদের শিক্ষার ওপর আগ্রহটা কমে যাবে। একটা ভীতি সৃষ্টি হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, অনেক সময় আমরা দেখি প্রতিযোগিতাটা শিশুদের মধ্যে না হলেও বাবা-মায়ের মধ্যে বেশি হয়ে যায়। এটা কিন্তু একটা অসুস্থ প্রতিযোগিতা বলে আমি মনে করি। কারণ সকল শিক্ষার্থীর তো সমান মেধা থাকবে না।

প্রত্যেক শিশুর গেম খেলা উচিত

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রী মোস্তফা জব্বার বলেছেন, প্রত্যেক শিশুর গেম খেলা উচিত। গেম খেলে কেউ নষ্ট হয়েছে এমন ঘটনা নিজের অভিজ্ঞতা দেখিনি। শুধু গেম নয়, তাদের কম্পিউটারেও পারদর্শী হতে হবে। কারণ ছেলেমেয়েদের কম্পিউটার বিষয়ক জ্ঞানে অশিক্ষিত রেখে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া সম্ভব নয়। ১১ই মার্চ চট্টগ্রামের নাছিরাবাদ সরকারি উচ্চবিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত দিনব্যাপী ই-লার্নিং মেলায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৯

চিলড্রেন ফিল্ম সোসাইটি বাংলাদেশের উদ্যোগে ২রা মার্চ থেকে সপ্তাহব্যাপী ১২তম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবে প্রদর্শিত চলচ্চিত্র থেকে ১১টি চলচ্চিত্রকে পুরস্কৃত করা হয়। রাজধানীর কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগারের শওকত ওসমান মিলনায়তনে সমাপনী অনুষ্ঠানে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে আফ্রিদা মেহজাবিন পরিচালিত *আরাইভনেস* চলচ্চিত্রটিকে প্রথম পুরস্কার দেওয়া হয়। প্রকৃতি প্রযুক্তি তুষ্টি পরিচালিত *আই অ্যাম এ হিজড়,* *গিভমি সাম মানি* চলচ্চিত্রকে ২য় এবং প্রদীপ্ত সাহা পরিচালিত *সুপ্রভাত* চলচ্চিত্রকে ৩য় পুরস্কার প্রদান করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে আরো ৮টি পুরস্কার দেওয়া হয়। বিজয়ীদের প্রত্যেককে ক্রেস্ট, সনদপত্র এবং ১০ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়।

প্রতিবেদন: নাসিমা খাতুন

সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

শিল্পের আলোয় বঙ্গবন্ধু

বঙ্গবন্ধুর ৯৯তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে শিল্পকলা একাডেমি দিনব্যাপী অনুষ্ঠান আয়োজন করে। অনুষ্ঠানের মূল প্রতিপাদ্য ছিল– 'শিল্পের আলোয় বঙ্গবন্ধু'। এ অনুষ্ঠানে ২০০

জন শিশুর অংশগ্রহণে একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা প্লাজায় শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে এ অনুষ্ঠান শুরু হয়। দিনব্যাপী শিশুদের জন্য ছিল শিশু চলচ্চিত্র প্রদর্শনীসহ নানা আয়োজন।

কবি আল মাহমুদ স্মরণ সভা

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি আল মাহমুদ ছিলেন একইসঙ্গে উদার ও প্রতিবাদী। তিনি বেঁচে থাকবেন তাঁর কবিতায়, কর্মে। কবি আল মাহমুদ না ফেরার দেশে চলে গেছেন গত ১৫ই ফেব্রুয়ারি। তাঁর স্মরণে ৫ই মার্চ নাগরিক সভার আয়োজন করে আল মাহমুদ পরিষদ। নাগরিক শোকসভায় শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তনে এভাবেই স্মরণ করেন বিশিষ্ট জনেরা। আলোচনা ও স্মৃতিচারণার ফাঁকে ফাঁকে আল মাহমুদের কবিতা আবৃত্তি করে শোনান শিল্পীরা। কবি আল মাহমুদকে নিয়ে লেখা কবিতাও পাঠ করেন আমন্ত্রিত কবিরা।

জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত সম্মেলন

সারাদেশের রবীন্দ্রসংগীত অনুরাগীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, পরস্পর অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মধ্য দিয়ে ৮ই মার্চ অনুষ্ঠিত হয় ৩৮তম জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত সম্মেলন। প্রদীপ প্রজ্বলন করে তিন দিনের সম্মেলনের উদ্‌বোধন করেন লেখক ও শিক্ষাবিদ ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সন্‌জীদা খাতুন। সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হন ভাষা সৈনিক রবীন্দ্র গবেষক আহমদ রফিক। এছাড়া গুণী সম্মাননায় রবীন্দ্র পদকে ভূষিত করা হয় সিলেটের প্রধান লোকসংগীত শিল্পী সুষমা দাসকে।

জাতীয় পুতুলনাট্য উৎসব

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে ১৯শে মার্চ অনুষ্ঠিত হয় 'জাতীয় পুতুলনাট্য উৎসব-২০১৯'। পাঁচ দিনব্যাপী একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার পরীক্ষণ থিয়েটার বা স্টুডিও থিয়েটার মিলনায়তনে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা পুতুলনাট্যের দল অংশ নেয়।

বছরব্যাপী গণগ্রন্থাগার প্রচারণার উদ্‌বোধন

'চলো গ্রন্থাগারে চলো– দেখি সম্ভাবনার আলো' শিরোনামে বছরব্যাপী গণগ্রন্থাগার প্রচারণার উদ্‌বোধন করা হয়। ব্রিটিশ কাউন্সিলের লাইব্রেরিজ আনখিমি টেড প্রকল্প ও গণগ্রন্থাগারের উদ্যোগে ১৯শে মার্চ সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগারে এই প্রচারণা উদ্‌বোধন করা হয়। সারাদেশের ২৫টি জেলা শহরের সরকারি গ্রন্থাগারে এই প্রচারণা চালানো হবে। উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আশীষ কুমার। ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর বারয়ান উইকহামসহ অনেকে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গণগ্রন্থাগারের মহাপরিচালক আবদুল্লাহ বাকী।

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী: বিশেষ প্রতিবেদন

পার্বত্য মেলা ২০১৯

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে পার্বত্য এলাকার মানুষের জীবন, সংস্কৃতি, পোশাক-পরিচ্ছেদ, ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক তথ্যাদি সমতলের মানুষের মাঝে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকায় ২১-২৪শে মার্চ চারদিনব্যাপী পার্বত্য মেলার আয়োজন করা হয়। মেলায় কেউ নিয়ে এসেছিলেন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী খাবার, জুমের ফসল, কেউ এসেছিলেন বৈচিত্র্যময় পোশাকের সম্ভার নিয়ে, আবার কেউ নিয়ে এসেছিলেন পাহাড়ি আনারস, তরমুজ, কলাসহ রকমারি ফল। এর সঙ্গে ছিল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। পার্বত্য মেলা উপলক্ষে পাহাড়ি নানাজন জাতিগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমির মুক্ত প্রাঙ্গণ যেন হয়েছিল একখণ্ড পাহাড়ি জনপদ। চারদিনের এই মেলা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বাঙালির মেলবন্ধনে পরিণত হয়েছিল। দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানের জন্য ৯৩টি স্টলে সাজানো হয়েছিল এ মেলা। স্টলগুলোও সাজানো হয়েছিল নান থিমে। ২১শে মার্চ রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমি চত্বরে কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক প্রধান অতিথি হিসেবে পার্বত্য মেলা ২০১৯-এর উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বলেন, 'এই মেলা পাহাড়ি বাঙালিদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন মজবুত করবে। সারাবিশ্ব পার্বত্য

কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক ২১শে মার্চ ২০১৯ শিল্পকলা একাডেমিতে পার্বত্য মেলার উদ্বোধন করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং এ সময় উপস্থিত ছিলেন–পিআইডি

শিল্প-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে অবহিত হবেন। সংস্কৃতি জাতিতে জাতিতে মেলবন্ধন রচনা করে। সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতার মাধ্যমেই আমরা বিভেদ, বৈষম্য এবং অনৈক্য দূর করে সুখী-সমৃদ্ধ দেশ গড়ার শপথ নিতে পারি। চারদিনের এই মেলা প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল।

প্রতিবেদন: আসাব আহমেদ

চলচ্চিত্র : বিশেষ প্রতিবেদন

কলম্বো চলচ্চিত্র উৎসবে তিনটি চলচ্চিত্র

শ্রীলঙ্কার কলম্বো চলচ্চিত্র উৎসবে চলচ্চিত্রকার তানভীর মোকাম্মেলের দুটি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ও একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। ২৯-৩১শে মার্চ পর্যন্ত চলে এ উৎসব। এ উৎসবের ছবিগুলো হলো– পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র *জীবন ঢুলী* ও *চিত্রা নদীর পাড়ে* এবং প্রামাণ্যচিত্র *সীমান্তরেখা* দেখানো হয়।

পুনর্নির্মিত হচ্ছে বেদের মেয়ে জোসনাসহ ৫টি চলচ্চিত্র

সর্বাধিক ব্যবসা সফল ৫টি চলচ্চিত্র পুনর্নির্মিত হচ্ছে। ছবিগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে সাড়া জাগানো ব্যবসা সফল ছায়াছবি *বেদের মেয়ে জোসনা*। এছাড়া রয়েছে– *মনের মাঝে তুমি*, *মোল্লা বাড়ির বউ*, *গাড়িয়াল ভাই* ও *নসিমন*। ১৪ই ফেব্রুয়ারি ছবিগুলোর ডিজিটাল বিপণন এবং রিমেক করার স্বত্ব পুরোপুরি কিনে নিয়েছে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম 'বঙ্গ বিডি'।

সাউথ এশিয়ান ও সিলেট ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে *পুরুষাতঙ্ক*

পরিচালক অপরাজিতা সংগীতার পরিচালনায় পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষদের নির্যাতনে আক্রান্ত নারীদের আতঙ্কের গল্পে নির্মিত হয়েছে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র *পুরুষাতঙ্ক*। এতে অভিনয় করেছেন– মামুনুর রশিদ, লুৎফর রহমান জর্জ, নুসরাত জাহান খান নিপা, সৈয়দ জামাল, শুভ হাসান, সিকদার ডায়মন্ড। এ চলচ্চিত্রটি ইতোমধ্যে দেশে-বিদেশের কয়েকটি চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে। যুক্তরাজ্যের 'লিফট অব সেশনস' গ্লোবাল প্ল্যাটফর্মে এ ছবিটি সপ্তাহব্যাপী অনলাইনে প্রদর্শিত হয়েছে। এছাড়া লিফট অব গ্লোবাল নেটওয়ার্কের 'ফাস্টটাইম' ফিল্মমেকার সেশনসে সপ্তাহজুড়ে প্রদর্শিত হয়। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শনীর জন্য মনোনীত হয়েছে *পুরুষাতঙ্ক*। সাউথ এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ২৯শে মার্চ ও সিলেট ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ৩১শে মার্চ ছবিটি প্রদর্শিত হয়।

আজীবন সম্মাননায় অভিনেতা আলমগীর

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি (বাচসাস)-এর অনুষ্ঠানে আজীবন সম্মাননা দেওয়া হয় চলচ্চিত্র অভিনেতা আলমগীরকে। ৫ই এপ্রিল রাজধানীর আগারগাঁও বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ ভবনের প্রধান অডিটরিয়ামে সুবর্ণজয়ন্তী পালন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে আজীবন সম্মাননা প্রদান ছাড়াও বিশিষ্ট ছয় ব্যক্তিত্বকে দেওয়া হয় বিশেষ ইমেরিটাস অ্যাওয়ার্ড। সম্মানপ্রাপ্ত ছয় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হলেন– কোহিনুর আকতার সুচন্দা (অভিনয়), সৈয়দ

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ ৫ই এপ্রিল ২০১৯ বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ হলে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি (বাচসাস)-এর চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৪-২০১৮ প্রদান করেন–পিআইডি

হাসান ইমাম (অভিনয়), রুনা লায়লা (সংগীত), মির্জা আবদুল খালেক (প্রদর্শক-লায়ন সিনেমা হলের শতবর্ষ পূর্তিতে), ফরিদুর রেজা সাগর (দেশের সর্বাধিক ছবির প্রযোজক) এবং সাংবাদিক খন্দকার শাহাদাত হোসেন। এ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। সভাপতিত্ব করেন বাচসাস-এর সভাপতি আবদুর রহমান।

প্রতিবেদন: মিতা খান

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

নীলফামারীর মেয়ে দিয়া সিদ্দিকীর স্বর্ণ জয়

তৃতীয় আইএসএসএফ ইন্টারন্যাশনাল সলিডারিটি ওয়ার্ল্ড র‌্যাঙ্কিং আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপে মেয়েদের রিকার্ভ এককে স্বর্ণপদক জয় করেছেন নীলফামারীর মেয়ে দিয়া সিদ্দিকী। ২৭শে ফেব্রুয়ারি ইরানের প্রতিযোগী শোজামেহের শিভাকে ৩-২ সেটে পরাজিত করেন দিয়া। তার হাত ধরে এবারের টুর্নামেন্টে এককের ইভেন্ট থেকে সোনার পদক পায় বাংলাদেশ।

দিয়া সিদ্দিকী

বিশ্ব র‌্যাঙ্কিং আর্চারিতে বাংলাদেশ রানারআপ

ইসলামিক সলিডারিটি বিশ্ব র‌্যাঙ্কিং আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপে রানারআপ হয়েছে বাংলাদেশ। ২৬শে ফেব্রুয়ারি টঙ্গিস্থ শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার স্টেডিয়ামে স্বাগতিক বাংলাদেশ ২টি স্বর্ণ, ৩টি রৌপ্য ও ৪টি ব্রোঞ্জসহ মোট ৯টি পদক পেয়ে রানারআপ হয়।

মাত্র ১৬ বছরেই দাবা বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ফাহাদ

বাংলাদেশের সর্বকনিষ্ঠ দাবাড়ু হিসেবে আগামী নভেম্বরে রাশিয়ায় দাবা বিশ্বকাপ খেলতে যাবে ফাহাদ। এশিয়ান জোনাল ৩.২ দাবা চ্যাম্পিয়ন শিপের ওপেন বিভাগে চমক দেখিয়েছে সাইফ স্পোর্টিং ক্লাবের ফাহাদ। ২৩শে মার্চ ৭ পয়েন্ট সংগ্রহ করে টাইব্রেকিং পদ্ধতিতে শিরোপা জয় করে পেয়েছে বিশ্বকাপের টিকিট।

কাতারে জয় পেল বাংলাদেশি ফুটবলাররা

১৬ই মার্চ কাতার ফুটবল লীগের ক্লাব আল শাহানিয়াকে প্রস্তুতি ম্যাচে ১-০ গোলে হারিয়েছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব ২৩ দল। একমাত্র গোলটি করেন খন্দকার আশরাফুল। শুরু থেকেই আধিপত্য বিস্তার করে খেলতে থাকে মতিন মিয়া-মাশুক মিয়া জনিরা।

ইএসপিএনের বিশ্বসেরা ১০০ খেলোয়াড়ের তালিকায় তিন বাংলাদেশি

ক্রীড়া বিষয়ক জনপ্রিয় ওয়েবসাইট ইএসপিএন সম্প্রতি ২০১৯ সালে বিশ্বের সেরা ১০০ জন ক্রীড়া ব্যক্তিত্বের তালিকা প্রকাশ

বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব ২৩ দলের ফুটবলাররা

করেছে। এই তালিকায় ক্রিকেটার রয়েছেন মাত্র ১১ জন। তারই মধ্যে জায়গা করে নিয়েছেন বাংলাদেশের তিন ক্রিকেটার– সাকিব আল হাসান, মুশফিকুর রহিম ও মাশরাফি বিন মর্তুজা।

আইসিসির স্বীকৃতি স্মারক 'ক্যাপ' পেলেন রুমানা

বাংলাদেশের তারকা নারী ক্রিকেটার রুমানা আহমেদ ২০১৮ সালের বর্ষসেরা নারী টি-টোয়েন্টি দলে সুযোগ পেয়েছিলেন। এবার আইসিসির দেওয়া সেই স্বীকৃতির 'ক্যাপ' বুঝে পেলেন তিনি। যেখানে প্রথম বাংলাদেশি নারী ক্রিকেটার হিসেবে আইসিসির কোনো দলে জায়গা পেয়েছিলেন অলরাউন্ডার রুমানা। বর্ষসেরা ক্রিকেটারদের স্বীকৃতি হিসেবে আইসিসি সবাইকে একটি করে ক্যাপ উপহার দেয়। সেই তালিকায় জায়গা করে নেয় রুমানা।

প্রতিবেদন: মো. মামুন হোসেন

সচিত্র বাংলাদেশের মফস্বল এজেন্ট

কবি আ. ওয়াহাব
গ্রাম : দুধস্বর, ডাকঘর : ভাটই
উপজেলা : শৈলকূপা, জেলা : ঝিনাইদহ

আখতার হামিদ খান
সহযোগী অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
সাভার কলেজ, সাভার, ঢাকা

ঢাকার স্থানীয় এজেন্ট

মো. ইউনুস, পীরজঙ্গী মাজার, মতিঝিল, ঢাকা
মিলন, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা
আব্দুল হান্নান, কমলাপুর, ঢাকা
সৃজনী, কমলাপুর, ঢাকা
আমির বুক হাউজ, পুরানা পল্টন, ঢাকা
পাঠশালা, শাহবাগ, ঢাকা
আলীরাজ, শাহবাগ, ঢাকা।

এ সকল এজেন্টের কাছ থেকে **সচিত্র বাংলাদেশ** ক্রয় করা যাবে।

না ফেরার দেশে হাসির রাজা টেলি সামাদ

বাংলা চলচ্চিত্রের হাসির রাজা খ্যাত জনপ্রিয় কৌতুকাভিনেতা টেলি সামাদ অগণিত দর্শক-ভক্তকে কাঁদিয়ে পরপারে চলে গেলেন। ৬ই এপ্রিল দুপুরে রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে তিনি চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। ঢাকা চারুকলা কলেজের ছাত্র আবদুস সামাদ ওরফে টেলি সামাদ ১৯৪৫ সালের ৮ই জানুয়ারি মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলার নয়াগাঁও গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটোবেলা থেকে অভিনয়ের নেশা তাঁকে এ জগতে টেনে নিয়ে আসে। ১৯৭৩ সালে *কার বউ* চলচ্চিত্রে কৌতুকাভিনয়ের মাধ্যমে চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ করেন তিনি। একইসঙ্গে মঞ্চ, টিভি ও বেতারেও সরব উপস্থিতি ছিল তাঁর। *নয়ন মনি* ও *পায়ে চলার পথ*– চলচ্চিত্রের মাধ্যমে দর্শকপ্রিয়তা লাভ করেন। তিনি মনা পাগলা চলচ্চিত্রে সংগীত পরিচালনা পাশাপাশি ৫০টির মতো চলচ্চিত্রের গানে কণ্ঠ দেন। অভিনয় জীবনে চার দশকে ৬০০-র মতো চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন তিনি। বাংলাদেশ টেলিভিশনের ক্যামেরাম্যান মোস্তফা মামুন তাঁর ডাক নাম দিয়েছিলেন টেলি সামাদ। তারপর থেকেই তিনি এই নামেই পরিচিত হন।

টেলি সামাদ তাঁর দক্ষ অভিনয়ের স্বীকৃতিস্বরূপ বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে একাধিকবার পুরস্কৃত হয়েছেন। তাঁর অভিনীত উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে– *জিরো ডিগ্রী (২০১৫), কুমারী মা (২০১৩), সাথী হারা নাগিন (২০১১), মায়ের চোখ (২০১০), আমার স্বপ্ন আমার সংসার (২০১০), রিকসাওয়ালার ছেলে (২০১০), মন বসে না পড়ার টেবিলে (২০০৯), কাজের মানুষ (২০০৯), মায়ের হাতে বেহেস্তের চাবি (২০০৯), কে আমি (২০০৯), কেয়ামত থেকে কেয়ামত (১৯৯৩), মিস লোলিতা (১৯৮৫), নতুন বউ (১৯৮৩), মাটির ঘর (১৯৭৯), নাগরদোলা (১৯৭৯), গোলাপী এখন ট্রেনে (১৯৭৮), অশিক্ষিত (১৯৭৮), জয় পরাজয় (১৯৭৬), গুন্ডা (১৯৭৬), সুজন সখী (১৯৭৫), চাষীর মেয়ে (১৯৭৫), রঙিন রূপবান, ভাত দে* প্রভৃতি।

কিংবদন্তি অভিনেতা টেলি সামাদ একাধারে নায়ক, কণ্ঠশিল্পী, সংগীত পরিচালক ও চলচ্চিত্র প্রযোজক ছিলেন। তিনি তাঁর অভিনয় দক্ষতার গুণে দর্শকদের হাসিয়েছেন– যা অনেক শিল্পীর মধ্যে থাকে না। তাই তিনি তাঁর সৃষ্টিশীল কাজের মাধ্যমে চিরদিন বেঁচে থাককেন আমাদের মাঝে। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

প্রতিবেদন: মিতা খান

এক নজরে বাচসাস পুরস্কার

পঞ্চাশ বছর পূর্ণ করল বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি বাচসাস। এই সুবর্ণজয়ন্তীতে চলচ্চিত্র সাংবাদিকদের প্রিয় এই সংগঠনটিকে ঘিরে প্রাণের মেলা বসেছিল ৫ই এপ্রিল। সকাল ১০টায় আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ মিলনায়তনে সাংবাদিক আর চলচ্চিত্র তারকাদের মিলনমেলায় ঝলমলে ও মুখর হয়ে উঠে এ জমকালো আয়োজন। এ অনুষ্ঠানেন মধ্য ছিল– সেমিনার, ইমেরিটাস অ্যাওয়ার্ড ও গত ৫ বছরের চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান, তানজিলের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রীতি বির্তক, পোস্টার চলচ্চিত্র প্রদর্শন। রাত ৮টায় তাঁদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বাচসাসের সাবেক সভাপতি রফিকুজ্জামান, নরেশ ভুইয়া, বর্তমান সভাপতি আবদুর রহমান এবং প্রধান অতিথি তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ।

২০১৪'র পুরস্কারসমূহ– সেরা চলচ্চিত্র: দেশা: দ্য লিডার, সেরা পরিচালক: সৈকত নাসির- দেশা: দ্য লিডার, সেরা অভিনেতা: ফেরদৌস আহমেদ- এক কাপ চা, সেরা অভিনেত্রী: মাহিয়া মাহি- দেশা: দ্য লিডার, সেরা পার্শ্ব অভিনেতা: তারিক আনাম খান- দেশা: দ্য লিডার, সেরা সংগীত পরিচালক: আহম্মেদ হুমায়ূন- স্বপ্ন ছোঁয়া, সেরা গায়ক: বেলাল খান- অল্প অল্প প্রেমের গল্প, সেরা গায়িকা: লেমিস- অগ্নি, সেরা চিত্রগ্রাহক: চন্দন রায় চৌধুরী- দেশা: দ্য লিডার।

২০১৫'র পুরস্কারসমূহ– সেরা চলচ্চিত্র: পদ্ম পাতার জল, সেরা পরিচালক: মোরশেদুল ইসলাম- অনিল বাগচীর একদিন, সেরা অভিনেতা: আরিফিন শুভ- ছুঁয়ে দিলে মন, সেরা অভিনেত্রী: বিদ্যা সিনহা সাহা মীম- পদ্ম পাতার জল, সেরা পার্শ্ব অভিনেতা: সাদেক বাচ্চু- লাভ ম্যারেজ, সেরা পার্শ্ব অভিনেত্রী: জ্যোতিকা জ্যোতি- অনিল বাগচীর একদিন, সেরা সংগীত পরিচালক: শওকত আলী ইমন- ব্ল্যাক মানি, সেরা গায়ক: আসিফ আকবর- পদ্ম পাতার জল, সেরা গায়িকা: এলিটা করিম- পদ্ম পাতার জল, সেরা চিত্রগ্রাহক: মাহফুজুর রহমান খান- পদ্ম পাতার জল।

২০১৬'র পুরস্কারসমূহ– সেরা চলচ্চিত্র: অজ্ঞাতনামা, সেরা পরিচালক: তৌকীর আহমেদ- অজ্ঞাতনামা, সেরা অভিনেতা: চঞ্চল চৌধুরী- আয়নাবাজি, সেরা অভিনেত্রী: মাসুমা রহমান নাবিলা- আয়নাবাজি, সেরা পার্শ্ব অভিনেতা: ফজলুর রহমান বাবু- অজ্ঞাতনামা, সেরা পার্শ্ব অভিনেত্রী: মৌসুমী হামিদ- পূর্ণদৈর্ঘ্য প্রেমকাহিনী ২, সেরা সংগীত পরিচালক: পিন্টু ঘোষ- অজ্ঞাতনামা, সেরা গায়ক: ফজলুর রহমান বাবু- অজ্ঞাতনামা, সেরা গায়িকা: সিঁথি সাহা- ভোলাত যায় না তারে, সেরা চিত্রগ্রাহক: রাশেদ জামান চৌধুরী- আয়নাবাজি, জুরি বোর্ডের বিশেষ পুরস্কার (সংগীতশিল্পী ও সংগীত পরিচালক): কুমার বিশ্বজিৎ-সারাংশে তুমি।

২০১৭'র পুরস্কারসমূহ– সেরা চলচ্চিত্র: ঢাকা অ্যাটাক ও রাজনীতি, সেরা পরিচালক: হাসিবুর রেজা কল্লোল- সত্তা, সেরা অভিনেতা: শাকিব খান- সত্তা, সেরা অভিনেত্রী: তিশা- হালদা ও অপু বিশ্বাস- রাজনীতি, সেরা পার্শ্ব অভিনেতা: আনিসুর রহমান মিলন- রাজনীতি, সেরা পার্শ্ব অভিনেত্রী: রুনা খান- হালদা ও নাসরিন- সত্তা, সেরা সংগীত পরিচালক: বাপ্পা মজুমদার - সত্তা, সেরা গায়ক: জেমস- সত্তা (গান: তোর পিরীতে অন্ধ হলাম), সেরা গায়িকা: মমতাজ বেগম- সত্তা (গান: না জানি কোন অপরাধে), সেরা চিত্রগ্রাহক: আসাদুজ্জামান মজনু- রাজনীতি।

২০১৮'র পুরস্কারসমূহ– সেরা চলচ্চিত্র: দেবী, সেরা পরিচালক: অনম বিশ্বাস- দেবী, সেরা অভিনেতা: সিয়াম আহমেদ- দহন, সেরা অভিনেত্রী: জয়া আহসান- দেবী, সেরা গায়ক: ইমরান মাহমুদুল- নায়ক, সেরা গায়িকা: আঁখি আলমগীর- একটি সিনেমার গল্প, সেরা চিত্রগ্রাহক: সাইফুল শাহীন- পোড়ামন-২, সেরা পার্শ্ব অভিনেতা: মিশা সওদাগর- জান্নাত, সেরা পার্শ্ব অভিনেত্রী: শবনম ফারিয়া- দেবী, জুরি বোর্ডের বিশেষ পুরস্কার (নবাগত নায়িকা): পূজা চেরি।

প্রতিবেদন: শাওন আহমেদ